আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে সমাজগতির রূপায়ণ

মোছাঃ শামিমা নাসরিন

রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ১৪
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১১-১২
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
জুন ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের তত্ত্বাবধানে *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে সমাজগতির রূপায়ণ* শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন হয়েছে। অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে তাঁর গবেষণা পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা, সূক্ষ্মবিশ্লেষণ,সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ আন্তরিক তাগিদে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ফাতেমা কাওসার, অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান. অধ্যাপক বায়তুল্লাহ কাদেরী, অধ্যাপক মোঃ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়া আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সহকর্মী ,বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সংগঠক ও সদস্য এবং তৃণমূল পত্রিকার সম্পাদক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ডা. মনিরুল ইসলাম গবেষণা বিষয়ে অনেক অজানা তথ্য প্রদান করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যলয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর হুমায়ুন কবীর, পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আমজাদ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুর রউফ বিভিন্ন সময়ে আমার গবেষণাকর্মের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সেমিনার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার ও ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার মা হামিদা বানু গবেষণা চলাকালীন সময়ে আমার শিশুকন্যা শ্রেয়সী অদিতির পরিচর্যার ভার গ্রহণ করে আমাকে সাংসারিক দায়িত্ব থেকে অনেকখানি অব্যাহতি দিয়েছেন এবং স্নেহ-মিশ্রিত শাসন চালিয়েছেন গবেষণা কর্মটি সময়মতো শেষ করার জন্য। আমার অগ্রজ পাবনা সরকারি মহিলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শামছুর রহমান আমার মধ্যে নিরন্তর আশা জাগিয়ে রেখেছেন অভিসন্দর্ভ রচনার ব্যাপারে। আমার কন্যা শ্রেয়সী অদিতির সুখসঙ্গ গবেষণার শ্রমসাধ্য সময়কে আনন্দময় করে তুলেছে। আমার স্বামী রাজীব হাসান অনুপ্রেরণা ও তাগিদ দিয়েছেন গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করবার জন্য। অভিসন্দর্ভ নির্ভুল করার ব্যাপারেও তিনি আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। এঁদের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ষাটের দশকের শক্তিমান লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৬–১৯৯৭) সম্পর্কে আমি আগ্রহী হয়ে উঠি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যায়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েই। সদ্য প্রয়াত ইলিয়াসকে নিয়ে বেশ লেখালেখি ও আলোচনা চলছিল তখন সাহিত্যিক মহলে। ইলিয়াসের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সংগ্রহ করে পাঠ শুরু করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতেও সে বছর প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত হয় ইলিয়াসের রচনা। আস্তে আস্তে মুগ্ধতার পর্ব কাটিয়ে ইলিয়াসের সাহিত্যকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করি। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করেই ইলিয়াসের ছোটগল্প নিয়ে গবেষণার স্পৃহা জাগে। সেই স্পৃহা অনেকদিন গতি পায়নি সরকারি চাকরির নানা নিয়মের বেড়াজালে। অবশেষে অনুমতি পেয়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে সমাজগতির রূপায়ণ* শীর্ষক শিরোনামে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. কোর্সে ভর্তি হই।

এ গবেষণাকর্মে ইলিয়াসের ছোটগল্পের আদ্যোপান্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি ছোটগল্পে মূলত ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ব বাংলার মানুষের নিষ্পেষণ ও ১৯৭১-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের অন্তর্জ্বালা, আশাভঙ্গের বেদনা ও অস্তিত্ব সংকটের নিদারুণ হাহাকার, উঠতি ধনিক শ্রেণির উল্লাস ও হিংস্রতার চিত্র তুলে ধরেছেন নিজস্ব প্রকরণে। জীবনের নানান খুঁটিনাটি, গতি-প্রকৃতি, স্পন্দনশীল সময়চিত্র ও দ্বান্দ্বিক সময়ের চালচিত্রই ইলিয়াসের গল্পের প্রধান দিক। পুরান ঢাকার জীবন রূপায়ণ তাঁর গল্পে গুরুত্ব পেলেও মূলত তাঁর গল্পের পটভূমি নগর ছাড়িয়ে গ্রাম-জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে ইলিয়াসের পাঁচটি গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত মোট ২৩টি গল্পের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ আলোচিত হয়েছে। মোট তিনটি অধ্যায়ে রচিত এই অভিসন্দর্ভে ইলিয়াসের ছোটগল্প অবলম্বনে তাঁর জীবনোপলব্ধির গভীরতা, সমাজের গতিমুখ ও তার ছাপচিত্রণ তুলে ধরাই এ গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য। ষাট ও সত্তরের দশকের পাকিস্তানি শাসকদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আশা ও তার বিভঙ্গতা, রাজনীতিকেন্দ্রিক ব্যাপক লাঠিয়াল বৃত্তির বাস্তবতাকেই ইলিয়াস তাঁর ছোটগল্পে প্রধান রূপে তুলে ধরেছেন।

অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম : বাংলা ছোটগল্পের ধারায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অবস্থান। এই অধ্যায়ে বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারায় সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের চর্চা ও সৃজনের মূল প্রবণতাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অবস্থান এবং লেখক জীবনের সূচনায় সামাজিক-সাহিত্যিক গতিপ্রকৃতি, লেখকের প্রস্তুতিপর্বের শিকড় সন্ধান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম : ইলিয়াসের গল্পে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের রূপায়ণ। এটিই এ-অভিসন্ধর্ভের কেন্দ্রীয় পরিসর। এই অধ্যায়েই অনুসন্ধান করা হয়েছে ইলিয়াসের গল্পের আর্থ-সামাজিক জীবন চিত্রায়ণের পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক। সমাজের গতিমুখ ও মূল প্রবণতাসমূহ এ অধ্যায়ের অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের শিল্পরূপ। এখানে ইলিয়াসের গল্পের প্রকরণ ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। উপসংহার অংশে উপস্থাপিত হয়েছে ইলিয়াসের গল্পের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন। সবশেষে প্রদর্শিত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অবস্থান ৫-৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলিয়াসের গল্পে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের রূপায়ণ ৩৬-১০১

তৃতীয় অধ্যায়

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের শিল্পরূপ ১০২-১৬৪

উপসংহার ১৬৫-১৬৭

গ্রন্থপঞ্জি ১৬৮-১৭১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
বাংলা ছোটগল্পের ধারায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অবস্থান

আধুনিক যুগযন্ত্রণার শিল্পস্মারক ছোটগল্প। পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা ভাষায় এই জনপ্রিয় রূপকল্পের উদ্ভব ঘটে উনিশ শতকের শেষ দশকে ; যার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে গল্প রচিত হলেও ছোটগল্পের স্মরণীয় উদ্বোধক তিনিই। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ছোটগল্প সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। ঊনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন অসাধারণ সব ছোটগল্প। এই সময়ে তিনি জমিদারি দেখাশোনার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গে আসেন। পদ্মা-তীরবর্তী মানুষ, তাদের কৃষিজ জীবন, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা অবলোকনের সুযোগ পান তিনি এবং সেসব অভিজ্ঞতার শিল্পময় প্রকাশ ঘটে তাঁর ছোটগল্পে। 'এখানকার প্রকৃতি-পরিবেশ, মাটি ও মানুষের সংস্পর্শে ঋদ্ধ হয় রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতালোক'।[১] ছোটগল্পে তিনি মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হলেও নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনস্বরূপও শিল্পরূপে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পে।

১৮৭৭ সালে ভারতী পত্রিকায় 'ভিখারিনী' গল্প প্রকাশের মাধ্যমে ছোটগল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণপ্রতিভার স্বাক্ষর অনুপস্থিত। ১৮৮৪ সালে 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' এবং ১৮৮৫ সালে 'মুকুট' গল্প রচনার পর ১৮৯১ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনায় নিয়মিত হন। শিলাইদহ ২৭ জুন, ১৮৯৪ তারিখে ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই– যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বন্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের' পরে বেড়িয়ে বেড়াবে।'[২]

গল্পগুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি রচিত হয় ১৮৯১ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে। প্রকৃতি রবীন্দ্রছোটগল্পের বিষয় নির্বাচন ও বিন্যাসে অন্যতম মূলসূত্র হিসেবে কাজ করেছে। ছোটগল্পে

---

[১] চঞ্চল কুমার বোস, বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৬

[২] শিলাইদহে অবস্থানকালে পদ্মা নদীতে বোটে চড়ে ভ্রমণের সময় তীরবর্তী মানুষের হাসি-আনন্দ, দুঃখ-সুখ অবলোকনের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতেন মেঘ ও রৌদ্রের চঞ্চলতা, লুকোচুরি, তরুছায়ার লোফালুফি। তাঁর কল্পনার রাজ্যে ভিড় করত গিরিবালা। কাজের ভিড়ে ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে হত গিরিবালাকে। কিন্তু থেকে যেত রবীন্দ্রণাথের মনের মধ্যে। গল্পে গিরিবালাকে রূপ দিয়ে নিজেকে সুখী ভাবতেন তিনি। *সোনার তরী* কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় তাঁর এই বক্তব্য ধ্বনিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মানুষ ও প্রকৃতিকে একসূত্রে মেলানোর আন্তরিক চেষ্টা চালিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ের গল্পে পল্লী জীবনের পাশাপাশি পদ্মাতীরবর্তী ভূখণ্ডের প্রকৃতি সন্নিহিত জীবনযাত্রা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের চোখে দেখা গ্রাম-জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম, নানা রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগই তাঁকে ছোটগল্পে মানুষের জীবন-সমাজ-সংস্কার রূপায়ণে সাহায্য করেছে। 'রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে পটভূমি (Background) নিছক প্রথাবদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত নয়, কিংবা নয় বিশুদ্ধ বিভাব। পটভূমি রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে সামাজিক অবয়ব উন্মোচনে এবং চরিত্রচিত্তের পরিস্ফুটনে। আবার কখনো পটভূমির প্রতীকী প্রজ্ঞাময় ব্যঞ্জনায় শিল্পিত হয়েছে জীবন, সমাজ ও সময়।'[৩] প্রথম পর্যায়ের গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষ, প্রকৃতি ও মানবমনের বিচিত্র অভিব্যক্তি উন্মোচনে। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্পসমূহ হচ্ছে, 'পোস্টমাস্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'সুভা', 'মহামায়া', 'শাস্তি', 'একরাত্রি', 'সমাপ্তি', 'মানভঞ্জন', 'ক্ষুধিতপাষাণ' প্রভৃতি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মনোযোগ দেন মানব-মনস্তত্ত্বের আলোকে ব্যক্তির অন্তর্জগত উদ্‌ঘাটনে। ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, অন্যায়ের প্রতিবাদ, নারীর ব্যক্তিত্ববোধ, সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরচ্দ্ধাচরণ প্রকাশিত হয়েছে বিশ শতকে রচিত ছোটগল্পসমূহে। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্পসমূহ হচ্ছে, 'হালদার গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি। আধুনিক মানুষের নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নরনারী কেন্দ্রিক জীবনের জটিলতা প্রভৃতি বিষয় ছোটগল্পের বিষয়রূপে প্রযুক্ত করে তিনি অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'মানুষের স্বতন্ত্রসত্তা, তার নৈঃসঙ্গ্যবোধ এবং চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নির্ণয়ে ও অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় রহস্যময়তা উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুচ্ছে বর্ণনকৌশলে বহুমাত্রিক ও স্তরময়।'[৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাংলা ছোটগল্পের সার্থক শিল্পরূপ নির্মাণ করে বিশ্বসাহিত্যের আসরে জুড়ে নেন কালজয়ী আসন। রবীন্দ্র-নির্মিত পথ ধরেই অতঃপর অগ্রসর হতে থাকে বাংলা ছোটগল্প। রবীন্দ্র-সমসাময়িককালে বাংলা ছোটগল্পে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)। ছোটগল্পে জীবনের উপরিতলের রূপ নির্মাণে তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মূলত রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক লঘুরসের ছোটগল্পকার রূপেই অধিক পরিচিত। তাঁর ছোটগল্পে জীবন-জটিলতা প্রায় অনুপস্থিত। 'তাঁর গল্পে থাকে সামগ্রিকভাবে একটি তৃপ্তির বোধ, স্নিগ্ধ কৌতুকরস, ঘটনার আকস্মিকতা। হৃদয়ের গভীরতর সংবাদ--যা রবীন্দ্র-ছোটগল্পে এক পরম প্রাপ্তি--প্রভাতকুমারের গল্পে তা নেই--ওপরের ছবিতেই তাঁর অধিক মনোযোগ।'[৫] প্রভাতকুমারের গল্পভান্ডার বিশালায়তনের। নানামুখী

---

[৩] সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১১

[৪] প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৫] ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, বাংলা ছোটগল্প রীতিপ্রকরণ ও নিবিড় পাঠ, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

জীবনাভিজ্ঞতায় তাঁর ছোটগল্পসমূহ সমৃদ্ধ। গতিময়, মধুর ও নিটোল কাহিনি, জটিলতাবর্জিত নির্ভার আঙ্গিক, সামগ্রিক একটি তৃপ্তির বোধ ও তার পরিণতি কৌতুকপূর্ণ বর্ণনারীতিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পের রূপ-নির্মিতি। প্রভাতকুমারের ছোটগল্প গ্রন্থের সংখ্যা বারোটি। পারিবারিক ও সমাজজীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পর্কই প্রধানত স্থান পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। বিশশতকের প্রথমার্ধে বাঙালি সমাজজীবনের বাস্তবচিত্র স্বতঃস্ফূর্ত পরিমিতিবোধে কৌতুকরসে আশ্রিত হয়ে বিধৃত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। প্রভাতকুমারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর গল্পে 'রঙ্গকৌতুক কোথাও নির্মম স্যাটায়ারে পরিণত হয়নি। তাঁর হাসির মধ্যে একটি আত্মতৃপ্তি ও প্রসন্ন ভাব আছে, কোথাও বক্রবিদ্রুপ বিদ্যুৎকশাঘাতে সেই সহজ সুর ও প্রসন্নতাকে আহত করতে পারেনি। হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তিনি গল্পগুলির মধ্যে এমন এক-একটি চরম মুহূর্তের সৃষ্টি করেন, যখন হাস্যরসের বিস্ফোরণ সশব্দে ফেটে পড়ে।'[৬] তাঁর রচিত বিখ্যাত গল্প 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'মাস্টার মহাশয়', 'খালাস', 'কুড়ানো মেয়ে', 'আদরিনী', 'নিষিদ্ধ ফল' প্রভৃতি। এসব গল্পে সহজ-সরল অনির্বচনীয় জীবনের সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সমস্যা ও সমাধানের তৃপ্তি কখনো কৌতুক, কখনো লঘু চপলতায় চিত্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-সমসাময়িককালে বাংলা ছোটগল্পে স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে থেকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত। প্রখর মননশীল জীবনজিজ্ঞাসার রূপায়ণে সমৃদ্ধ তাঁর ছোটগল্প। ছোটগল্পের বিষয় নির্বাচনে তিনি নতুনত্বের স্বাক্ষর রাখেন। 'মধ্যযুগোচিত সামন্ততান্ত্রিক জীবনের বর্ণাঢ্য পট, প্রেম-প্রতিহিংসার আদিম প্রাণলীলা, কিংবা ইউরোপীয় সুদূর প্রেক্ষাপটে প্রেম ও কামনার বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী--সব মিলিয়ে সমস্যা জটিল প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতাকে অতিক্রম করে অল্পপরিচিতি কিংবা অপরিচিত জীবনের সৌন্দর্য, স্বপ্ন ও প্রাণধর্মের রমণীয় কাহিনী সৃষ্টির দিকেই যেন প্রমথ চৌধুরীর শিল্পীসত্তার গূঢ় আকর্ষণ।'[৭] 'ফলদানী' (১২৯৮) নামক ফরাসি গল্পের অনুবাদের মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে তাঁর প্রবেশ ঘটে। ফরাসি ভাষার বৈশিষ্ট্য তিনি ভালোভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। সেই সূত্রে ফরাসি ছোটগল্পের আঙ্গিক ও রীতি তিনিই প্রথম আয়ত্ত করেন এবং তদনুযায়ী রচনা করেন বাংলা ছোটগল্প। 'বীরবল' ছদ্মনামে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রমথ চৌধুরী ছোটগল্পে তীক্ষ্নব্যঙ্গ বিদ্রুপ, যুক্তি-তর্কের সূচনা করেন তিনি। 'চার ইয়ারী কথা' (১৯১৬), 'আহুতি' (১৯১৯), 'নীললোহিত' (১৩৩৯), 'নীল লোহিতের আদিপ্রেম' (১৩৪১), 'ঘোষালের ত্রিকথা' (১৯৩৭), 'অণুকথা সপ্তক' (১৯৩৯) প্রভৃতি গল্পে প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিপ্রধান নাগরিক মননের প্রকাশ ঘটেছে। ১৯১৪

[৬] রথীন্দ্রনাথ রায়, ছোটগল্পের কথা, পুস্তক বিপণি, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৮৩

[৭] গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, দে'জ পাবলিকেশনস, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রেনেসাঁসীয় জীবনদৃষ্টির অসঙ্কোচ প্রকাশে 'সবুজপত্রে'র গল্পাবলী আধুনিক চেতনাস্পর্শী।'[৮]

রবীন্দ্রনাথের সমকালে বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) মূলত উপন্যাস রচনায় ছিলেন অধিক মনোযোগী। গল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরে আত্মপ্রকাশ করেন শরৎচন্দ্র। মানবজীবনের ছোটো ছোটো ঘটনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মান-অভিমান, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সফলতা-বিফলতা প্রভৃতি আবেগঘন ভাষা ও বর্ণনায় তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ছোটগল্পে। ছোটগল্পে তিনি অনুসরণ করেছেন একান্তই তাঁর নিজস্ব প্রকরণ। ছোটগল্পের যে নিজস্ব চরিত্রলক্ষণ, তাঁর ছোটগল্পে তা প্রায় অনুপস্থিত। 'ছোটগল্পের একমুখী গতি, ব্যঞ্জনার প্রতীতিসমগ্রতা এবং ঘটনাংশের শাখাহীনতা'[৯] তাঁর গল্পে নাই। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বার বার প্রকাশিত হয়েছে। সে কারণে তাঁর রচিত ছোটগল্প আখ্যায়িকার রূপ পেয়েছে। ছোটগল্পের নিটোল রূপ, গল্পন্যায়ের সংহতি, তীক্ষ্ণতা ও ইঙ্গিতমূলক পরিসমাপ্তি তাঁর গল্পে ব্যাহত হয়েছে। এসব সত্ত্বেও তিনি বেশ কিছু সার্থক ছোটগল্প রচনা করে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্থায়ী আসন অধিকার করতে সক্ষম হন। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'কাশীনাথ' 'ছবি', 'হরিলক্ষ্মী' প্রভৃতি। 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দুটিও ভিন্নকারণে উল্লেখযোগ্য। তাঁর গল্পে সমাজবোধ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকাশ পেলেও মানবিক কাহিনি চিত্রণই তাঁর মূল লক্ষ ছিল। 'উনিশ শতকের গ্রামীণ সমাজ-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র যে কেবল প্রথাবদ্ধ সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর রূপকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা নয়, এই বাস্তবনিষ্ঠ জীবন-শিল্পী ঊনিশ শতকীয় সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে জীবনের অনেক সদর্থক ও শুভ-রূপের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। সেইসব অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাকে এই সমাজের প্রতি এক ধরনের মমতায় ও সংবেদনায় পূর্ণ করে তুলেছিল।'[১০]

রবীন্দ্র-সমকালে বাংলা ছোটগল্পের জগতে নতুন যে 'হাস্য রসধারার' সৃষ্টি হয় তার পথিকৃৎ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)। প্রভাতকুমার মুখোপ্যাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৩) প্রমুখ

---

[৮] উনিশ শতকের রেনেসাঁস ভাবনার উত্তরপর্বকে কেন্দ্র করে বাংলা ছোটগল্পের বক্তব্য এবং বাকরীতির প্রথম বিশিষ্ট্য অভিব্যক্তি সূচিত হয়েছিল, সে ধারার রূপরসগত প্রথম দিক পরিবর্তন ঘটতে পারল সবুজপত্রে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত গল্পাবলীতে। রবীন্দ্রনাথের হালদারগোষ্ঠা, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র ইত্যাদি গল্প তার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরী নিজের ছোটগল্পসমূহও উক্ত ধারার সফল সৃষ্টি।

[৯] বিশ্বজিৎ ঘোষ. বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ: ছোটগল্প, বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ, করুণাময় গোস্বামী সম্পাদিত, সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ, ১৪০০ সন, পৃ. ২৩৬

[১০] গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, বাংলা কথাসাহিত্য: প্রকরণ ও প্রবণতা. পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

গল্পকারগণ এই ধারার সফল ব্যক্তিত্ব। ত্রৈলোক্যনাথ ছোটগল্পে মূলত মানবকল্যাণের চেতনা ও পরহিত কামনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাস্যরস সৃজন তাঁর গল্পের পরিচর্যায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর গল্প পাঠে, 'বজ্রের আগে বিদ্যুতের মতো, প্রবল ব্যঙ্গের আগে হাসির স্পর্শ।'[১১] সমাজের কুসংস্কার, অন্যায়-অবিচার, নির্দয়তা, বিবেকহীনতা, অভদ্রতা বিশেষত মনুষ্যত্বের অপমানকে তিনি তাঁর ছোটগল্পে ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রকাশ করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের রচিত ছোটগল্পগ্রন্থ চারটি। সেগুলো হলো *ভূত ও মানুষ* (১৮৯৭), *মুক্তামালা* (১৯০১), *মজার গল্প* (১৯০৪) এবং *ডমরু চরিত্র* (১৯২৩)। নির্মম সত্য প্রকাশে তিনি রূপকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি লেখনীর মাধ্যমে দেশের মানুষের অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করার ব্রত নিয়েছিলেন। সে কারণে এসব রচনা মূলত তাঁর জীবনকর্মেরই প্রক্ষেপণ।

রাজশেখর বসু বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে তিনি লিখতেন। সমাজের যাবতীয় অন্যায়-অমঙ্গল-অসত্যের বিরচদ্ধোচরণ করেছেন তিনি তাঁর ছোটগল্পে। তাঁর যুক্তিপূর্ণ শাণিত তীক্ষ্ণ লেখনী মূলত যাবতীয় অসঙ্গতি মোচনের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা নয়টি; গল্পের সংখ্যা প্রায় একশটি। ছোটগল্পের যে চরিত্রবৈশিষ্ট্য– গল্পন্যায়ের প্রতীতি, চরিত্রানুগ ভাষা সংলাপ সৃষ্টি, একমুখী গতিময়তা, সেসবের উপযুক্ত প্রয়োগ করেছেন তিনি ছোটগল্পে। গভীর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞানমনস্কতা, শব্দ সচেতনতা ও নির্লিপ্ত স্বভাব রাজশেখর বসুর গল্পে নুতন এক মাত্রা নিয়ে এসেছে। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ পরিহাসযুক্ত রসসমৃদ্ধ গল্প রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন সমাজের নানা সংস্কারমূলক বিষয়ের অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। পরশুরামের বিখ্যাত গ্রন্থ *গড্ডালিকা*। এ গ্রন্থের গল্পগুলো বাংলা ছোটগল্পের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাংলা ছোটগল্পের হাস্যরস-সমৃদ্ধ এ ধারায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প স্বতন্ত্র মাত্রা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। সমাজ বিপর্যয়ের নানা আলোড়ন অবলোকন করে তীব্র কশাঘাতে গল্পে রূপায়িত করেছেন তিনি। বাংলা ছোটগল্পে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের ধারায় ইন্দ্রনাথের পাশাপাশি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানও অনেক। তিনি আটপৌরে ও সাদাসিধে ভাষায় মোলায়েম করে ব্যঙ্গ-কৌতুকের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি, সমাজের নানাবিধ অনিয়ম, প্রাচীন ও নবীন পন্থীদের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, হিন্দু নারীর পতিভক্তির করুণ অভিব্যক্তি, পারিবারিক সম্পর্কের বিচ্যুতি প্রভৃতি বিষয় তাঁর ছোটগল্পে যেমন বৈচিত্র্য এনেছে তেমনি হাস্য ও করুণ রসের উপাদানও যুগিয়েছে। 'wit এর চমকপ্রদ আকস্মিকতা, ইহার ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রকাশভঙ্গি ও অনুপ্রাসের সমাবেশ-কৌশল, ইহার বাক্য বিন্যাসের বাহুল্যবর্জিত, গতিবেগ চঞ্চল তীক্ষ্ণাগ্রতা--এ সমস্তেরই উপর তাঁহার অকুণ্ঠিত অধিকার।'[১২] কেদারনাথ রচিত উল্লেখযোগ্য গল্পের মধ্যে রয়েছে 'আই হ্যাজ', 'ভাদুরিমশাই', 'আমরা কি

[১১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৫ সন, পৃ. ২০২

[১২] শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্য উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪০৯

Dhaka University Institutional Repository

ওকে', 'আনন্দময়ী দর্শন', 'ভগবতীর পলায়ন', 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি', 'দেবীমাহাত্ম্য', 'বেয়ান বিভীষিকা' প্রভৃতি।

সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা সাহিত্যের রঙ্গ-ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্প রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন। মানবজীবনের নানা অসঙ্গতি তীক্ষ্ণ রঙ্গ-ব্যঙ্গ কৌতুকের সাথে পরম মমতায় তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে জীবনবোধের উপস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে *কল্লোল* (১৩৩০) পত্রিকা। বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চলে রবীন্দ্র-বলয় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রবল রবীন্দ্র-বিরোধিতা। এ সময়ের সাহিত্যিক প্রবণতা চিহ্নিত করতে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন 'যাকে কল্লোলের যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।'[১৩] প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, নৈতিক ও ধর্মীয় বোধের ক্ষেত্রে সংশয়ই তিরিশের বাংলা ছোটগল্পের মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করে। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে, সাহিত্যের স্বতন্ত্র পথ-নির্মাণের প্রচেষ্টায় '*কল্লোল*', '*কালিকলম*' (১৩৩৩), '*প্রগতি*' (১৩৩৪) পত্রিকার ভূমিকা ব্যাপক। এসব সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তরুণ লেখকগোষ্ঠী। যাদের মূল লক্ষ্য ছিলো ভিন্নতর শিল্পপ্রয়াস ও নতুন সাহিত্য সৃষ্টি। যৌবনধর্মের প্রাধান্য, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলোকে সাহিত্যে নীতি-দুর্নীতি, পাপ-পুণ্যের নবতর বিশ্লেষণ, মানবের যৌন জীবন চিত্রায়ন কল্লোলের প্রাণধর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। এ পর্বের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬৭), প্রবোধকুমার সান্নাল (১৯০৫-১৯৮৩) প্রমুখ। জীবনের-নঞর্থকতা ও গভীর নৈরাজ্য রূপায়ণের পাশাপাশি কেউ কেউ আশ্রয় করলেন অতি রোমান্টিকতা। বুদ্ধদেব বসু এ ক্ষেত্রে অন্যতম। গল্পে তিনি তুলে ধরলেন অতি রোমান্টিক ভাবনা। তাঁর সমসাময়িক লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই পথে হাঁটেননি। জীবনের রূঢ় বাস্তবতা রূপায়ণে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের ভাবময়, কল্যাণময়, জীবনাদর্শ থেকে সরে গিয়ে কল্লোলের লেখকগোষ্ঠী গল্পে প্রকাশ করলেন নীতিবন্ধনহীন দুর্মর প্রাণোল্লাস। 'পুরোনো সাহিত্যদর্শন তাঁদের চোখে অচল, অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব। আর এই কারণেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে চাইলেন।'[১৪]

---

[১৩] বুদ্ধদেব বসু তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন সমকালীন কল্লোল যুগের সাহিত্যিক প্রবণতার ধরণ। রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রবল বিরোধীতা করলেও কেউ কেউ নতুন সাহিত্য সৃষ্টি ও রোমান্টিকতা নির্মাণে ভর করেন রবীন্দ্রনাথের ওপর।

[১৪] দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমেন্দ্র মিত্র নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাসক্ত রূপকার। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, জীবনের পরাজয়, হতাশা প্রান্তিক ও নিম্ন-বিত্ত মানুষের অস্তিত্ব-অভীপ্সাকে কীভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেয় তার সযত্ন রূপায়ণ ঘটেছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে। তাঁর 'শুধু কেরানী', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' 'ভবিষ্যতের ভার', 'পুন্নাম' প্রভৃতি গল্পে নিম্নবর্গীয় মানুষের গভীর ক্রন্দন চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর গল্পের ভাষা নিরাবেগ হলেও বুদ্ধি ও মননের উজ্জ্বলতায় জীবনের মর্মভেদী বিশ্লেষকরূপে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তাঁর অবস্থান স্বতন্ত্র।

কল্লোলীয় চেতনাকে সম্পূর্ণ ধারণ করে বাংলা ছোটগল্পে আবির্ভূত হন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। মহাযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, হতাশা, মানবিক ও নৈতিক আদর্শচ্যুতি, ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনার পরিবর্তে তিনি ছোটগল্পে রূপায়িত করেন রোমান্টিক ভাবালুতা। মানবজীবনের বিভিন্ন দিক ব্যক্তিক দৃষ্টিতে অবলোকন করে সূক্ষ্মভাবে রোমান্টিক ভাবালুতায় সাহিত্যে প্রতিফলিত করেন তিনি। তাঁর গল্পে শহর ও গ্রাম দুই জীবনের চিত্রই ফুটে উঠেছে। শহরবাসী নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত চরিত্র এবং গ্রামকেন্দ্রিক গরিব চাষি, মুচি, ডোম, মেথর, সারেঙ, খালাসি, জেলে প্রভৃতি চরিত্র পরম যত্ন ও মমতায় বাস্তবানুগভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। পুরাতনের প্রতি বিদ্রোহ ও যৌবনের অশেষ উন্মাদনাকে আশ্রয় করে তাঁর *টুটা ফুটা* (১৯২৮), *ইতি* (১৯৩২), *যতনবিবি* (১৯৪৪), *কাঠ খড় কেরোসিন* (১৯৪৫), *চাষাভুষা* (১৯৪৭), *সারেঙ* (১৯৪৭), *হাড়ি মুচি ডোম* (১৯৪৮), *একরাত্রি* (১৯৬১) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

কল্লোল যুগের আরেকজন উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব বসু মনোযোগ দিয়েছেন ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতা, বিপন্নতা ও নিঃসঙ্গতা অঙ্কনে। তাঁর গল্পে বিষয়বৈচিত্র্য ও রীতিবৈচিত্র্য দুই-ই দৃশ্যমান। প্রেম-ঈর্ষা, লোভ-লালসা, পারস্পরিক শত্রুতা প্রভৃতি তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য। ঢাকা ও কলকাতাকেন্দ্রিক দুই নগরজীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বুদ্ধদেব বসু। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি নস্টালজিয়াতাড়িত।

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পেও স্মৃতিভারাতুর ব্যক্তিচিত্তের ছাপ অঙ্কিত হয়েছে। ঢাকা ও কলকাতা দুই নগরের জীবনযাত্রা-প্রকৃতি-দ্বন্দ্ব-প্রেম-সংঘাতের বিস্তৃত বিবরণ তাঁর গল্পে পুনঃ পুনঃ সংযোজিত। তাঁর গল্পভাষা কবিত্বময়। প্রায়ই কবিতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় তাঁর গল্পের প্লট। চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে স্বগোক্তির অতিপ্রয়োগ তাঁর ছোটগল্পের গতি ও ভাবকে ক্ষুণ্ন করে। এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য : 'খুব সম্ভবত আমি স্বাভাবিক গল্পলেখক নই-

Dhaka University Institutional Repository

আমার উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল; ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে স্বগতোক্তির দিকে, উত্তেজনার চাইতে মনস্বত্ত্বের দিকে।'[১৫]

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে প্রেমের প্রসন্ন সার্থকতা ও বিচ্ছেদ-ব্যর্থতা দুই-ই প্রাধান্য পেয়েছে। চেতনারীতির প্রবহমানতা, ফ্লাশব্যাক পদ্ধতি, সংকেতধর্মিতা, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি তাঁর গল্প পরিচর্যায় প্রাধান্য পেয়েছে। 'বুদ্ধদেবের লেখায় দেহচেতনা অবশ্য স্থূল দেহসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়নি কখনও। দেহকে ঘিরে প্রেমের যে রহস্যময় আর্তি ও অনুভব, দেহ ও আত্মার যে ক্রন্দন এবং বিরহের বেদনায় শরীরী চেতনাকে বিশুদ্ধ করে তোলার জন্য নরনারীর যে যন্ত্রণা তাকেই ধরবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যরসবাহিত সাঙ্কেতিক ইমেজ বা শব্দচিত্রের মাধ্যমে।'[১৬] তাঁর *'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প'* (১৯৩০), *'রেখাচিত্র'* (১৯৩১), *'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে* (১৯৩২), *'মিসেস গুপ্ত'* (১৯৩৪) *'অদৃশ্য শত্রু'* (১৯৩৩), *'অসামান্য মেয়ে'* (১৯৩৪) *'নতুন নেশা'* (১৯৩৬), *'শনিবারের বিকেল'* (১৯৩৬), *'খাতার শেষ পাতা'* (১৯৪৩), *'ফেরিওয়ালা ও অন্যান্য গল্প'* (১৯৪১) উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগ্রন্থ।

কল্লোলীয় যুগের সংশয়, হতাশা, অবিশ্বাস, যন্ত্রণা প্রভৃতির সঙ্গে যুক্তিগ্রাহ্য মনস্তত্ত্বের নতুনমাত্রা যোগ করে বাংলা ছোটগল্পে জগদীশচন্দ্র গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) উজ্জ্বল আবির্ভাব ঘটে। মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিক ভাবালুতা বর্জন করে তিনি মনোযোগ দেন মানুষের অন্ধকার গুহাগর্ভে, নিমজ্জনের দিকে। নৈরাশ্যবাদী জগদীশচন্দ্রের ঈশ্বর, ধর্মনীতি নৈতিকতার প্রতি তীব্র অনাস্থাই তাঁকে সমকালীন কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে। তাঁর গল্পে প্রেমের স্নিগ্ধ-মধুর রূপ চিত্রায়িত হয়নি। তবে যৌন প্রবৃত্তির যুক্তিগ্রাহ্য প্রকাশ ঘটেছে। তিনি মূলত মানুষের অন্তর্গত অন্ধকারকে খুলে দেখিয়েছেন তাঁর গল্পে। 'তিনি সর্বত্র দেখিতেছেন শুধু শয়তানী ... গল্পের পর গল্পে জগদীশচন্দ্র একের পর এক এই শয়তানীর স্বরূপ উন্মোচন করে দেখিয়েছেন। এখানে কোথাও মানবিকতা নেই, দরদ বা সহানুভূতি নেই, আছে এক নিষ্ঠুর শয়তানী। দুলর্জ্ঘ্য তার শক্তি।'[১৭]

হতাশা-নিমজ্জিত আর্ত মানুষের নিয়তি-তাড়িত জীবন প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। তিনি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনকে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ *বিনোদিনী* (১৩৩৪), *রূপের বাহিরে* (১৩৩৬), *শ্রীমতি* (১৩৩৭), *উদয়লেখা* (১৩৩৯), *তৃষিত সৃক্কনী* (১৩৩৯), *রতি ও বিরতী* (১৩৪১) প্রভৃতি। প্রকৃতিবাদী শিল্পী হিসেবে তিনি জায়গা করে নেন সাহিত্যের ইতিহাসে। 'মানুষের মহিমা নয়, তাঁর মহিমাহীনতাই তাঁর রচনায়

[১৫] শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সী, চতুর্থ প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫৪
[১৬] বাংলা কথাসাহিত্য: প্রকরণ ও প্রবণতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
[১৭] ড. সরোজমোহন মিত্র, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প, প্রথম সংস্করণ, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২৩৪

প্রতিবিম্বিত। দুঃখ মানুষের অনিবার্য অঙ্গ, আর এই উপলব্ধিকে জগদীশ গুপ্ত রূপায়িত করেছেন বিদ্রূপপ্রখর ঊনভাষী রচনারীতির বিশিষ্টতায়।'[১৮]

নিবিড় জীবনাভিজ্ঞতায় শৈলজানন্দ শ্রমিক জীবনের যন্ত্রণাকে অবলম্বন করে 'কয়লাকুঠি' ছোটগল্প রচনার মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় আত্মপ্রকাশ করেন। কয়লাখনির শ্রমিক সাঁওতাল নরনারীর জীবন-সংগ্রাম-প্রেম-হতাশার পটভূমিতে এ গল্পটি রচিত। মাটি ও মানুষের সঙ্গে শৈলজানন্দের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সে কারণে আদিম-অন্ত্যজশ্রেণির নরনারীর প্রেম-ঈর্ষা- দ্বন্দ্ব-যৌনাকাঙ্ক্ষা-লালসা প্রভৃতি প্রবৃত্তি-তাড়িত নানা জটিলতা তাঁর গল্পে মাজ্ময় হয়েছে। 'নারীর মন' (১৯২৩), 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা' (১৯২৪), 'জোহানের বিহা' (১৯২৬) প্রভৃতি ছোটগল্পে গ্রাম ও নগর জীবনের নিম্নবিত্ত মানুষের দুঃখ-দারিদ্র-হতাশাকে শিল্প সুষমায় চিত্রিত করেছেন।

কল্লোল যুগের অথচ কল্লোলীয় শিল্পচেতনার সঙ্গে পৃথক থেকেও স্বতন্ত্র ও শক্তিমান কথাসাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯০৫), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে আর্বিভূত হন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবন সম্পর্কে সুগভীর বিশ্বাসই তাঁর কথাসাহিত্যের মূলসূত্র। 'সামূহিক ভাঙন এবং কালিক বৈনাশিকতার প্রেক্ষাপটে আর্বিভূত হয়েও যুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের খণ্ড বিশ্বাসের স্রোতে বিভূতিভূষণ নিয়ে এসেছেন অখণ্ড জীবনদৃষ্টির ব্যঞ্জনা।'[১৯] ক্ষয়িষ্ণু গ্রামজীবনের আদর্শ, প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট দুঃখ-বেদনা-সুখ, মধ্যবিত্তের ভন্ডামি, বিলাসিতা বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের বিষয় হয়েছে। তাঁর *মেঘমল্লার* (১৯৩১), *মৌরীফুল* (১৯৩২), *যাত্রাদল* (১৯৩৪), *জন্ম ও মৃত্যু* (১৯৩৭), *কিন্নরদল* (১৯৩৮), *বেনীগির ফুলবাড়ি* (১৯৪১), *নবাগত* (১৯৪৪), ঢালনবমী (১৯৪৪), *উপলখণ্ড* (১৯৪৫) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ বিষয়বৈচিত্র্যে ও শিল্পসুষমায় অনন্য।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত অর্থেই নিঃসঙ্গ ও স্বতন্ত্র এক শিল্পী। 'সময় ও সমকালের দ্বান্দ্বিক দ্বৈরথে বিক্ষত, প্রবৃত্তিতাড়িত ও নিয়তিশাসিত মাটিঘেঁষা মানুষের চারুশিল্পী তারাশঙ্কর।'[২০] তারাশঙ্করের গল্পে রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন সংকট ও সংগ্রাম, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের লুপ্ত মহিমা এবং মানুষের আদিম প্রবৃত্তির জোরালো রূপায়ণ ঘটেছে। তারাশঙ্করের বিচিত্র মানব জীবনাভিজ্ঞতার কারণে তাঁর

[১৮] অশ্রুকুমার শিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৩
[১৯] বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা কথাসাহিত্যপাঠ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০২, পৃ. ৯৯
[২০] বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

গল্পের বিষয়াতন বড়। জমিদারতন্ত্র ও সামন্ত মূল্যচেতনার প্রতি দ্বিধামিশ্রিত আকর্ষণ-বিকর্ষণ তারাশঙ্করের শিল্পচিত্তকে দীর্ণ করেছিল। সে কারণে তাঁর গল্পে নানা আপাত বিপরীত চিন্তার সমাহার ঘটেছে। 'তারাশঙ্কর শিল্পীর 'সর্বোপরি দৃষ্টি' এবং স্রষ্টার করুণাময় সহমর্মিতা দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের প্রতিদিনের স্খলন-পতন-ত্রুটি। মানবতাবোধের জ্যোতির্ময় আলোকে মানুষের অমানুষিকতার স্বরূপ উন্মোচনই তাঁর কথাশিল্পের বিষয়বস্তু। সমাজের উচ্চমঞ্চের বিচিত্র চরিত্রের নরনারী যেমন তাঁর সৃষ্টিলোকে দেখা দিয়েছে, তেমনি ব্রাত্য ও অন্ত্যজ সমাজের অজ্ঞতাপূর্ব অদ্ভুতচরিত্রের অসংখ্য মানুষও ভিড় করে এসেছে তাঁর গল্পসাহিত্যে।'[২১] তাঁর *ছলনাময়ী* (১৯৩৬), *জলসাঘর* (১৯৩৭), *রসকলি* (১৯৩৮), *যাদুকরী* (১৯৪৪), *হারানো সুর* (১৯৪৫) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুললিত। জীবন রূপায়ণের দক্ষতায় এসব গ্রন্থ উজ্জ্বল। তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্প শিল্পসফল হলেও কিছু কিছু গল্পে রয়েছে গঠনশৈথিল্য। তাঁর 'জলসাঘর' গল্পে বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের গৌরবমহিমার অসামান্য রূপ অঙ্কিত হয়েছে। 'রসকলি', 'বেদেনী', 'হারানো সুর', 'নারী ও নাগিনী' প্রভৃতি গল্পে রাঢ়ের বৈষ্ণবজীবন এবং নিম্নবর্গীয় মানুষের আদিকামনাতাড়িত বৈচিত্রম্যয় জীবনাচরণ বিশ্বস্ত রূপ লাভ করেছে।

বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত দৃষ্টির কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে 'বাস্তবতার' সফল শিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হন। 'কল্লোলের সচেতন রবীন্দ্রবিরোধীতা নয়, ভাঙনপ্রমত্ত যৌনচেতনার রোমান্টিক মোহাচ্ছন্নতা নয়, বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা করতে, বাস্তবঘনিষ্ঠ চরিত্র চিত্রণের তাগিদে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চার শুরু।'[২২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের গল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন এবং ব্যক্তির আদিম প্রবৃত্তির বিশ্লেষণধর্মী রূপ প্রস্ফুট। এতৎসত্ত্বেও প্রথম পর্যায়ের গল্পে বাস্তবজীবনই অকৃত্রিমভাবে অঙ্কিত হয়েছে। 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'সিঁড়ি', 'ভূমিকম্প', 'ফাঁসি', 'টিকটিকি', 'মহাকালের জটার জটা', 'হলুদ পোড়া' প্রভৃতি গল্পে মনোবিকলনের পরিচয় প্রস্ফূটিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদী শ্রেণিচেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এসব গল্পে মানুষ অস্তিত্বরক্ষার নিরন্তর সংগ্রামকে মুখ্য করে তুলেছেন। 'হারানের নাত জামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'নমুনা', 'সাড়ে সাত সের চাল', 'একান্নবর্তী' প্রভৃতি গল্পে শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে অবজ্ঞাত মানুষের সংঘশক্তির উজ্জীবনই

---

[২১] জগদীশ ভট্টাচার্য, তারাশঙ্করের জীবনী, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৫০

[২২] মনোজ মুখোপাধ্যায়, বাংলা ছোটগল্প উৎস ও স্বরূপ, প্রথম প্রকাশ, বামা পুস্তকালায়, পৃ. ৯৪

স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। লেখকের মননশীল পরিচর্যায় তাঁর ছোটগল্প প্রকরণগত শিল্প সৌকর্যে সিদ্ধি লাভ করেছে।

কল্লোলের কালেই আরো কিছু সাময়িকপত্র যেমন *ভারতবর্ষ*, *প্রবাসী*, *শনিবারের চিঠি*, *বিচিত্রা*, *অলকা*, *আনন্দবাজার* প্রভৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। এসব পত্রিকাকে ঘিরে আবির্ভূত হয় নতুন এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী। যারা কল্লোলের সাহিত্যিক চেতনার বিপরীতে হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত মানবজীবনের আশাবাদী, ইতিবাচক ভাবনাকে চিত্রিত করেন গল্পে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০), সজনীকান্ত দাশ (১৯০০-১৯৬২), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০১-২০০১). গজেন্দ্র কুমার মিত্র (জন্ম ১৯০৮), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫-১৯৮০), আশাপূর্ণাদেবী (১৯০৯-১৯৯৫) প্রমুখ। এসব সাহিত্যিক যুগযন্ত্রণা ও জীবনের নানা অসঙ্গতি থেকে মুক্তি পেতে আশ্রয় নেন কৌতুকের। কৌতুক ও হাস্যরসের মাধ্যমে গল্পে তুলে ধরেন মানবজীবনের নানা অসঙ্গতি। ছোটগল্পে বিষয় বিন্যাসে অলৌকিকতা ও অতিলৌকিকতাকে আশ্রয় করেন এসব ছোটগল্পকার। নাটকীয়তা, রীতি-ভাবের বৈচিত্র্য, পরিমিতিবোধ, বাকচাতুর্য, নির্মল হাস্যকৌতুকের পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপও এঁদের গল্পে ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বনফুল নামেই তিনি লিখেছেন এবং পরিচিতি পেয়েছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। তিনি মনোনিবেশ করেন মানুষের প্রবহমান জীবনের প্রতি। বিজ্ঞানমনস্কতা ও পরিমিতিবোধের বিশিষ্টতায় তাঁর ছোটগল্প শিল্পনিপূণ। ছোটগল্পে জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভর করেন নিজস্ব উপলব্ধির ওপর। 'বনফুলের সাহিত্যচিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–অভিজ্ঞতা উপলব্ধি-জাগৃতিজাত সূক্ষ্ম জীবনাভিজ্ঞতার বহুকৌণিক এবং বহুবর্ণিল প্রকাশ।...জীবনপ্রবাহের অখণ্ড রূপকে তিনি প্রকাশ করেন বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ব্যতিক্রমী শিল্পসৌন্দর্যে। জীবনরূপ প্রকাশে অপ্রচলিত রীতি ও পদ্ধতি বনফুলের ব্যতিক্রম শিল্পসৌন্দর্যে।'[২৩] ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক পরিচর্যায় নিরীক্ষা চালিয়েছেন তিনি। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় 'অণুগল্প' একান্তই বনফুলের নির্মাণ। তাঁর উল্লেখযো্য ছোটগল্প 'অমলা', 'খেঁদি', 'বিধাতা', 'বুধনী', 'মানুষের মন', 'পাঠকের মৃত্যু' 'তাজমহল', 'নিমগাছ' প্রভৃতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় উল্লেখযোগ্য নাম সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৭০), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯২২-১৯৮২), সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সোমেন চন্দ

---

[২৩] মিজানুর রহমান খান, বনফুলের ছোটগল্প: জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ ৪১

Dhaka University Institutional Repository

(১৯২০-১৯৪২) প্রমুখ। বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিক, বিষয় নির্বাচন, দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন সব দিক থেকেই এঁরা গল্পে সংযোজিত করেছেন নতুন মাত্রা। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর জীবনবাস্তবতা, অর্থনৈতিক সংকটকে অভ্রান্ত রূপে ছোটগল্পে তুলে ধরলেন সুবোধ ঘোষ। 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'জতুগৃহ', 'অযান্ত্রিক', 'গোত্রান্তর', 'কালপুরুষ', 'গরল অমিয় ভেল' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের নানাদিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, নরনারীর সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর ছোটগল্পে। 'যে সমাজে তিনি বড়ো হয়েছেন, সেই সমাজের খুঁটিনাটি বর্ণনা ও তারই মধ্যে মানুষের চাওয়া পাওয়ার ও দেওয়ার অসামান্যতাই তাঁর সাহিত্যে স্থান দখল করে আছে।'[২৪] 'বস', 'দোলা', 'সেতার', 'ঘুষ', 'স্ফুলিঙ্গ', 'চাঁদমিঞা' তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্পে মানবমনের গূঢ় রহস্য ও সৌন্দর্য উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর গল্পে 'শ্রেনিভুক্ত মানুষ অপেক্ষা স্বকীয়তা, স্বতন্ত্র ও নিজস্ব সম্পূর্ণতায় বিশিষ্ট মানুষকেই তিনি দেখতে ও দেখাতে চান।'[২৫] 'গিরগিটি', 'সোনার চাঁদ', 'চোর', 'পাশের ফ্লাটের মেয়েটা', 'আলোর পাখি', 'শালিক কি চড়ুই' প্রভৃতি গল্পে তিনি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে মানুষের অন্তর্জীবনের নানা দিক বিশ্লেষণ করেছেন।

সমাজ সচেতন কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। যুদ্ধপরবর্তী মন্বন্তরের ভয়াবহ রূপ, মধ্যবিত্তের জীবনসংকট তাঁর গল্পে বিষয় হিসেবে এসেছে। 'পুষ্করা', 'মৃত্যুবাণ', 'টোপ', 'ভোগবতী' প্রভৃতি ছোটগল্প যুদ্ধ ও মন্বন্তরের চিত্রে সমৃদ্ধ। মার্কসবাদী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী সোমেন চন্দ তাঁর গল্পে সচেতনভাবে সাম্যবাদী আদর্শের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে খুব কম বয়সেই নিহত হন সোমেন চন্দ। মাত্র কয়েকটি গল্প লিখেই তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে। 'সংকেত', 'দাঙ্গা', 'ইদুঁর', 'একটি রাত', 'বনস্পতি', 'মুহূর্ত' প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে বাঙালির রাজনীতি-অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা চলতে থাকে। কলকাতার পাশাপাশি ঢাকায়ও সাহিত্যচর্চাভূমি গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের (পূর্ববাংলা) সাহিত্যের যাত্রা পঞ্চাশের দশকে সূচিত হলেও এর অনেক আগে থেকেই এ অঞ্চলের

[২৪] শাহাদুজ্জামান, সাক্ষাৎকার: হাসান আজিজুল হক, কথা পরম্পরা, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৩০-৩১

[২৫] অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা: বাংলা ছোটগল্পের একশবছর, দেজ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ৩৭৪

বেশকিছু সাহিত্যিকের রচনায় স্বতন্ত্র ভাবধারা লক্ষ করা যায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৮৮), মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪- ১৯৫১), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), আবু রশ্‌দ (জন্ম ১৯১৯), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭) প্রমুখ কথাশিল্পী। এঁদের কথাসাহিত্যে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজের জীবনসংগ্রাম, ধর্মাশ্রিত সংস্কার, আধুনিক ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের গল্পের বিষয় গ্রামীণ জীবন থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ *ত্রিস্রোতায়* (১৯৩৯) গ্রামের স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদ ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখে সমকালে প্রসংশিত হয়েছেন। সমাজের মানুষের ভণ্ডামি, কপটতা, মূর্খতা, ব্যাভিচার, অত্যাচারের মতো বিষয়বস্তু তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। অসৎ রাজনীতিবিদ, কপট সমাজসেবক, মোল্লা মৌলবিদের হীনম্মন্যতা, কুৎসা রটনা, ইসলামি শিক্ষার নামে প্রগতির বিরোধিতা প্রভৃতি বিষয় বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তাঁর গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। *আয়না* (১৯৩৫), *ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪)* গ্রন্থ তাঁর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

গ্রামীণ জীবনের রূপকার হিসেবে আর্বিভাব ঘটে মাহবুব-উল-আলমের। ধর্মান্ধতা, আর্থিক অব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক দৈন্য তাঁর গল্পের মুখ্য বিষয়। আবুল ফজল মুসলমান সমাজের প্রগতিশীলতাকে আশ্রয় করে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। আধুনিক জীবনবোধ, অসাম্প্রদায়িক ভাবনা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের ভাবালুতা, স্বপ্নকাতরতা প্রভৃতি বিষয় তিনি ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। *মাটির পৃথিবী* (১৩৩৮), *আয়ষা* (১৩৫৮), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৩৩৭), *মৃতের আত্মহত্যা* (১৯৭৮) তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। বাংলা কথাসাহিত্যে মাহবুব-উল আলম গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একজন লেখক। তিনি জীবনকে চিত্রিত করেছেন নিগূঢ় মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। আঞ্চলিক ও গ্রামজীবনের অশিক্ষা, ধর্মীয় সংস্কার, গোঁড়ামি এবং সর্বব্যাপী দুঃখ-দৈন্য তাঁর গল্পের প্রধান বিষয় হয়েছে। মাহবুব-উল আলমের *তাজিয়া* (১৯৪৬) গ্রন্থের প্রধান গল্পগুলিতে ইসলামি ঐতিহ্যনির্ভর জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে। বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন রূপায়ণে অদ্বৈত মল্লবর্মণ অন্যতম পথিকৃৎ।

বিভাগোত্তর ছিন্নমূল মানুষের আর্তনাদ ও হাহাকারের যন্ত্রণা পঞ্চাশের দশকের ছোটগল্পে একটি বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'একটি তুলসী গাছের আত্মকাহিনী' গল্পে তার মর্মন্তুদ উচ্চারণ ঘটেছে। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক চেতনাপ্রবাহরীতির প্রবর্তক। আধুনিক শিল্পদৃষ্টির কারণে অন্য লেখকদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকরণে বিশ্বমুখী হলেও স্বদেশের মাটি-মানুষ, গ্রাম-প্রকৃতিনির্ভর বাস্তবতা তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, প্রেম, সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা, মন্বন্তর, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতি তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। সমাজ-অনুষঙ্গের ভিত্তিতে জীবনের বহির্বাস্তবতা রূপায়ণের পাশাপাশি ওয়ালীউল্লাহ্ বিশ্লেষণ করেছেন ব্যক্তির মনোজগৎকেও। তিনি জীবন অনুধ্যানে যেমন সূক্ষ্মদর্শী, জীবনের প্রকাশ-প্রকরণেও তেমনি মননশীল, পরিশ্রমী ও আধুনিক। তাঁর *নয়নচারা* (১৯৪৫) ও *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫) গল্পগ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে এই প্রবণতার শাণিত প্রকাশ ঘটেছে। গল্পের চরিত্রসমূহ অস্তিত্বের টানাপোড়েনে জীবনযন্ত্রণার চাপে জর্জরিত, দ্বন্দ্বময়, কখনো বা ছিন্নমূল। *নয়নচারা* (১৯৪৫) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগাল্পিক জীবনবীক্ষার অনুবিশ্ব। এ গ্রন্থের গল্পগুচ্ছে ঘটনাপ্রবাহ, চিত্রপুঞ্জ, বর্ণনাংশ, চেতনা ও সংবেদনালোক সর্বোপরি জীবনকে রূপময় দৃশ্যমান করার অভিপ্রায়ে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রের নিগূঢ় অর্ন্তময় চেতনাকোণ থেকে অতীতের স্মৃতিময় ঘটনার রূপায়ণে লেখক কখনো ব্যবহার করেছেন 'ফ্লাশব্যাক' পদ্ধতি। 'নয়নচারা', 'জাহাজী', 'খুনি' প্রভৃতি গল্পে কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক চরিত্রের স্মৃতিচারণায় অথবা চরিত্রের অন্তর্গত অনুভবে উপস্থাপিত হয়েছে ঘটনাপুঞ্জ। অন্ধকার এবং নৈশব্দ্যের পটভূমিকা ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে পৌনঃপুণিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'খণ্ডচাঁদের বক্রতায়', 'মৃত্যু যাত্রা', 'নয়নচারা' গল্পে বর্হিবাস্তব ও অন্তর্বাস্তবের সূক্ষ্ম স্তরময় বর্ণনায় আলো-অন্ধকারের রহস্যমেদুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে কিছু মৌলিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এ সময়কার সমাজগতিতে অর্থনৈতিক সংকট ও উদ্বাস্তু সমস্যা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা বন্ধ হওয়াতে জনজীবনে স্থবিরতা নেমে আসে এবং নানা রকম অন্যায় অপকর্ম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। একই সাথে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত হিন্দু এদেশ ছেড়ে পশ্চিম বঙ্গে চলে যাওয়ায় বিভিন্ন অফিস আদালতে ও শিক্ষাক্ষেত্রে মেধাশূন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়, এবং সেসকল স্থানে অযোগ্য ও অদক্ষ লোক নিয়োগ করা হয়; এক ধরনের সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হলেও ব্রিটিশ শাসনামল থেকে কাঁচামালের যোগানদার হিসেবেই এদেশ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু কলকারখানা সব গড়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গে। নব্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রেও সে ভূমিকাই অব্যাহত থাকে। জাতীয় পুঁজির নিয়ন্ত্রণে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়। একদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য ও বৈষম্য অপরদিকে অর্ধ শিক্ষিত ও অদক্ষ লোকদের উচ্চপদে চাকরি এই দুই বিপরীত চিত্র তৎকালীন কথাশিল্পীরা ধারণ করেছেন তাঁদের ছোটগল্পে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাশের দশকের গুরুত্বপূর্ণ লেখক শতকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতিশ্রুতিশীল কথাশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম তিনি। তাঁর *পিঁজরাপোল* (১৯৫০), *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫০), *সাবেক কাহিনী* (১৯৫৩) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে মূলত গ্রামজীবন-আশ্রয়ী নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের ইতিকথা অঙ্কিত হয়েছে। 'জীবন ও সমাজের সূক্ষ্মদ্রষ্টা হিসেবে গ্রাম ও শহরের আবেষ্টনী থেকে কথাসাহিত্যে তিনি যে মাটি ও মানুষের প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন তা নিরতিশয় বাস্তবমণ্ডিত, চেতনাদর্শী ও শিল্পনিপূণ।'[২৬]

বিভাগোত্তর কালে বাংলাদেশের মানুষ নিমজ্জিত হয় আত্মপরিচয়ের সংকটে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এসময় পাকিস্তানি হিসেবে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার দাবি করে। বাংলাদেশের বাঙালিদের পরিচয় তাদের কাছে মুসলমান ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সংস্কৃতি ও ভাষার প্রশ্নে তাদের পরিচয়ের প্রশ্নটি আরো সামনে আসে এবং জাতি হিসেবে তাদের পরিচয় কী হবে সেটি মুখ্য একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষার গতিপ্রক্রিয়া স্তব্ধ করার জন্য জারি করা হয় দমননীতি। পূর্ব বাংলার প্রধান ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চলে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন। রাজনীতি এবং সমাজ সংস্কৃতির অন্তর্ভুবনে ভাষা আন্দোলন সঞ্চার করে স্বাধিকার প্রত্যাশী চৈতন্য। এই চেতনাকে ধারণ করেই বাংলা ছোটগল্পে শ্রেণিচেতনা ও সংগ্রামী চেতনার গল্প লেখা হয়।

পঞ্চাশের দশকের বাংলা ছোটগল্পে আরও যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তাঁরা হলেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০১), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৩৩), আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩১), জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) প্রমুখ ।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে মূলত গ্রামজীবন। দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামজীবন, শিক্ষা সংস্কৃতির অনগ্রসরতা, গ্রাম্য মোড়লদের শোষণ-নির্যাতন, সামাজিক অসঙ্গতি প্রভৃতি বিষয় তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পে। পঞ্চাশের দশকে লেখা তাঁর গল্পগ্রন্থ *নয়ান ঢুলী* (১৩৫৯), *বীরকণ্ঠী বিয়ে* (১৩৬২), *খরস্রোত* (১৩৬২) প্রভৃতি। এসব গ্রন্থে গ্রামজীবনের সংকটকে মমতার সাথে তুলে ধরেছেন তিনি। *বীরকণ্ঠীর বিয়ে* গ্রন্থের 'বয়াতি', 'গোলাপির সংসার', 'কোয়েলা', 'নসিমন', 'বীরকণ্ঠীর বিয়ে'; 'খরস্রোত' গ্রন্থের 'কসম', 'মাটি' প্রভৃতি গল্পে গ্রামীণ শোষণ-নিপীড়ন, অভাব ও দারিদ্র্যের অকৃতিম রূপ অঙ্কিত হয়েছে। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পের প্রধান উপজীব্য গ্রামজীবন হলেও লেখক

[২৬] অনীক মাহমুদ, বাংলা কথা সাহিত্যে শওকত ওসমান, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৬

ইতিহাস ও কালসচেতন। বিভাগোত্তর কালের সমাজে যে ধরনের সামাজিক অনিশ্চয়তা, প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল তা তাঁর গল্পে পাওয়া যায়। 'জয়েনউদ্‌দীন যে পল্লী সমাজের ছবি এঁকেছেন সেখানে রয়েছে অসংখ্য নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ। দারিদ্র্য তাদের নিত্য সহচর। সে সমাজে তাদের মাথার উপর মড়ক শকুনের ন্যায় উড়ে বেড়াচ্ছে লম্পট জমিদার, গ্রাম্য মোড়ল, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, ভণ্ডপীর, স্বার্থপর প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী, দারোগা, পুলিশ ও সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থরা। বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতে উদ্যত। সমাজে মানবতার নিত্য অপমান।'[২৭]

বিভাগপূর্ব কাল থেকেই শিক্ষা বিভাগ অবহেলিত একটি ক্ষেত্র। শিক্ষকদের বেতন কম, গ্রামের জমিদার ও জোতদারদের দয়া-দাক্ষিণ্য ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ভর করে চলে শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়। ১৯৪৭ সালের পরও শিক্ষা সেই অবহেলিত স্তরেই থেকে যায়। হাতে গোনা কয়েকটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর সবই ছিল অনিশ্চয়তার মধ্যে। বিভাগোত্তর কালের এ বাস্তবতা ধরা পড়েছে আবদুল গাফফার চৌধুরীর *সুন্দর হে সুন্দর* গ্রন্থের 'উত্তরণ' গল্পে। শওকত, আসান মিজির বড় ছেলে। লেখাপড়া শিখে সে শহরে চাকরি করে। শহর থেকে ফেরার পথে শওকত স্টীমার ঘাটে নামেন। সেখানে রাতের অন্ধকারে তার বাল্যকালের শিক্ষাগুরচ নেয়ামত মাস্টার কুলি হয়ে তার মালপত্র টেনে দেয়। এক টাকার বদলে শওকত তাকে দশ টাকা দিতে চায়। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুই না নিয়ে বিদায় নেয়। পড়ে শওকতের পিওনের সাথে আলাপ পরিচয়ে জানতে পারে পিয়নের বেতন মাস্টারের চেয়ে দ্বিগুণ। মাস্টারের বেতন ৩০ টাকা। তাও তিন চারমাস পরে পায়। কিন্তু রহিম পিয়ন মাসের শুরচতেই ৬০ টাকা পায়। তাই নিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নেয়ামত মাস্টার রহিম পিয়নের সঙ্গেই তার মেয়ের বিয়ে দেন। সমাজের এই যে উত্তরণ মানসিকতা এটা বাস্তবতারই ফল।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা ছোটগল্পের জগতে আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২) তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর নিয়ে আবির্ভূত হন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে পূর্ববঙ্গের সমাজ রাজনীতির একজন একনিষ্ঠ লেখক তিনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি অবলোকন করেছেন বিভাগোত্তর কালের বাংলাদেশের সমাজকে; এবং তার ছোটগল্পে এ সমাজেরই নিখুঁত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। *জেগে আছি* (১৯৫০), *ধান কন্যা* (১৯৫১), *মৃগনাভি* (১৯৫৪) প্রভৃতি গ্রন্থে লেখক পরিশ্রমজীবী মানুষের জীবনবাস্তবতাকে রূপদান করেছেন।

---

[২৭] সুনীল মুখোপাধ্যায়, পূবালী, প্রথম বর্ষ, চৈত্র ১৩৬৭, পৃ. ৭৭

'কাঠের নক্‌শা' গল্পে লেখকের শ্রেণিচেতনার শৈল্পিক প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য। নির্মাণ মিস্ত্রীদের মজুরি বাড়ানোর প্রতিবাদ এবং রহমান অস্তাগারের বিশ্বাসঘাতকতায় সে আন্দোলনের ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের করুণ চিত্র একেঁছেন লেখক। মিছিল বন্দরের রাস্তায় ঢোকার আগেই লালপাগড়িওয়ালা গুণ্ডারা ভেতর থেকে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিল। 'বাবাকেই গ্রেপ্তার করা হল সর্বপ্রথম। দারোগার কাছে দাঁড়িয়ে রহমান বলতে লাগল, আমি আগে বলিনি এসব ভালো নয়? আজকের দিনে এক টাকা মজুরী দেয় কে? তবুও তোমরা শুনলে না, এসব ওপরওয়ালার ব্যাপার, বুঝেশুনে কাজ করতে হয় হে! দুনিয়াটা পাগলামোর জায়গা নয়।'[২৮]

বিভাগোত্তর বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক বিভেদ একই রকম থেকে যায়। হিন্দু মুসলিমের ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যকে জিইয়ে রেখে উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে দাঙ্গার মতো জঘন্য ঘটনা ঘটিয়ে যেসব নেতৃবৃন্দ সুবিধাভোগী হয়েছেন লেখক তাদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। *জেগে আছি* গ্রন্থের 'ছুরি' ও 'শিকড়'; *ধানকন্যা* গ্রন্থের 'রোগমুক্তির ইতিবৃত্ত', 'মেঘনা' প্রভৃতি গল্পের কাহিনি রচিত হয়েছে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে। লেখকের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এসব গল্পে শিল্পমূল্য অর্জন করেছে।

আবু রুশদের (১৯১৯) গল্পের ভুবন মূলত শহরাশ্রিত। শহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতা ও যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের বহির্বাস্তব অঙ্কনে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তিনি। *রাজধানীতে ঝড়* (১৯৩৮) ও *প্রথম যৌবন* (১৯৪৮) তাঁর দু'টি উলেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। *প্রথম যৌবন* বিভাগোত্তরকালের রচনা। এ গল্পগ্রন্থের কাহিনি গ্রন্থনে লেখকের রোমান্টিক জীবনজিজ্ঞাসা প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনার তরঙ্গাঘাত নাগরিক জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত করে, আবু রুশদ তাঁরই চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পে।

১৯৪৭-পরবর্তীকালের সমাজের অন্তর্বাস্তব ও বহির্বাস্তবকে আন্তরিক মমতায় গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার শাহেদ আলী (১৯২৫)। গ্রামজীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতা, সমাজ কাঠামো, শোষণ বঞ্চনা বৃহৎ ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন লেখক। বিভাগোত্তর বাংলাদেশে ক্ষুধার যন্ত্রণার পাশাপাশি তিনি ধর্মের ভণ্ডামির চিত্র তুলে ধরেছেন 'পোড়ামাটির গন্ধ' গল্পে। এ গল্পের হাজেরা চরিত্র অঙ্কনে লেখকের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। নিজে ধর্মবিশ্বাসে আস্থাবান হলেও লেখকের বাস্তবতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে হাজেরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সে ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির। তার স্বামী হাতেমের কাছে ধর্মবিশ্বাসই সব। কিন্তু হাজেরার ক্ষুধার কাছে গৌণ হয়ে যায় ধর্মবিশ্বাস। স্বামীর দারিদ্র্য বিষয়ে সে প্রতিবাদী-- 'সারাজীবনে নামাজ তো কম পড়েনি হাতেম। কিন্তু কই, কিছুই তো পেলো না আজো। শুধু কি বেহেস্তের লোভে

[২৮] আলাউদ্দিন আল আজাদ, স্বনির্বাচিত গল্প, প্রথম প্রকাশ ২০০২, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ২৩

নামাজের ভড়ং। ঝাঁজালো কণ্ঠে হাজেরা বলে ওঠে জ্বর আইছে ভালা হইছে। আমি পারতামনা। ছওয়াবের ভাঁড়ার তুমিই ভরো। আমি দোজখেই যাইতে পারলে বাঁচি।'[২৯]

সীমাহীন দারিদ্র্যের কষাঘাতে বিভাগোত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ এক প্রকার মুখ থুবড়ে পড়ে। কেউ কেউ দারিদ্র্য বিমোচনে অসৎ জীবনে প্রবেশ করলেও কিছু মানুষ নীতি নৈতিকতায় অবিচল থাকে। নীতি-নৈতিকতা যখন দারিদ্র্যের রূঢ় বাস্তবকে অতিক্রম করতে পারে না তখন তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক ধরনের মনোবিকলন। তারা ডুব দেয় অতিলৌকিক কল্পনার জগতে; যা মূলত অসুস্থ সমাজ জীবনেরই ফল। এ বাস্তবতারই কাহিনী শাহেদ আলীর 'জিরাইলের ডানা' গল্পটি; যেখানে দরিদ্র নবী ঘুড়ি উড়িয়ে খোদার আরশ স্পর্শ করার দুরূহ প্রচেষ্টায় লিপ্ত। নবীর এক সময় উত্তরণ ঘটে স্বপ্নকল্পময় জগতে। এ গল্পের মধ্যে দিয়েই শাহেদ আলী একজন শক্তিশালী ছোটগল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নেন।

বিভাগোত্তর কালের ছোটগল্পকারদের মধ্যে শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬) উলে-খযোগ্য। আবেগময় চিত্রায়ণই প্রধান হয়েছে তাঁর গল্পে। মূলত গ্রামজীবনের রূপকার তিনি। বাংলাদেশের মাটি-মানুষ, জল-নদী তাঁর গল্পে জীবন্ত রূপ পেয়েছে। *অনেক দিনের আশা* (১৯৫২), *পথ জানা নেই* (১৯৫৩), *দুই হৃদয়ের তীর* (১৯৫৫) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের গল্পে মূলত সমস্যাসংকুল গ্রামজীবনের একরৈখিক চিত্রই ফুটে উঠেছে। তাঁর গল্পে সমকালীন সমাজের বাস্তবতার চিত্রই ফুটে উঠেছে; যদিও তা মাঝে মাঝেই গল্পের শিল্পরূপকে ব্যাহত করেছে।

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে রাস্তা তৈরি করেছিল মূলত দুটি উদ্দেশ্যে। প্রথম উদ্দেশ্যে শাসনের জন্য বিভিন্ন জনপদে দ্রচত যাতায়াত। দ্বিতীয়ত এদেশের উৎপাদিত শস্য কাঁচামাল হিসেবে ইংল্যান্ডে প্রেরণ। পাকা রাস্তা নির্মাণের এই বাস্তবতা বিভাগোত্তরকালেও রয়ে যায়। রাস্তা বেয়েই নানা রকম ফলমূল শাকসব্জি, ফসল মাউলতলী গ্রাম থেকে চলে যায় শহরে এবং শহর থেকে খুন, ছিনতাই রাহাজানির মতো দুষ্কর্ম প্রবেশ করে গ্রামে। পাকা সড়ক নির্মাণের যে আশা মাউলতলী গ্রামবাসীর সুখ প্রাচুর্যময় জীবনের স্বপ্ন, তা একসময় পরিণত হয় ভয়ানক দুঃস্বপ্নে। সমকালীন সমাজের এই বাস্তবতাকে বিষয় করে রচিত হয়েছে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'পথ জানা নেই' গল্প।

[২৯] শাহেদ আলী, জিবরাইলে ডানা, মুক্তধারা, পঞ্চম প্রকাশ, ১৯৯৫ ঢাকা, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগোত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) এক উজ্জ্বল নাম। বহুমাত্রিক এই লেখক পঞ্চাশের দশকে ছোটগল্পের নিরীক্ষাধর্মী চর্চার মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরচ করেন। তাঁর ছোটগল্পে নিজস্ব জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন স্পষ্ট। পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত *তাস* (১৯৫৪) গল্পগ্রন্থে লেখকের আধুনিক জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক নির্মাণশৈল্পী সম্পর্কেও তিনি সচেতন। *তাস* গ্রন্থে পঞ্চাশের দশকের বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজ তার মনোজগৎ ও বস্তগত স্বপ্ন, তার সামাজিক রাজনৈতিক, আকাঙ্ক্ষা শিল্পরূপ লাভ করেছে।'[৩০]

ভাষা আন্দোলন বিভাগোত্তর বাংলাদেশের সমাজগতিতে সবচেয়ে বড় প্রেরণা সৃষ্টিকারী ঘটনা। এ ঘটনা বাংলাদেশের মানুষের জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তার প্রভাব পড়ে শিল্প-সাহিত্যে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষা তথা বাঙালির অস্তিত্ব মোচনের হীন চেষ্টা বাংলার জনগণ মেনে নেয়নি। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রচয়ারি রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি বাঁচিয়ে রাখে নিজেদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে।

শওকত ওসমানের 'মৌন নয়' গল্পটি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে একুশে সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ গল্পের কাহিনি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপ্তি বিশাল। এ গল্পের প্রধান চরিত্র জনৈক বৃদ্ধের প্রশ্নের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায় আক্রমণ প্রসঙ্গ ব্যাপক বিস্তৃতি পায়। একটি চলন্ত বাসে ১০/১২ জন যাত্রী। সকলেই নিশ্চুপ এমনকি কন্ডাক্টর পর্যন্ত। বাসের মধ্যে বসে আছে একজন শোকাহত বৃদ্ধ। সকলের দৃষ্টি তার দিকে। চাষি ছাত্র জনতা সকলেই নিশ্চুপ। কন্ডাক্টরের হাতে টাকা দিয়ে সবাই নীরবে নেমে যাচ্ছে। কারও মুখে কথা নেই। সবাই যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। বাস এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ নীরবতার জগদ্দল ভেঙে বৃদ্ধ আর্তনাদ করে ওঠে। ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে সে প্রশ্ন করে–

'কি দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলি করে মারল? কি দোষ কি দোষ করেছিল সে? উঃ

কি দোষ করেছিল সে?' এই জিজ্ঞাসাচিহ্ন ভাসছে তার চোখের ওপর এখনই মুখ থুবড়ে পড়বে বৃদ্ধ বাসের মেঝেয়।

সমস্ত যাত্রী তখন জিনের জায়গা ছেড়ে বৃদ্ধের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। চাষি দুজন তার কোমর জড়িয়ে ধরল যে পড়ে না যায়। ড্রাইভার এক হাতে স্টিয়ারিং অন্য হাত সে সবার আগেই বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

---

[৩০] বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

'জোড়া জোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে দমকে দমকে সিংহ গর্জন এখনই ফেটে পড়বে। সকলের গলার রগ কেঁপে কেঁপে উঠছে দমকে দমকে। নির্বিকার গাড়ি শুধু এগোতে লাগল।'[৩১]

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ব্যাপৃতি ছিল বিশাল। আনিসুজ্জামানের 'দৃষ্টি' গল্প ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা। চালক, জনতা চাকুরে, বৃদ্ধ যুবক নারী সবাইকেই তা কতোটা আলোকিত করেছিল আনিসুজ্জামানের দৃষ্টি গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কেরানি সাদত একজন পেনশনভোগী বৃদ্ধ। ছেলে বৌমা নিয়ে তার অভাবের সংসার। কন্যা সালেহাকে বিয়ে দেওয়া দরকার। ঠিকমতো পেনশন পাচ্ছেন না তিনি। একমাত্র ছেলে আসাদের চাকরির টাকায় সংসার চলে। একদিন ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের চশমাটি পড়ে ভেঙে যায়। পুত্রবধূ জমানো টাকায় শ্বশুরকে চশমা কিনে দিতে চায়। কিন্তু বৌমার অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বৃদ্ধ রাজি হন না। কিন্তু এই অসহায় পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আসাদের অফিসেও ২৩ ফেব্রুয়ারি স্ট্রাইক হয়। তারা প্রতিবাদী মিছিল নিয়ে বের হয়। এই মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। আসাদ মারা যায়। বৃদ্ধ তাঁর জীবনের সবশেষে মর্মান্তিক ঘটনাটি জানতে পারেন। তারপর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। আসাদের অনাগত সন্তানের কথা ভেসে ওঠে তাঁর স্মৃতিতে। এই দারিদ্র্য জর্জরিত পরিবারের বড় সন্তান আসাদ চেতনার উপলব্ধি থেকে সংশ্লিষ্ট হয় ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে। এবং ২২ ফেব্রুয়ারি প্রাণ বিসর্জন দেয় পুলিশের গুলিতে।

বিভাগোত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পের ইতিহাসে জহির রায়হানের ছোটগল্প নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে জহির রায়হান প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশকে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *সূর্যগ্রহণ* (১৯৬২) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে প্রধান বিষয়রূপে বিধৃত হয়েছে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালের ঘটনাবলি। 'সময়ের প্রয়োজনে', 'মহামৃত্যু', 'জন্মান্তর', 'ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি', 'কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ', 'কয়েকটি সংলাপ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। তাঁর গল্প চলচ্চিত্রধর্মী।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত সময় পর্বে বাংলাদেশের ছোটগল্পে সমকালীন দেশকালের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন দৃশ্যমান। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পালাবদলে বাংলাদেশের জনজীবনে এ সময় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের শুরু থেকেই সৃষ্টি হয় বিরোধ। শোষণ-জুলুমের, অন্যায়-

[৩১] একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলন, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, পুঁথিঘর প্রকাশনী, সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ-৫১

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচারের সূচনা করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই। সে কারণে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৯ কালপর্বে বাংলাদেশের ছোটগল্পকাররা অনুকূল পরিবেশ পাননি গল্প রচনার জন্য। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তখন খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি ও পুরোনো ধ্যান-ধারণার পোষকতা করা হয়েছে। সমাজের ক্রমাগ্রগতি ও মুক্তবিশ্বাস পালনের মতো অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ তখন ছিল না। সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিরুদ্ধ পরিবেশ, অবিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই দুইয়ের বৈরী পরিবেশে বাংলাদেশের লেখকদের চিত্ত হয়ে ওঠে সংকীর্ণ। তাঁরা ছিলেন বৃত্তবন্দী। ফলে তাঁদের গল্পের বিষয় ও উপকরণে লক্ষ্য করা যায় পুনরাবৃত্তি। তাঁরা এ সময়ে প্রধানত গ্রামজীবনকেই গল্পের প্রধান ভিত্তিভূমি করেছেন। এ রকম এক কালপর্বে গল্পকার আখতারুজ্জামান বেড়ে ওঠেন। এবং প্রচলিত ব্যবস্থার নিগড় ভাঙতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সমাজেও তখন তৈরি হয় এক প্রবল গতিস্রোত।

১৯৬০ সাল শিল্পসাহিত্যের জন্য এক মহান সৃষ্টিশীল কালপর্ব। এই দশক বাংলাদেশের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল সময় খণ্ড। স্বদেশ চেতনায়, শিল্প-সাহিত্য চর্চায়, আন্দোলন-সংগ্রামে উন্মাতাল এ-সময়। ষাটের দশকে ধর্মভিত্তিক দেশভাগের মোহ কাটিয়ে, বাঙালি জাতি আত্মপরিচয়ের সন্ধানে নামে। নানা দিক থেকে সময়টি সংকট ও নির্মাণের কাল। এ সময় বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের উত্তাপ ও আগুন থেকে একদল তরুণ কবি ও সাহিত্যিক জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁরা অবতীর্ণ হন নানা রকম নিরীক্ষায়, বিতর্কে ও প্রতিরোধে; এবং এ অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নিয়ে আসেন এক নতুন গতি, নতুন মূল্যচিন্তা। একদিকে সামরিক শাসনের পেষণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, অবাঙালি পুঁজির বিকাশ; অন্যদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই সময়কে অস্থির করে তোলে। 'এই কালপর্বে নির্মিত হয় বাংলা ছোটগল্পের শক্তিশালী ভিত্তিভূমি। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ইতিহাসে ষাটের দশকের নতুন বাঁকে নতুন গল্পধারার জন্ম।'[৩২]

চাঞ্চল্যহীন স্থৈর্য্যের মায়া কাটিয়ে যাঁরা গল্পের শরীরে জ্বেলে দেন 'সমকালচঞ্চল জীবনাবেগ, যুগসংক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও দ্রোহ বিদ্রোহ।' সমাজ গতির রূপায়ণ প্রচেষ্টায় এসব গল্পকার ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ দেশের মানুষের অন্তর-প্রকৃতি, প্রত্যাশা, দ্রোহ, যন্ত্রণা সংক্ষোভকে তাঁরা গল্পের বিষয়বস্তু করেন। এঁদের হাত ধরেই বাংলা ছোটগল্প দৃষ্টিগ্রাহ্য বাঁক পরিবর্তন করে। তাঁরা নজর দেন ব্যক্তি ও সমাজের বিচ্ছিন্নতার সূত্রের দিকেও। ষাটের দশকের লেখকদের মধ্যে নিজস্বতা সৃষ্টির তাগিদ ছিল প্রবল। সে কারণে এই দশক নির্মাণ করতে সক্ষম হয় বহুমাত্রিক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রভূমি। এতে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে '*সমকাল*', '*স্বাক্ষর*', '*পূর্বমেঘ*', '*কণ্ঠস্বর*'সহ আরো কিছু সাহিত্য ম্যাগাজিন। এ

[৩২]. সরিফা সালোয়া ডিন, হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প বিষয় ও প্রকরণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০ পৃ. ৩৩-৩৪

সময়ের কোনো কোনো ছোটগল্পকার সমাজ-রাজনীতির গতিমুখ শনাক্ত করে তুলে ধরেছেন গল্পে। ষাটের দশকের সব গল্পকারের গল্পেই যে এসব বৈশিষ্ট্য খুব ভালোভাবে চিত্রিত হয়েছে তা বলা যাবে না। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লেখনবৃত্তির দুর্বলতার কারণে কোনো কোনো গল্পকারের গল্পে সমকালীন সমাজগতি ভালোভাবে চিত্রিত হয়নি। যেসব ছোটগল্পকার ষাটের দশকের সময়পর্বে গল্প রচনায় ব্রতী হন তাঁরা হচ্ছেন আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), সুচরিত চৌধুরী (১৯৩৪-১৯৮৪), মুর্তজা বশীর (জন্ম ১৯৩২), সাইয়িদ আতীকুলাহ (জন্ম ১৯৩৩), মাফরুহা চৌধুরী (১৯৩৪), শহীদ আখন্দ (জন্ম ১৯৩৫), হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭), শওকত আলী (জন্ম ১৯৩৬), হাসান আজিজুল হক (জন্ম ১৯৩৯), জ্যোতি প্রকাশ দত্ত (জন্ম ১৯৩৯), হাসনাত আবদুল হাই (জন্ম ১৯৩৯), রিজিয়া রহমান (জন্ম ১৯৩৯), রাহাত খান (জন্ম ১৯৪০) বুলবন ওসমান (জন্ম ১৯৪০), মাহমুদুল হক (১৯৪০-২০০৮), রশীদ হায়দার (জন্ম ১৯৪১), আবুদস শাকুর (জন্ম ১৯৪১), মাহবুব তালুকদার (জন্ম ১৯৪১), আখতারুজ্জামন ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), সুব্রত বড়ুয়া (জন্ম ১৯৪৬), সেলিনা হোসেন (জন্ম ১৯৪৭), কায়েস আহমদ (১৯৪৮-১৯৯২)।

বিষয় নির্বাচন, লক্ষ্মণের মৌলিকত্ব ও যুগবৈশিষ্ট্য, প্রকরণ-সতর্কতা ও মনোগহন বিশ্লেষণের তারতম্যে ষাটের দশকের লেখকদের অনেকের মধ্যে রয়েছে মেরুদূর ব্যবধান। ষাটের দশকের মৌল বৈশিষ্ট্যই হলো যুগের আগ্নেয় বার্তা, আশার আর নিরাশার স্বপ্নখনন। '৫২-র ভাষা আন্দোলন তছনছ করে ফেলে সামাজিক জড়তা, চূর্ণ করে মানবিক স্থবিরতা ও দাসত্ব এবং ভেঙে দেয় বাঙালির উৎস মুখের জটিলতা। নতুন বোধ, উৎসাহ এবং চিন্তার আলো পতিত হয় লেখকের মনোভূমিতে এবং তাঁর শিল্পের হৃৎপিণ্ডে।'[৩৩] নাজমুল আলম, সুচরিত চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, মাফরুহা চৌধুরী, হুমায়ুন কাদির, হাসনাত আবদুল হাই, রিজিয়া রহমান, বুলবন ওসমান, মাহবুব তালুকদার প্রমুখ শিল্পীর গল্পের রচনায় ষাটের যুগলক্ষ্মণ অনুপস্থিত। অন্যদিকে চলিশ ও পঞ্চাশের দশকের কোনো কোনো গল্পকারের গল্প রচনা অব্যাহত থাকে ষাটের দশকে। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সেসব শিল্পী কালসচেতন হয়ে ওঠেন গল্পের বিষয় নির্বাচন ও প্রকরণ পরিচর্যায়। এঁদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ শামসুল হক অন্যতম।

ষাটের দশকের মধ্যপর্যায়ে প্রকাশিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫) গ্রন্থে সমকালীন যুগবৈশিষ্ট্য, সমাজগতি রূপায়ণের প্রচেষ্টা রয়েছে। দেশকাল ও ইতিহাসের পটভূমিকায় পাকিস্তানি সামরিক শাসনের পেষণে পিষ্ট পূর্ব বাংলার মানুষের

[৩৩]. সুশান্ত মজুমদার সম্পাদিত, বাংলাদেশের গল্প: সত্তর দশক, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্ব সংকট ও যন্ত্রণা স্থান পেয়েছে *দুইতীর ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের গল্পগুলোতে। কালসচেতন এসব গল্পে 'নিরাসক্ত দ্রষ্টার মতো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ইতিহাসের নিষ্ঠুর নিয়তি এবং উপলব্ধি করেছেন ভাগ্য-তাড়িত মানুষের সীমাহীন বিপর্যয় ও লাঞ্ছনা।'[৩৪] দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা, মন্বন্তর, দারিদ্র্যের পীড়ন মানুষের অস্তিত্বে রচনা করে বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্ন মানুষের জীবনচিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এবং সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কপট ধর্মতান্ত্রিক মনোভাব ও তা চাপিয়ে দেওয়ার নানা নিয়মনীতির বিরচদ্ধে পূর্ব বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে বাঙালি জনমানসকে। সামরিক ভীতি, ধর্মভীতি, সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা, উপেক্ষা করে এ দেশের নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তার জাতিগত মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হয়। ষাটের দশকে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে সমকালীন এ সমাজগতি অনিবার্যভাবে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর *রক্তগোলাপ* (১৯৬৪) ও *আনন্দের মৃত্যু* (১৯৬৭) গল্পগ্রন্থে পূর্ববাংলার বিকাশশীল মধ্যবিত্তের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ নানা মাত্রায় চিত্রিত হয়েছে। সমান্তরালভাবে রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিক মধ্যবিত্তের অবক্ষয় ও সঙ্কটকেও গল্পে স্থান দিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক।

ষাটের দশকের অন্যতম গল্পকার শওকত আলী। ব্যতিক্রমী এই লেখক যুগের উত্তাপ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে গভীর মনোনিবেশ করেন গ্রামীণতটে অবস্থিত প্রান্তিক মানুষের জীবনসত্য ও সমাজ-ইতিহাসের প্রত্ন-প্রকৃতি উন্মোচনে। ষাটের দশকে প্রকাশিত *উন্মূল বাসনা* (১৯৬৮) গ্রন্থে নিম্নবর্গের মানুষের আদিম যৌনবাসনা, অভ্যাস, আচরণ, ভাষা, তাদের সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রকৃতি আঞ্চলিক ফ্রেমে বিম্বিত করেছেন তিনি।

ষাটের দশকের শুরুতেই আত্মপ্রকাশ করেন হাসান আজিজুল হক। এই দশকের বৈশিষ্ট্য, নিজস্বতা সন্ধান, তাঁর গল্পে প্রথম পূর্ণমাত্রায় ধরা পড়ে। জীবনদৃষ্টির সমগ্রতা, সমকালীনতা ও শিল্পসৃষ্টির বৈচিত্র্যে হাসান আজিজুল হক ষাটের দশকের শক্তিমান গল্পকার। উত্তর বাংলার গ্রামজীবন, তার গল্পের কেন্দ্রীয় শিল্প উপাদান। দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জীবনের অস্তিত্ব সংকট, অর্থনৈতিক নিপীড়ন, শোষণ, জুলুমে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মানুষের গভীর জীবনসত্য অঙ্কিত হয়েছে তাঁর গল্পে। সমকাল থেকে লেখক গ্রহণ করেছেন গল্পের উপাদান। দেশভাগ ও বাস্তুচ্যুতির যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে রক্তাক্ত ইতিহাস, লাঞ্ছিত মানবতা, ষাটের দশকে প্রকাশিত তাঁর *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য* (১৯৬৪) গল্পগ্রন্থে উঠে এসেছে। *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* (১৯৬৭) গল্পে জীবন রূপায়ণে অনিবার্য প্রভাব ফেলেছে দেশভাগজনিত (১৯৪৭) নির্মম বাস্তবতা। 'পরবাসী' গল্পে সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা চিত্ররূপ লাভ করেছে।

[৩৪] চঞ্চল কুমার ঘোষ, বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসংখ্য গ্রামবাসীর সঙ্গে নিজের স্ত্রী-পুত্র ও জ্ঞাতি চাচাকে নিহত হতে দেখে রাঢ়বঙ্গের কৃষক বশির। নিজের জীবন বাঁচাতে পালিয়ে আসে পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র পূব পাকিস্থানের সীমান্তে। সীমান্ত পার হওয়ার সময় সে প্রবল ক্রোধবশত হত্যা করে একজন হিন্দু ধর্মালম্বীকে। হত্যাকাণ্ডের পরক্ষণেই তার মধ্যে বোধের উন্মেষ ঘটে। সে উপলব্ধি করে দাঙ্গায় নিহত তার জ্ঞাতি চাচা ওয়াজদ্দি ও সদ্য নিহত হিন্দু ব্যক্তির মুখাবয়ব একইরকম। সে গভীরভাবে অনুভব করে হিন্দু বা মুসলিম নয়, মানুষ হত্যা প্রকৃতপক্ষে মানবতারই অপমান। পাঠকও উপলব্ধি করে নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতার আলাদা কোনো রূপ নেই। সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠুরতা, বীভৎসতা হিন্দু মুসলমান সকলের ক্ষেত্রেই একই রকম ভয়াবহ।

হাসান আজিজুল হক সমাজ ও শ্রেণি সচেতন শিল্পী। সমাজঅভ্যন্তরে বিরাজমান বৈষম্যের রূপ প্রতীকায়িত হয়েছে তাঁর *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য* গল্পগ্রন্থের বিখ্যাত 'শকুন' গল্পে। শকুন গল্পে অঘোর মহাজনের সীমাহীন লোভ ও সুদ লিপ্সা এবং তার বিপরীতে দরিদ্র মানুষের প্রবল ঘৃণা ও প্রতিরোধ ফুটে উঠেছে। এ কারণে গ্রামের ছেলেদের 'সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই, নইলে মহাজনকে লোকে শকুন বলে কেন।'

আত্মজা ও একটি করবী গাছ গ্রন্থের নাম গল্পেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে মানবিক অধঃপতনের এক হার্দিক রক্তক্ষরণের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। দেশভাগের পর ভারত থেকে চলে আসা উদ্বাস্তু একটি পরিবারের অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে তিন বখাটে যুবক ইনাম, ফেকু ও সুহাস। সাহায্যের নামে ওই পরিবারের যুবতী কন্যা রুকুর দেহ সম্ভোগের সব ব্যবস্থা পাকা করে। রুকুর অসহায় পিতা সমস্ত মনুষত্ব ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে কন্যার দেহ বিক্রির টাকায় বাধ্য হয় সংসার চালায়। হাসান আজিজুল হক জীবন ধারণের এমন নির্মম বাস্তবতাকে চিত্ররূপ দিয়েছেন 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে। অসহায় বৃদ্ধ উঠানে একটি করবী গাছ লাগিয়েছেন। এবং তিনি এও জানান করবী ফুলের বীজে চমৎকার বিষ হয়। এ গল্পে বৃদ্ধের মৃত্যুবরণের সুপ্ত ইচ্ছার প্রসঙ্গটি ইঙ্গিতবহ। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে আজন্মলালিত ভিটেমাটির প্রতি মাতৃসুলভ পরম মমতা, উদ্বাস্তু জীবনের অর্থনৈতিক সংকট, জীবন রক্ষার্থে মানবিক অধঃপতন প্রভৃতি বিষয়কে তিনি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন এ গল্পে।

ষাটের দশকের উত্তালতা, সংক্ষোভ ও নির্বেদের জগৎ থেকে গৃহীত হয়েছে জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গল্পের মৌল উপাদান। এ সময়ে বাংলাদেশের ছোটগল্পে বিষয় ও প্রকরণ চিন্তার ক্ষেত্রে মননশীল নিরীক্ষার যে চর্চা শুরু হয় জ্যোতিপ্রকাশের গল্পে সেই শৈল্পিক অভিপ্রায় ঋদ্ধ রূপ লাভ করেছে। *দুর্বিনীত কাল* (১৯৬৭) ও *সিতাংশু তোর সমস্ত কথা*

(১৯৬৯) গল্পগ্রন্থের মধ্য দিয়েই পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেন লেখক। নাগরিক মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতা, নৈঃসঙ্গ্য, বেদনা ও বৈকল্য বিবৃত হয়েছে তাঁর গল্পে। গ্রামীণ নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু স্থিত হয়েছেন নাগরিক জীবনের রূপায়ণে। পাকিস্তানি শোষণ ও শাসনে নিষ্পেষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের সামগ্রিক স্থবিরতা, পশ্চাৎপদতা এবং তার অনগ্রসর সমাজ কাঠামোর অন্তর্গত ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা এ পর্বের গল্পে পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ করেছে। *দুর্বিনীত কাল* গ্রন্থের 'পরমাত্মীয়', 'নাগরবসন্ত', 'তার ফেরা'; *বহে না সুবাতাস* গ্রন্থের 'মৃত্যু অনেক', 'ডোবা', 'লৌহ বেষ্টনী' 'অবিচলিত বাসনা'; *সীতাংশু তোর সমস্ত কথা* গ্রন্থের 'একমাত্র প্রতিকৃতি', 'সারা জীবন', 'ক্রীতদাসী', 'বাসনা', 'নিষ্প্রদীপ বাসনা', 'দূর যাত্রা' প্রভৃতি গল্পে নরনারীর মনোজগতের গভীর তলদেশের অনুসন্ধান করেছেন তিনি। ব্যক্তির আত্মানুসন্ধান, আত্মপরিচয়ের সংকট ও জৈবিক-বৈজ্ঞানিক প্রত্যাশার বহুমাত্রিক ব্যর্থতা চিত্রিত হয়েছে এসব গল্পে। প্রেম ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয় এসব গল্পে শব্দরূপ লাভ করেছে। দ্বন্দ্বময় অন্তর্জগত ও সামাজিক রুদ্ধগতি, রাজনৈতিক দুরাচার উন্মোচনের মধ্য দিয়ে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন প্যাটার্নকে উপস্থাপন করেছেন। *বহে না সুবাতাস* গ্রন্থের 'ডোবা' গল্পে মঈন, মঈনের স্ত্রী শেলী এবং শেলীর প্রতি মঈনের বন্ধু সুহাসের প্রেম মিশ্রিত অনুরাগ গল্পের কাহিনিতে সৃষ্টি করে ত্রিমুখী টানাপোড়েন। তিনজনের পরস্পরের প্রতি যে মনোভাব, অসন্তোষ ও বিদ্বেষ তা মূলত ব্যক্তির জটিল মনস্তত্ত্ব নির্দেশক। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও পাকিস্তানি সামরিক শাসনে ক্রমশ জটিল হতে থাকে ব্যক্তিমনন। পঞ্চাশের দশকে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও সামরিক শাসন বাংলাদেশের জাতীয় চৈতন্য বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। উদার গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতি হিসেবে বাঙালি মধ্যবিত্তের যে বিকাশ সম্ভাবনা ছিল, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সামরিক ও ধর্মতান্ত্রিক তৎপরতার ফলে সেই অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। উদ্যম ও সক্রিয় সৃষ্টিশীলতা সত্ত্বেও বাঙালি মধ্যবিত্ত সামাজিক ও বস্তুগত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখী হয়ে পড়ে। বাঙালি জনগোষ্ঠীর এই স্বপ্নভঙ্গ ও ব্যর্থতাবোধের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের 'কেষ্টযাত্রা' গল্পটি। এ গল্পে লুপ্তস্বপ্নচারী কেষ্টবাবুর ঋণগ্রস্ত জীবনে একমাত্র প্রত্যাশাও শেষ পর্যন্ত চরিতার্থ হয় না। কেষ্টবাবুর যন্ত্রণা মূলত বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের সামগ্রিক ব্যর্থতাজনিত যন্ত্রণা। পুত্র সুখেনকে কেষ্টবাবু বলে:

> 'আমি কখনো মাস্টার হলাম না। আমার মাস্টার হতে ভালো লাগে। ভালো লাগে বলেই বুঝি হইনি। যা ভালো লাগে তা আমি পাইনি, পাই না। হইনি, হই না।'[৩৫]

ষাটের দশকের নগরসভ্যতার অসঙ্গতি ও বিকৃতি উন্মোচিত হয়েছে রাহাত খানের ছোটগল্পে। মধ্যবিত্ত জীবনই তাঁর গল্পের মৌল উপাদান। ঢাকা শহরের অভিজ্ঞতালোক

---

[৩৫] জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, পুনরুদ্ধার, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই রাহাত খান চয়ন করেছেন তাঁর গল্প-উপাদান। এসব গল্পে মধ্যবিত্তের অসঙ্গতি, দ্বন্দ্ব-জটিলতা, নির্বেদ উপস্থাপিত হয়েছে যৌনতার প্রেক্ষাপটে। যৌনতার নানারকম অনুষঙ্গ সূত্রেই গল্পে এসেছে আধুনিক নরনারীর জীবন জটিলতা। রাহাত খান ষাটের যুগবৈশিষ্ট্যকে চিহ্নায়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন।

ষাটের দশকের নাগরিক মধ্যবিত্তের ব্যর্থতা, বিকৃতি ও অসঙ্গতি নিয়ে গল্প লিখেছেন রশীদ হায়দার। শাহরিক মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বময় টানাপোড়েন, স্বপ্ন ও প্রত্যাশার ব্যর্থতা, বিষাদ ও যন্ত্রণার পাশাপাশি গল্পের সমাপ্তিতে তিনি নির্মাণ করেন উত্তরণের ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত। সমাজসচেতনতাই রশীদ হায়দারের শিল্পীমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রগতিশীল সমাজচেতনার আলোয় উদ্ভাসিত তাঁর গল্পের চরিত্রসমূহ। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণ ও ব্যর্থতা সত্ত্বে ও তাঁর গল্প পাঠককে শোনায় মানবিক সম্ভাবনার জয়গাঁথা।

ষাটের দশকে বাংলা ছোটগল্পে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। যৌনকামনার আদিমতা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উন্মোচিত হয়েছে তাঁর গল্পে। ব্যক্তির অবচেতন-অন্তর্গত প্রখর প্রবৃত্তিচেতনা এই সময়-পর্বে তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। *সত্যের মতো বদমাশ* (১৯৬৮) গ্রন্থে যৌন-বুভুক্ষার মনোজাগতিক সঙ্কট, মনোবিকলন ও জৈবিক অবদমনের অসুস্থতা শৈল্পিক নিরীক্ষায় উপস্থাপিত হয়েছে। 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ', 'ভয়', 'অধৎপতন', 'চমৎকার অবচেতন', 'সমীচীন মানব', 'মাংস' 'দণ্ডিত খেলোয়াড়', 'বান্দা' প্রভৃতি গল্পে ব্যক্তির সংগুপ্ত জটিল লিবিডো চেতনার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ গল্পে চিরন্তন মাতৃত্ববোধকে ছাপিয়ে আদিম ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিই বড় হয়ে ওঠে। অজ্ঞাত এক পুরুষের জন্য বিধবা মায়ের যে আসঙ্গলিপ্সা ও মনোদৈহিক আগ্রহ তা জটিল মানব-মনস্তত্ত্বকেই নির্দেশ করে। একদিকে সন্তান বাৎসল্য ও অন্যদিকে দেহজ প্রবৃত্তির দোলাচলে বিপন্ন মানুষের পরিচয় 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ' গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক। আরো অপ্রতিরোধ্য ও সর্বাত্মক রূপ নিয়ে দেহজকামনার অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার প্রকাশ ঘটেছে 'দণ্ডিত খেলোয়াড় গল্পে'। অন্তরঙ্গ বন্ধু রেজার মায়ের সঙ্গে দুলালের যৌনসম্পর্ক অস্বাভাবী দেহজকামনার প্রতিফলন। যাবতীয় মানবীয় বিবেচনার অবসান ঘটিয়ে দুলাল তার মাতৃতুল্য হাসিনা বেগমের সঙ্গে দেহজ সম্পর্কে আবদ্ধ হন।

ষাটের দশকের ছোটগল্পে আবদুল মান্নান সৈয়দ বিষয়-কল্পনার ক্ষেত্রে সমকালীনতা অপেক্ষা মানবমনের গভীর অবচেতনলোকে বিচরণ করেছেন। সমাজ নয়, বরং ব্যক্তির অন্তর্ভুবনই প্রধান হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোটগল্পে।

Dhaka University Institutional Repository

ষাটের দশকে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় সমাজবাস্তবকে তুলে ধরেন ছোটগল্পে। তিনি সমকালীন গল্পকারদের মতো নিরীক্ষাপ্রবণ নন। সময়-সমাজের দ্বন্দ্বময় উত্তরণের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত রেখেছেন নিজেকে, নিজের সৃষ্টিশীল জগৎকে। সে কারণে ইতিহাসের গতিশীল ঘটনাপ্রবাহ শৈল্পিক রূপ লাভ করেছে তাঁর ছোটগল্পে। ষাটের দশকে প্রকাশিত *অবিচ্ছিন্ন* (১৯৬০), *বিশাল ক্রোধ* (১৩৭৬) গ্রন্থে গ্রাম ও শহর জীবন দুইই স্থান পেয়েছে। *অবিচ্ছিন্ন* গ্রন্থে শাহরিক মধ্যবিত্তের বিচূর্ণ অস্তিত্ব এবং তার বহুমাত্রিক প্রত্যাশা ও স্বপ্নভঙ্গজনিত বিষাদ ও গ্লানি চিত্রিত হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনের ভগ্ন অবকাঠামো, নদী-নির্ভর অর্ধাহার-অনাহার পীড়িত প্রান্তিক মানুষ, গ্রামীণ পরিবার জীবনের একঘেয়েমি, ব্যক্তির দোলাচলবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ও উন্মোচিত হয়েছে এ গ্রন্থের গল্পসমূহে। *বিশাল ক্রোধ* (১৩৭৬) গ্রন্থে লেখক ব্যক্তির বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব-জটিলতা ও মানসিক আলোড়ন রূপায়ণের পাশাপাশি সমকালীন পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং সেসব ঘটনাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্তের নবতর টানাপোড়েন, সত্তাসন্ধানের উদ্বেগ, আশঙ্কাকে রূপ দান করেছেন। এ গ্রন্থের 'শহরে' গল্পে সান্ধ্য আইন কবলিত শহরে শহীদ বাড়ি ফেরার জন্য রাস্তায় নামেন। অনুভব করেন :

> 'আজমলের বাড়িটা বন্দরের মতো মনে হয়, বন্দরের বাইরে অজানা আতঙ্ক। দৌড়ে মোড় পেরিয়ে গলিতে ঢোকে। চুপচাপ মড়ার মতো সার সার বাড়ি। বাড়িগুলো খালি, খুব সম্ভব লোকজন মরে গেছে, নয়তো সাড়াশব্দ নেই কেন। ... কোন শিশু যদি চিৎকার করে উঠতো, চিৎকারে বিদীর্ণ করতো চারধারে, তাহলে খুব ভালো লাগতো তার। মানুষের সংসারে সে আছে, এই বোধ তাকে বুঝি শান্তি দিত।'[৩৬]

ষাটের দশকের শেষ পর্যায়ে প্রকাশিত হয় সেলিনা হোসেনের *উৎস থেকে নিরন্তর* (১৯৬৯) গল্পগ্রন্থ। এ গ্রন্থে গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় দারিদ্র্য জীর্ণ নরনারীর অনিশ্চিত জীবন রূপায়ণের পাশাপাশি নিম্নবিত্ত মানুষের জীবিকার সঙ্কট, ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং পাকিস্তানি শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্রমজাগ্রত সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতে *উৎস থেকে নিরন্তর* গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নিরবচ্ছিন্ন কাজের সুযোগ নেই। কর্মহীনতা ও জীবিকার সংকটে দরিদ্র মানুষ ক্রমশ ভিড় করতে থাকে শহরে। ধারাবাহিক বৈষম্য ও শোষণের ফলে বাড়তে থাকে ধনী-দরিদ্রের তফাত। 'গৈরিক বাসনা' গল্পে গনু ভাই ও সাবানির মনোময় হৃদয় সম্পর্কের কথা অভিব্যক্ত হলেও প্রণয় অপেক্ষা তাদের আর্থিক সঙ্কট এবং অস্তিত্ব-অভীপ্সাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নাগরিক নিম্ন-মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য, প্রান্তিক মানবিক পরিস্থিতি ও অস্তিত্বের সঙ্কট রূপায়ণে গল্পকার বাস্তববাদী শিল্পদৃষ্টির

[৩৬] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বিশাল ক্রোধ, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৬, পৃ. ৫৮

পরিচয় দিয়েছেন। 'কাক জ্যোৎস্না' গল্পে একদিকে বাচ্চুর বেকারত্ব, অন্যদিকে স্কুল থেকে বড় আপার আকস্মিক ছাঁটাইয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র পরিবারটি নিক্ষিপ্ত হয় গভীর হতাশা ও অনিশ্চয়তায়। বাচ্চুর গভীর নৈরাশ্যজনিত উচ্চারণ :

> 'বড়ো আপা তুমি পালিয়ে যাও। দূরে অনেক দূরে। যেখানে বাবা নেই, তুলি নেই, সাচ্চু নেই। জীবনের গুরচ্ভার বহন করার দায়িত্ব নেই।'[৩৭]

আশির দশকে গল্প সংকলন প্রকাশিত হলেও গল্পকার হিসেবে কায়েস আহমদের আবির্ভাব ষাটের দশকে। সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বোধ থেকে উৎসারিত তাঁর শিল্পচেতনা। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বহুমাত্রিক সঙ্কটের পটে মানব-অস্তিত্বের সামগ্রিক রূপ অঙ্কনই তাঁর ছোটগল্পিক শিল্পচর্চার মৌল অন্বিষ্ট। 'অপূর্ণ তুমি ব্যর্থ বিশ্ব', 'ফেরারী বসন্তকে খুঁজে', 'লাশ কাটা ঘর' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। বাংলা অঞ্চলের বৃহৎ ক্যানভাসে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পিক বিষয়সমূহ। যেখানে চরিত্রসমূহ স্পন্দিত হয় আনন্দে-বেদনায়, সাফল্যে-ব্যর্থতায়, স্বপ্নে-সাধে। স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ ও সংক্ষোভে অনেকটা নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় কায়েস আহমদের গল্পের প্রধান চরিত্রসমূহকে। সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও নকশাল বাড়ি আন্দোলন দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলেন কায়েস আহমদ। সেই আশা ও অনুপ্রেরণা থেকে লিখেছেন 'মহাকালের ঘোড়া', 'দুই গায়কের গল্প', 'নিয়ামত আলীর জাগরণ' প্রভৃতি গল্প।

উনিশশ ষাটের দশকের কালপর্বে বাংলাদেশের লেখকরা প্রবলভাবে সমাজ ও ইতিহাস সচেতন হয়ে ওঠেন। শওকত আলীর মিথ-অনুসন্ধান ও আবদুল মান্নান সৈয়দের যৌনতার আদিম প্রবৃত্তির তাড়না ও দ্বন্দ্বজটিল মানসিকতা উন্মোচনের প্রচেষ্টার কথা স্মরণ রেখেও বলা যায় পরিবর্তমান সমাজপরিপ্রেক্ষিত ও রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে এ সময়ের ছোটগল্পকাররা রচনা করেন এক অনন্য সমাজভাষ্য। গল্পে গ্রামজীবনের পাশাপাশি গুরচ্ত্ব পায় নাগরিক মধ্যবিত্তের উদ্ভিন্নমান জীবনাকাঙ্ক্ষা। পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়। ষাটের দশকের বেশিরভাগ লেখক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তাঁদের গল্পের ধারণ করায় প্রয়াসী হয়েছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও এ সময়ের উত্তাপ, সংক্ষোভ, সংঘর্ষ ও স্বপ্নময়তাকে আশ্রয় করেই অবতীর্ণ হন বাংলা ছোটগল্প রচনায়। শুধুমাত্র বাহ্যিক ঘটনাপ্রবাহ নয়, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ ও শহুরে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন-সংকট, আশা-নিরাশা, দ্রোহ ও সুবিধাবাদী সমন্বয় অঙ্কিত হয়েছে তার গল্পে। ইলিয়াসের রয়েছে এক দীর্ঘ সাহিত্যিক প্রস্তুতি ও বেড়ে ওঠা, নিম্নে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

---

[৩৭] সেলিনা হোসেন, উৎস থেকে নিরন্তর, ১৯৬৯, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের বছর আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্ম। বাবা বি. এম. ইলিয়াস তখন বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি। ইলিয়াস বড় হতে হতে দেখতে থাকেন মুসলিম লীগের রাজনৈতিক বিস্তার ও ক্রমবিকাশ। বাবা বি. এম. ইলিয়াসও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। দেশ বিভাগের দুই বছর পরে বি. এম ইলিয়াস প্রাদেশিক আইন পরিষদের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। বাবার সক্রিয় রাজনীতির সূত্রে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শৈশব কাটে একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। শুরু হয় ইলিয়াসের পড়াশুনা পর্ব। ১৯৪৯ সালে তাঁর মা তাঁর বাবার রাজনৈতিক সহকর্মীকে ধরে ভর্তি করান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুলে ১ম শ্রেণিতে। এই স্কুলে দেড় বছর পড়ার পর স্কুল বদলে ভর্তি করান ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। এ স্কুলে দুই বছর পড়ার ১৯৫২ সালে বগুড়া জেলা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময় থেকেই প্রচুর পড়ার নেশা ও লেখালেখিতে তাঁর হাতেখড়ি হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সত্যযুগ*, *আজাদ*, *সওগাত* প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি কবিতা, গল্প পাঠাতে থাকেন ছাপার উদ্দেশ্যে। অনেক লেখা পাঠালেও ছাপা হয় মাত্র দু-একটি। ১৩৬৭ সনে আজাদ পত্রিকার ছেলেদের পাতা 'মুকুলের মাহফিলে' ছাপা হয় 'তারাদের চোখ' শীর্ষক গল্প।[৩৮] ১৯৫৭ সালে দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় *সওগাত* পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর 'বংশধর' গল্পটি। এরই মধ্যে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ-জুলুম চলতে থাকে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দমন-পীড়ন ও বৈষম্য প্রধান হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের শোষণমূলক রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে ইলিয়াস দলটির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। মুসলিম লীগের রাজনীতি করলেও বি. এম ইলিয়াস ছিলেন উদার রাজনৈতিক মতাদর্শের অধিকারী। নিজের সন্তানদের ওপর তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ চাপিয়ে দেননি। মুক্ত চিন্তার চর্চাকে সাধুবাদ জানাতেন।

১৯৫৮ সালে বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। এরপর তিনি ১৯৫৯ সালে ঢাকা কলেজে আই. এ ক্লাশে ভর্তি হন। তিনি থাকতেন ঢাকা কলেজের নর্থ হোস্টেলে। বন্ধু শহিদুর রহমান ও আবদুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে গল্প লেখার নানান দিক, গল্পের ফর্ম নিয়ে আলোচনা হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। আই. এ পাশ করার পর ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ১ম বর্ষে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সময় আড্ডা, সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য বিষয়ক পড়াশুনা ব্যাপকতা পায়। মুহম্মদ মুজাদ্দেদ, চিত্তরঞ্জন হালদার, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ইকবাল রুমী ও আসাদ চৌধুরী প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ও সাহিত্য বিষয়ক পড়াশুনা চলতে থাকে শরিফ মিয়ার ক্যান্টিন,

[৩৮] শাহাদুজ্জামান, কথা পরম্পরা, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

পাবলিক লাইব্রেরি ও ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে। বাঙালির জীবনে ঘটতে থাকে একের পর এক তমশাচ্ছন্ন ঘটনাবলি। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাষার পরিবর্তে পূর্ববাংলার উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চালু করার যে ষড়যন্ত্র ও সাংস্কৃতিক দমন-পীড়ন শুরু হয়, ১৯৫২ সালে বাঙালির রক্তে লেখা হয় তার সমাপ্তি। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে শফিক, সালাম, জবক্ষার, বরকতসহ আরো অনেকের প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি মাতৃভাষাকে ফিরে পায়। ১৯৫৮ সালে জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসে আইয়ুব সরকারের সামরিক শাসন। ইলিয়াসের পুরো যৌবনকাল পিষ্ট হতে থাকে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে। ১৯৬৪ সালে বাংলা সাহিত্যে এম. এ পাশ করেন তিনি। তার আগেই ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তীর শতবর্ষ উদযাপনে পাকিস্তান সরকারের বাধা, নিষেধ, শিক্ষিত ও সচেতন মহলে জ্বেলে দেয় বিদ্রোহের মশাল। নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পূর্ববাংলার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক সংগঠনে বিপুল আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তীর শতবর্ষ।

ষাটের দশকের গোড়াতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই ইলিয়াস লেখেন 'অতন্দ্র' এবং 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' নামক গল্প। প্রকাশিত হয় 'সমকাল' পত্রিকায়। সে সময়ে তিনি ব্যতিক্রমী ছোটগল্পকার হিসেবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ষাটের দশকের ছোটগল্পে যে ভাবাবেগ ও স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ প্রবল রূপে দেখা যায় ইলিয়াসের গল্প তা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। জীবনকে তিনি দেখেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে, সমগ্রতায় ও অশেষ কৌতূহলে। তার মানব জীবনের মর্মভেদী গভীর অবলোকন একাধারে নির্মম ও কৌতুকবহ নির্মম। কারণ সত্যনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে তিনি সব সময়ই তুলে ধরেন শোষণ ও ব্যক্তির স্বার্থনির্ভর অমানবিক বাস্তবকে। আর মানুষের অসতর্ক ও দুর্বল মুহূর্ত, গোঁজামিল এমন সব ভাষা ও ভঙ্গিতে তিনি অবলীলায় প্রকাশ করেন, তাতে পাঠক অস্বস্তিতে পড়েন; বিব্রত হন। একইসঙ্গে কৌতুকবোধও তৈরি হয় পাঠকের মধ্যে।

বিশ্ববোধ ও বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন থেকেও ইলিয়াস প্রবলভাবে সমকাল ও সমাজ-সংলগ্ন। তাঁর গল্পের চরিত্রসমূহ উঠে আসে ভৌগোলিক বাস্তবতা ও অস্থিমজ্জাসহ। জীবনের এই সারাৎসার অনুসন্ধান ও অঙ্কনে ইলিয়াস আশ্রয় নেন সবিস্তার বর্ণনার; যা তাঁর নিজস্ব শিল্প-টেকনিক। এই সবিস্তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি সচেতন নিমগ্নতায় গল্পে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রচলিত লোক কাহিনী, কিংবদন্তী নদীর ভাঙাগড়ার মানচিত্র, পুরনো ঢাকার অলিগলি-শতপথ। সবিস্তার বর্ণনার আশ্রয় নিলেও ইলিয়াসের পরিমিতবোধ অসাধারণ। তাঁর গল্পে রাজনৈতিক-সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা পরিমিত পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে। নির্মোহ দূরত্ব বজায় রেখে লেখক সমাজগতির যাত্রামুখে বিশ্বস্ত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন গল্পে। সে কারণে তাঁর গল্পের চরিত্রসমূহ কৃত্রিমতামুক্ত। সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণি গ্রাম ও শাহরিক প্রেক্ষাপটে তাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ও তার আর্থ-সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কারণ, তাদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, ভালোমন্দ উপস্থাপিত হয়েছে ইলিয়াসের গল্পে। ষাটের দশকের উত্তাপ ও শিল্পভাবনা থেকে ইলিয়াস অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যান নিজস্ব শিল্পটেকনিক ও দর্শনকে কেন্দ্র করে। এই প্রস্তুতিকালেও ইলিয়াসের ছোটগল্প আলাদা প্রকৃতির; শ্লেষপূর্ণ, আন্তরিক ও মোহমুক্ত। পুরোনো ঢাকার জীবন রূপায়ণে ইলিয়াস অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ষাটের দশকে অর্জিত এই শিল্পবোধ ও টেকনিক নিয়ে ইলিয়াস যাত্রা শুরু করেন ক্রম-পরিণতির দিকে। সত্তরের দশকে প্রকাশিত হতে শুরু করে ইলিয়াসের গ্রন্থভুক্ত ছোটগল্পসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলিয়াসের গল্পে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের রূপায়ণ

'দেশের কি জাতির সংস্কৃতির গোড়ায় না গিয়ে যদি নিজের, বন্ধুদের আর আত্মীয়স্বজনের স্যাঁতসেঁতে দুঃখবেদনাকেই লালন করি, তো তাতে হয়তো মধ্যবিত্ত কি উচ্চবিত্তের সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। কিন্তু তা থেকে তারা নিজেদের জীবনযাপনে যেমন কোনো অস্বস্তিও বোধ করবে না, তেমনি পাবে না কোনো প্রেরণাও।'[১] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কথাগুলো লিখেছেন তাঁর 'লেখকের দায়' প্রবন্ধে।

এ দায় থেকেই লেখক দৃষ্টি দেন দেশ-জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির গোড়ায়। তিনি বাঙালি সমাজের অনস্বীকার্য বাস্তবকে এমনভাবে তাঁর গল্পে স্থান দেন যে, পাঠক অস্বস্তিতে পড়ে যায়। সংকটকে এতটাই খুলে দেখান যে, তাঁর রচনা পড়তে পড়তে পাঠকের হাঁসফাঁস লেগে যায়। বিষয়ের অন্তর্মূলে প্রবেশের জন্য পাঠকের প্রস্তুতির দরকার হয়। ইলিয়াস কেবল প্রতিভাবান কলাকুশলীদক্ষ কথাসাহিত্যিক নন। সাহিত্যিক জীবনে সমাজের মানুষের সঙ্গে তিনি রচনা করেছেন 'Depth of intimancy'। তাঁর শিল্পীসত্তার মাহাত্ম্যও লুকিয়ে রয়েছে মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর বোঝাপড়া ও সমাজ-পাঠের ওপর। সমাজ বিশ্লেষণে তিনি উপলব্ধি করেছেন, 'সমাজব্যবস্থার ঘোরতর শয়তানির ফলে বেশির ভাগ মানুষ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত থাকে কেবল শ্রমের মাধ্যমে; এর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অন্য একটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর হাতে। এই অসঙ্গতি থেকে শ্রেনী ও শ্রেনী মানসিকতার উদ্ভব।'[২] সমাজের মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব ও দায়বোধ থেকে ইলিয়াস তাঁর সাহিত্যকর্মে সমাজকাঠামোতে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণিচেতনাকে প্রদর্শন করেছেন।

ষাট ও সত্তরের দশকের বাঙালি সমাজে 'স্থানচ্যুতির অস্থিরতা বা বৈকল্য' একটা সামাজিক রোগের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। যার উৎসে ছিল বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা কিছু মানুষকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুবিধা পাইয়ে দেয়। যা ব্যক্তির অর্জন ও প্রাপ্য নয়, তা-ই সে পেয়ে যায় সহজে। ফলে সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়। বিশ শতকের শুরু থেকে মধ্য পর্যায় পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও পূর্ববঙ্গে ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা ঘটনাপ্রবাহে আলোড়িত। আন্দোলন-সংগ্রামে কেটেছে এ সময়। ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্বপ্নই ছিল সে সময়ের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও ক্ষমতা

---

[১]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৯ পৃ. ১৪৬

[২]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার,কথা (দীপক রায় ও নুরুল কবির সম্পাদিত), বগুড়া, পৃ. ৫

রাতারাতি কিছু মানুষকে ধনী করে তোলে। একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সক্রিয় হয় ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক শ্রেণি। একদিকে ছিল সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অন্যদিকে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ও আন্দোলন। সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আস্তে আস্তে উবে যায় এবং কেউ কেউ নিজের সমৃদ্ধির জন্য ভিড়ে যায় সামরিক সরকারের লেজুড়বৃত্তিতে। সমাজ-রাজনীতির এই গোঁজামিল ও ভণ্ডামি ইলিয়াসের লেখক জীবনের শুরুতে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ। কিন্তু এর আগে থেকেই সমাজগতিতে যে গোঁজামিল ও ভণ্ডামি, ক্ষমতার চর্চা ও সম্পদ লুণ্ঠনের মচ্ছব শুরু হয়েছিল, তা ১৯৭১ পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বাঙালির যে বিপুল স্বপ্ন, তা স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় রূপ নেয় যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশে। সেখানে লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি ও অরাজকতা প্রধান হয়ে ওঠে। 'বাংলাদেশ-অঞ্চলে রাজনৈতিক বিবর্তনের সমীক্ষাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তৃণমূলে প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতার কারণে এতদঞ্চলের রাজনৈতিক সংগঠনকে কুরে কুরে খেয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীরা, অনুপার্জিত মুনাফাভোগীরা, চাঁদাবাজি, দলাদলি ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।'[৩]

বাংলাদেশের এই সমাজবাস্তবতা গতিশীল অগ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করে। সমকালীন সেই সমাজভাষ্য উঠে আসতে থাকে কথাসাহিত্যসহ অন্যান্য মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী সময়ে জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তারই ধারাবাহিকতায় দেশবাসীর ওপর নেমে আসে সামরিক শাসনের খড়্গ। অতঃপর গোটা আশির দশকজুড়ে সামরিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয় বাঙালি। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। নব্বইয়ে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সামরিক শাসনের নিয়মকানুন ও রীতিনীতি চেপে থাকে স্বাধীন গণতন্ত্রের মাথায়। ১৯৯৭ সালে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ইলিয়াস গভীর মনোযোগে, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশের এ সমাজগতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর গল্পে এ জীবন ও সমাজই চিত্রিত হয়েছে। এর বিপরীতে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি বিপন্ন হতে হতে কখনো কখনো ঘুরে দাঁড়িয়েছে অস্তিত্ব রক্ষার্থে। সে বিষয়টিও যুক্ত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে।

---

[৩]. আকবর আলি খান, বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৪১

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পাঁচটি গল্পগ্রন্থে মোট ২৩টি গল্প লিখেছেন। প্রায় প্রত্যেক গল্পেই ইলিয়াস সমকালীন আর্থসামাজিক রাজনৈতিক সংকটকে উন্মোচিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে চিত্রিত সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের রূপায়ণ-প্রচেষ্টা তুলে ধরাই এই অধ্যায়ের প্রচেষ্টা।

অন্য ঘরে অন্য স্বর*

১৯৭৬ সালে 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন মা মরিয়মকে। এ-গ্রন্থের 'ফেরারী' বাদে অবশিষ্ট পাঁচটি গল্পই বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীতে ছাপা হয়। গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা ছিল অনেক দিন ধরে। প্রকাশক না পেয়ে বিলম্বিত হয় সেই চেষ্টা। পরে লেখকদের পরামর্শে ফরহাদ নামের এক যুবক যখন প্রকাশকের খাতায় নাম লেখান, তিনিই ইলিয়াসের প্রথম বই 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' প্রকাশ করেন। এ বইয়ের কোনো কপিই বিক্রি হয়নি। বাঁধাই খানার গুদাম থেকে লেখক চেয়ে নিয়ে নিয়ে একে-ওকে উপহার দিয়েই শেষ করেন। 'বেচারা হ্যাভি লস দিয়ে বাংলাবাজার ছাড়লো।'[৪] এ গ্রন্থের ছয়টি গল্পের মধ্যে দুটি একটু ভিন্ন ধাঁচের। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ও 'যোগাযোগ' গল্পে মানব মনের বিচিত্র অনুভবময়তা ও ভাবাবেগই প্রধান হয়েছে। ইলিয়াসের নিরাবেগ বর্ণনাভঙ্গি তার সমস্ত গল্পে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হলেও এ গল্প দুটি তা থেকে মুক্ত। এ দুটি গল্প ভাবাবেগ প্রধান ও কবিত্বমণ্ডিত। তা সত্ত্বেও গল্প দুটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

নিরুদেশ যাত্রা

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্প রঞ্জু নামের এক যুবকের শৈশবের স্মৃতিকাতর আকুলতার ট্র্যাজিক আখ্যান। শুরুতেই লেখক 'বৃষ্টি-বুনোট' এক রাতের পরিবেশ সৃষ্টি করে জানিয়ে দেন এ যুবক যৌবনে অসুখী, শৈশবই তার কাছে সোনা ঝরানো সময়কাল। বৃষ্টিময় সুন্দর রাতে স্মৃতিশিহরিত হয় রঞ্জু। 'কতোদিন আগে ভরা বাদলে' বন্ধু আশিকের সঙ্গে সাতটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার প্রসঙ্গ ভর করে তার স্মৃতিতে। 'তুই ফেলে এসেছিস কারে' গানের স্মৃতিতে মনে পড়ে 'আম্মার ঘরে কি যেনো ফেলে এসেছি'। ফেলে আসা জিনিস খুঁজতে যায় মায়ের ঘরে; খুঁজে পায় না। রঞ্জু মূলত মায়ের ঘরে ফেলে এসেছে শৈশবের আনন্দ ও স্বপ্ন। যা নিরুদ্দেশ হয়েছে কালের নিয়মে। অবরুদ্ধ বর্তমান ও আনন্দহীন জীবনে তার কেবলই যাত্রা সেই নিরুদ্দেশ স্বপ্ন ও আনন্দ স্নেহময়তার দিকে। এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় সে এগিয়ে যায় মর্মান্তিক মৃত্যুর দিকে। আজিমপুরে গিয়ে সাতটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার বিষয়টি রঞ্জুর কাছে

[৪]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আমার প্রথম বই, তৃণমূল (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা), চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ২৮০

**অন্য ঘরে অন্য স্বর* আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ। ১৯৭৬ সালের মে মাসে ঢাকার অনন্যা প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন মা মরিয়ম ইলিয়াসকে। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা, 'উৎসব', 'প্রতিশোধ', 'যোগাযোগ', 'ফেরারী' ও 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'-মোট ছয়টি গল্প স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থের গল্পসমূহের রচনাকাল ১৯৬৫–১৯৭৫ পর্যন্ত।

'সেই সোনার শৈশবে ভুল করে দেখা একটা স্বপ্ন, স্বপ্নের মত টলমল করে'। অস্তিত্ব ও নিরস্তিত্বের মাঝখানে ঝুলতে থাকা রঞ্জুর কাছে এ বৃষ্টির রাত একই সঙ্গে আনন্দ ও বিষাদের। বৃষ্টি-বুনোট এসব রাতে তার ঘুম আসে না। বৃষ্টিকে মনে হয় 'একজন অচিন দীর্ঘশ্বাস'। তার খুব খারাপ লাগে। রঞ্জুর ঘর বাইরে থেকে বন্ধ। অপ্রকৃতিস্থ হিসেবেই পরিবারে তার পরিচিতি। নিজের সঙ্গে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাই এ যুবকের জীবনসংকটের মূল।

এই বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ সাহিত্যিক মাহবুবুল আলমের আলোচনাতেও উঠে এসেছে। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে চরিত্র চিত্রণে বিচ্ছিন্নতার প্রয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, '...আলবেয়ার কাম্যুর প্রভাব আছে' এগল্পে। পরবর্তীকালে ইলিয়াস জবাবে জানান: 'সমাজের ভেতরে থেকে এবং পারিবারিক সম্পর্কগুলি বজায় রেখেও মানুষ কেবলই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তার এলাকা ঢুকে পড়ে একটি বাড়ির ভেতর, বাড়ি গুটিসুটি মেরে ঠাঁই নেয় ঘরে, ঘর পরিণত হয় কামরাতে এবং কামরাও শেষ পর্যন্ত সংকুচিত হতে হতে রূপ নেয় কোঁচকানো শরীরে। সবাই এবং আর সবাই তার কাছে অপরিচিত এবং অস্বস্তিকর। তার দিকে কেউ হাত বাড়ায় না। তার চেয়েও বড়ো কথা কারো হাতে তার আস্থা নেই। সব গল্পেই কোনো না কোনোভাবে এই ব্যাপারটা দেখা হয়েছে। যে কোনো স্বরের এবং যে কোনো শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতার সংকট দেখা যায়।'[৫]

রঞ্জুর স্মৃতিতে একে একে ধরা দেয় কাজলা দিদি, রূপমহলে বাবা মায়ের সঙ্গে বাংলা সিনেমা দেখতে যাওয়ার প্রসঙ্গ। নিশ্চিন্তিপুরের 'সময়-কাঁদা নির্লিপ্ত মাঠ', দুর্গার সঙ্গে রেললাইন দেখার 'ইল্যুশন'। এই যুবক বাস্তবে ফিরে যখন অনুভব করে কতোকাল হলো দুর্গা মারা গিয়েছে, তখনই 'ওকে নিরানুভব ও স্নায়ুহীন করে গামবুট রেইনকোটে মোড়া দুর্গা হান্টার হাতে এগিয়ে এলো',[৬] কিন্তু এ আসলে দুর্গা নয়। এক পুলিশ কনস্টেবল, রঞ্জুকে নিয়ে যায় তার পারিবারিক ইতিহাসে। পুলিশের কাছে দাদা ও বাবার জীবনবৃত্তান্ত শুনতে শুনতে রঞ্জুর রক্তে বয়ে চলে উজান স্রোত–

> এইসব দিন আমার জন্মের কতো আগে মিশে গিয়েছে। এদের জন্যে আমার এমন করে কেন? আব্বার রক্তের সঙ্গে এই দিনগুলো কি আমার শরীরে উজানে বয়ে এলো? আমার ভারি ইচ্ছে করে একবার এদের ছুঁয়ে দেখি।[৭]

---

[৫]. গণসাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ১ম–৩য় সংখ্যা ১৩৮৩, মাহবুবুল আলম লেখেন: গল্পগুলো (অন্য ঘরে অন্য স্বর গল্পগ্রন্থের) পড়তে পড়তে প্রায়শ আলবেয়ার ক্যামুর exile and the kingdom গল্পগ্রন্থের কথা মনে পড়ে।

[৬]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আমার প্রথম বই, তৃণমূল, প্রাগুক্ত পৃ. ২৮১

[৭]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৯

রঞ্জুর পক্ষে বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। দাদা ও বাবার জীবনেতিহাসের সঙ্গে সে যুক্ত হতে পারে না। এমনকি তার কাছে নিজের জীবনের ধারাবাহিকতাও বিলুপ্ত। রঞ্জু কেবলই হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। পুলিশ অফিসার দাদার সাবধান বাণী উপেক্ষা করে পারিবারিক লালায়িত স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে রঞ্জুর বাবা মেতে ওঠেন ছাত্ররাজনীতিতে। 'স্মৃতি শিহরিত' পুলিশ কনস্টেবল বর্ণনা করে চলে–

> তোমার আব্বা তখন কলকাতায় পড়তো আর খালি মিটিং করতো ছাত্রদের সাথে মিলে। এই আজ রাণাঘাট তো কাল ঢাকা তো পরসোঁ বর্ডোয়ান, ফের সেরাজগঞ্জ, কখনো পাটনা, দিল্লী চলে গিয়েছে–এই খালি ঘুরতো আর মিটিং করতো। বড়ো বাবু কতো রাগ করছে, 'তুমি এইসব করবে তো পঢ়ালিখা করবে কখন?'[৮]

সাম্যবাদী রাজনীতি ও সংঘবদ্ধতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেন না রঞ্জুর বাবা। রঞ্জু উপলব্ধি করে মানুষের মধ্যে সংঘবদ্ধতা নেই, সাম্যও নেই। বাবাও আর নেই আগের মতো। তার দুঃখ হয় :

> 'দিনদিন আব্বা বড়ো সাধারণ ও সংসারী হয়ে পড়ছে।'[৯]

হতাশ ও নিরবলম্ব হয়ে রঞ্জু বারবার আঁকড়ে ধরতে চায় শৈশবকে। বৃষ্টিমুখর নদীটিকে তার মনে হয় 'টেউ-খেলানো লম্বা মাঠ।' মনে পড়ে যায়–

> এই মাঠে আগে আমি মেলা মেলা এসেছি। এক হাজার নয়শো তেতাল্লিশ বছর আগে আমার স্কুলের বন্ধুরা এখানে ক্রিকেট খেলতো। আমি নদীতীরে বসে, মাঝে মাঝে ওদের দিকে কখনো নদীর পানে চেয়ে সময় ও বিষাদ কাটিয়েছে। শেলী কতোবার ডেকে গেলো এই রঞ্জু, খেলবি নাকি? আমার ভয় করতো। আমি একদিনো খেলিনি।[১০]

রঞ্জু খসে পড়েছে জীবন থেকে, যা তাকে অবিরাম ঠেলতে থাকে মৃত্যুর দিকে। শিমুল গাছের নিচে শুয়ে মস্ত এক ডাল চাপায় 'রঞ্জুর' নিশ্বাস শেষ হয়ে এসেছে, সে তখন শিমুল ফুলের সুবাস নিতে পারে না।

ইলিয়াসের অন্য সব গল্পে সমাজ ও সমকালীন জীবন যে রকম নিরাবেগ ও নির্মোহ বর্ণনায় অস্থিমজ্জাসহ জীবন্ত উঠে এসেছে, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে সেভাবে উঠে আসেনি। তবে এ গল্পেও ইঙ্গিতে লেখক সমাজ সমকালের অবস্থাকে সংযুক্ত করেছেন। চৌকস পুলিশ

---

[৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৯
[৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
[১০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

অফিসার দাদার উত্তরাধিকারী রঞ্জু কোনো কর্মের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে না। পুলিশ কনস্টেবলের প্রশ্নের জবাবে রঞ্জু জানায়, সে কলেজে পড়ে না, চাকরিও করে না, কারণ তার ভালো লাগে না। এই ভালো না লাগার সূত্রটা পাওয়া যায় তার শৈশব হাতড়ানোর মধ্য দিয়ে। এখন যে সময় সে পার করছে তাতে কোনো কিছুর সঙ্গেই সে যুক্ত হতে পারে না। সে কেবল হাতড়ে চলে হারানো শৈশবের আনন্দময় অনুষঙ্গকে।

ইলিয়াস গল্পটি লেখেন ১৯৬৫ সালে। যখন সামরিক শাসনের জাঁতাকলে দেশবাসী পিষ্ট। 'মানুষের আত্মবিকাশের স্তব্ধতার যুগ।' কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন স্বদেশের জন্য একসময় তার বাবা ছাত্ররাজনীতি করেছেন। অবশেষে যে স্বাধীনতা এসেছে তা রঞ্জুর জন্য হলো কাফনের অশ্রু মোড়ানো উপহার।

জীবনের জন্য আর কোনো আনন্দই অবশিষ্ট ছিল না রঞ্জুর। বাবার রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে বিচ্যুতি এবং সাধারণ যাপিত জীবন রঞ্জুর ভেতরের পরিচয়কে বিক্ষিপ্ত করেছিল। নিজের জীবন নিয়ে তার কেবলই জাগতে থাকে সংশয়, যা একসময় তাকে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। অস্তিত্বের মূল সন্ধানে মগ্ন হতে গিয়ে অসুস্থতাবোধে আক্রান্ত হয় রঞ্জু। আপাতঘটনাহীন এ গল্পে সমাজ ও জীবন থেকে পলায়নের বিষয়টিই ব্যক্ত।

উৎসব

'উৎসব' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় *গণসাহিত্য* পত্রিকায় ১৯৭৩ সালে। এ গল্পের মধ্য দিয়েই হাজির হয় ইলিয়াসের নিজস্ব প্রকরণ ও শৈল্পিক নিষ্ঠা। ইলিয়াস সতর্ক অভিজ্ঞাসম্পন্ন সমাজসচেতন লেখক। সামাজিক মানুষের দ্বিধা-দ্বৈরথ, মানবিক বোধের অবনমন, ব্যক্তিমানুষের ভেতর-বাইরের সংঘর্ষ ও তার অন্তর্গত ক্ষয়, ক্ষোভ ও বিদ্রোহ এ গল্পে স্থান পেয়েছে। গল্পে নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরানি আনোয়ার আলীর জীবনসূত্রে উঠে এসেছে তার জীবনাকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা। কেরানি জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে নিজের আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব ও মানবিক মূল্যবোধের নিম্নগামিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তৎকালীন সমাজগতির চিত্র। সে সূত্রে ধানমন্ডির বর্ণাঢ্য সুখ-সচ্ছল জীবন আর পুরান ঢাকার দরিদ্র জীবনের বাস্তবতা উঠে এসেছে।

ষাটের দশকের শেষভাগে লেখা এ গল্পে সমাজগতির যে হাল তুলে ধরেছেন লেখক তা সমকাল সংশ্লিষ্টতার দলিল। সামরিক শাসনের শেষ পর্যায়ে দেশের মানুষের ওপর শোষণ-বৃদ্ধি পায়। বাড়ে করের চাপ। জাতীয় আয়ের টাকায় প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার

চাকচিক্যও বাড়ে। সম্প্রসারণ ঘটে ঢাকা শহরের। শ্রমনির্ভর পুরান ঢাকার মানুষের যে বলিষ্ঠ জীবন, সেখানেও লাগে ফাঁপা মধ্যবিত্তের সংস্পর্শ। বড়লোক বন্ধুর বৌভাতের উৎসবে গিয়ে আনোয়ার আলী ক্ষণকাল সুন্দরী মেয়ে দেখে, কুলীন কলরবের ভেতর সময় কাটায়। বাসায় ফিরে সেগুলোই আঁকড়ে ধরতে চান তিনি। তাই স্ত্রী সালেহাকে মনে হয় 'আনস্মার্ট জবুথবু'। সঙ্গমের তাড়নায় ঠান্ডা স্বর পড়ে। স্ত্রীর ব্রার হুক খুলতে গেলে অভ্যস্ত হাতে পুরু শর পড়ে। আর সেই শর ভেঙে রাবারের পুরু গ্লাভস খুলে যায় কুকুররতি দেখার পর।

> বিছানায় শুয়ে 'আমার শেলী' বলে আনোয়ার আলি স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলো। ... সুখ ও উত্তেজনায় আনোয়ার আলীর উত্তপ্ত কণ্ঠ থেকে, মুখ থেকে আঠালো ধ্বনি চুঁয়ে পড়ে।[১১]

লেখক এ গল্পে প্রচলিত মূল্যবোধ ও সমাজব্যবস্থাকে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। ধানমন্ডির উচ্চ মধ্যবিত্তের যে সংস্কৃতি, পুরান ঢাকার শ্রমনির্ভর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য বহু শতাব্দীর নিদারুণ শোষণের ফল।'[১২] দারিদ্র্য যে জীবন যাপন করতে জনগণকে বাধ্য করে তা মানবেতর, কিন্তু বাস্তব। সমাজগতির এই সূত্রায়ণই ইলিয়াসের গল্পের অবলম্বন হয়ে ওঠে। গল্পের শুরুতেই ধানমন্ডির উচ্চবিত্তের জীবনযাপন ও প্রতিবেশ এবং পুরান ঢাকার যাপিত জীবন সমান্তরালে উপস্থাপিত হয়েছে :

> ওদের সরু গলির মুখে ঢুকেই আনোয়ার আলী বিরক্ত ও দুঃখিত হয়ে পড়লো। তার বিরক্তির কারণ এইসব : গলির নালায় হলদে রঙের ঘন জল ল্যাম্পোস্টের ফ্যাকাশে আলোতে ঘোলাটে চোখে নির্লিপ্ত তাকিয়ে থাকে। নালার তীরে মানুষ ও কুকুরের অপকর্ম কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমায়। আর, আর এইসব লোকজন! পাড়ার অধিবাসীরাও তার বিরক্তির একটি কারণ। নাইট শো ছবি ভাঙতে এখনো আধঘন্টা, পাড়ার তরুণ সমাজ মেয়ে দেখবে বলে এখন থেকেই পাঁয়তারা কষে। গলির বাঁ দিকে বড়ো রাস্তায় চলছে জুয়ার জমাট আড্ডা। আহমদিয়া হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্টে বিশ বছর আগেকার 'ছোড়ে বাবুল কা ঘর' বিরতিহীন বাজে। এখন রাত্রি সোয়া এগারোটা, আরো ঘন্টা দুয়েক এই কর্কশ কোলাহলের কাল।[১৩]

এই কোলাহলের বিপরীতে ধানমন্ডির সুষমা-শোভিত জীবনচিত্র :

> আনোয়ার আলীর দুঃখের কারণ : এই অঞ্চল এবং সন্ধ্যাবেলার উৎসবমুখর বাড়ি ও ঐ এলাকা তার বিরক্ত চিত্তে পাশাপাশি অবস্থান করে। ধানমন্ডির রাস্তা সবই চওড়া, মসৃণ, নোতুন ও টাটকা। দুধেল আলোর নীচে গা এলিয়ে তারা আলো পোহায়; শুয়ে শুয়ে

[১১]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩২
[১২]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩১
[১৩]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২২

> দ্যাখে মাথার ওপর অনন্তকাল বিরাজ করছে রহস্যময় মহাশূন্য। দেশী-বিদেশী মেয়ে মানুষ ভরা গাড়ি একেকটা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, উড়াল দিচ্ছে অন্য কোনো ইন্দ্রপুরীর দিকে। সম্মানজনক দূরত্ব নিয়ে পকেটে-হাত দাঁড়িয়ে আছেন মনিমুক্তা খচিত বড়ো বড়ো সব প্রাসাদ। বোঝা যায় ঐসব নিষিদ্ধ গ্রহ নক্ষত্রে কোয়ার্টার ডজন হাফ ডজন রূপসী অন্য কোনো ভাষায় ব্যাক্যালাপ করে ... মুনতাসির কি ইশতিয়াক কি আহরার এলে কণিকা বন্দোপ্যাধায়ের এল. পি. চালিয়ে দিয়ে স্যোসালিজম সম্বন্ধে গল্প করছে কি নরম গলায়।[১৪]

শুধু মানুষ নয়, দুই এলাকার কুকুরের মধ্যেও বিরাট তফাত। ধানমন্ডির কুকুর গম্ভীর, 'ডাঁট ওয়ালা', 'বাঙলা ফিল্মের জমিদার বাবু'র মতো রুচিশীল। পা দোলাতে দোলাতে সূর্যাস্ত উপভোগ করছে যেন 'ব্যালকনির ডেক চেয়ারে' বসে। অন্যদিকে পুরান ঢাকার কুকুর 'নেড়ি, গায়ে লোম নেই এক ফোঁটা।' শরীর ভরা ঘা নিয়ে 'কুঁই কুঁই' গোঙায়। পার্থক্য বিচার করে ধানমন্ডির কুকুর দেখে ভক্তি ভাব জেগে ওঠে গল্পের প্রধান চরিত্র আনোয়ারের মনে। এই ক্ষণিক বিভ্রান্তি ও বাস্তব বিচ্যুতিই আনোয়ার আলীকে দিয়ে প্রথা ভাঙায়। মাসের প্রথম দিকে সে স্ত্রীকে সালেহা বলে সম্বোধন করে, রিকশায় উঠলে শেলী বলে ডাকে কিন্তু বন্ধুর বৌভাতে দেখা সুন্দরীদের আশ্রয় করে রতিসুখ ভোগ করতে চায়। 'ভালো ভালো মেয়ে দ্যাখা গেছে বহু, সুখ তো আজ ওদের নিয়ে, সালেহা উপলক্ষ মাত্র।' কিন্তু আনোয়ার তা পারে না। স্মৃতি থেকে তারা উবে যায়। রেখে যায় বাস্তবের প্রতি বিতৃষ্ণা। আনোয়ারের মনে হয় সালেহা 'এমন জবুথবু হয়ে থাকে কেন? শাড়ির ভেতর বুক নেই পাছা নেই। দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা বেঢপ কোলবালিশ।'

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষের যৌনচেতনা ও সম্ভোগের রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। ইলিয়াস বলছেন, 'আমি সেক্সের পেছনে লিভিং মানে ক্লাসকে দেখতে চাই, সোসাইটি দেখতে চাই।'[১৫] আনোয়ার আলির কুকুররতি দেখে নিজের লুপ্ত যৌন উত্তেজনা ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি দুই এলাকার মানুষের কর্ম-পরিধি, চিন্তনক্রিয়া ও আকাঙ্ক্ষাবোধের ধরনকে চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে ইলিয়াস সমাজগতির চিত্রকে পরিষ্কার করেছেন গল্পে।

পুরান ঢাকার আনোয়ারের বন্ধু কাইয়ুম থাকেন ধানমন্ডিতে। কাইয়ুমের বন্ধু কেউ অধ্যাপক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি। তাঁদের মধ্যে পারভেজ ইঞ্জিনিয়ার। স্ত্রী পরিবার নিয়ে আছেন বহাল তবিয়তে। ইকবাল হোসেন চৌধুরী পশ্চিম

---

[১৪]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২২-২৩

[১৫]. শাহাদুজ্জামান, কথা পরম্পরা, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৬২

ইউরোপের একটি দেশের পাকিস্তানি দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি। আরেক বন্ধু অধ্যাপক হাফিজুর রহমান। ধানমন্ডিতে কাইয়ুমের বৌভাতের অনুষ্ঠানে ইকবাল ও হাফিজুরের কথোপকথনের মাধ্যমে উঠে আসে তাদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ। ইকবাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, একসময় বাম রাজনীতি করতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত – দুই ধরনের গানই গাইতেন তিনি। তৎকালীন সমাজের আদর্শ মেনে সংগ্রামী কবিতাও লিখতেন। এখন তিনি পাকিস্তান সরকারের স্তাবক। তার গুণকীর্তন করে, অনুপ্রেরণা দিয়ে অধ্যাপক হাফিজের 'জিহবা রূপান্তরিত হয় ল্যাজে' :

> আপনার নাম আমি বহুদিন থেকেই জানি। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, লেখা ছেড়ে দিয়ে আপনি ভারি অন্যায় করেছেন। রাদার, শুড আই বি এ্যালাউড টু সে দ্যাট ইউ কমিট এ ক্রাইম? ইউ হ্যাভ বিন গিফটেড ইউথ এ্যান এ-ক্লাস ডিপ্লোম্যাট, নো ডাউট এ্যাবাউট ইট, বাট এ্যাট দ্যা কস্ট অফ এ্যান এ-ক্লাশ পোয়েট।[১৬]

একসময় শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখা যুবক আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে ভিড়ে যায় পাকিস্তান সরকারের স্তাবকের কাতারে। যা তাকে এনে দিয়েছে সম্মান ও সম্পদ। তার নিজের ও পরিচিতদের এ জন্য কোনো অনুশোচনা নেই। বরং বিপুল উৎসাহে তোষামোদ চলে। হাফিজুরও কবিতা লিখতেন। সেসব ছেড়ে দিয়েছেন। অবশ্য অধ্যাপনার পাশাপাশি গান লেখার চর্চাটা রয়েছে :

> পলিটিক্স তো ছেড়ে দিয়েছি ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েই। লেখাও প্রায় স্টপ; তা রেডিও টিভির লোক পেছনে লেগেই আছে, ওদের চাপেই এখনো গান লিখি, এই গানই লিখি কেবল।[১৭]

তৎকালীন সমাজগতির চিত্রে ধানমন্ডির তথাকথিত আভিজাত্যের বিপরীতে গল্পটিতে এসেছে পুরান ঢাকার মানুষের জীবনধারা। একজন সন্ধ্যা থেকে রাত ১২টা-সাড়ে ১২টা পর্যন্ত হালিম বিক্রি করে রথখোলার মোড়ে। আহমদিয়া রেস্টুরেন্টের সামনে একটা ছেলে রেকর্ডের গানের সঙ্গে শিস দিয়ে পান বিড়ি বিক্রি করে। রুটির দোকানের মালিক তোতামিয়া ও তার বালক- কর্মচারীর কথোপকথনে উঠে আসে তাদের জীবনের কাহিনি :

> জুম্মন আলী, আব্বে জুম্মন আলি ... আব্বে চুতমারানী, এহেনে খাড়াইয়া কিয়ের রং দ্যাহো? রাইত বাজে একটা, আর তুমি হালায় খানকির বাচ্চা এহেনে রঙবাজি করো? তোমার কোন বাপে গিয়া কাউলকা দোকান খুলবো?

[১৬]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৫-২৬
[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

> জুম্মন আলী একটু আবদেরে গলায় বলে, 'কি হইছে? ব্যাকটি রুটিই তো পাকিন কইরা রাখছি।' 'আব্বে মাদারচোদ, তামামটি রাইত বায়োস্কোপ মারলে বিয়ানে দোকান খুলবার পারবি? [১৮]

কলেজে পড়ার সময় কাইয়ুম, পারভেজ, আনোয়ার ও হাফিজ বাম রাজনীতি করতেন। পরে আনোয়ার বাদে সকলেই ভিড়ে যায় আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়ানোর দৌড়ে। মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তে ওঠাই তাদের ধ্যানজ্ঞান। আনোয়ার এ দৌড় থেকে পিছিয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে বেছে নিতে হয়েছে স্বল্প আয়ের কেরানির জীবন। মিশে যেতে হয়েছে পুরান ঢাকার শ্রমনির্ভর মানুষের সমাজজীবনে। সে অসুখী। তারও আকাঙ্ক্ষা কাইয়ুম, পারভেজ কিংবা হাফিজের মতো জীবন। বাস্তবে যা নেই, আনোয়ার আঁকড়ে ধরতে চায় সেই জীবনকে। যার ফলে মানসিক বিকৃতি ঘটে আনোয়ারের মধ্যে। সামাজিক এই বিশৃঙ্খল ও গতি বিভঙ্গই মানুষকে ক্রমশ ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে। ইলিয়াস সাহসের সঙ্গে সামাজিক এই গতিচিত্রকে তুলে ধরেন 'উৎসব' গল্পে।

প্রতিশোধ

'প্রতিশোধ' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের, বিশেষত ঢাকা নগরের সুবিধাবাদী মুক্তিযোদ্ধা, তাদের লুণ্ঠন, রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি, সর্বোপরি আপসকামী মনোভাবের চিত্র সমাজপ্রেক্ষিতসহ উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধ নামধারী আনিসের বড় ভাই ওসমানের প্রতিশোধস্পৃহা গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তবে তা কল্পনায়। বাস্তবে সে নিষ্ক্রিয় চরিত্র। এ গল্পে সক্রিয় চরিত্র হিসেবে উপস্থিত থাকে তাঁর ভাই আনিস ও ভগ্নিপতি আবুল হাশেম। বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ি আসার পথে সহকর্মীদের সঙ্গে ওসমানকেও কাতর হতে দেখা যায় দেশের অবস্থা নিয়ে :

> জিনিসপত্রের দাম কি ভীষণভাবে বেড়ে যাচ্ছে; প্রত্যেকটা দিনই কোথাও না কোথাও ব্যাঙ্ক লুট হচ্ছে; ঢাকার কোনো সিনেমা হলে ভালো ছবি চলছে না, কোলকাতার ছবি আসে না কেন? ফরমান আলী-নিয়াজির ফাঁসি হওয়া উচিত।[১৯]

বাড়ি ফিরে বাবাকে ঘুমোতে দেখে ওসমান স্নানাগারে যায়। স্নান সেরে বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে। কিন্তু সেখানে দেখা হয় আবুল হাশেমের সঙ্গে। তার একমাত্র মৃত ছোটবোন রোকেয়ার স্বামী আবুল হাশেম। ওসমান, আনিস ও তাদের বাবা আবদুল গণি মনে করে, রোকেয়ার মৃত্যুর ঘটনাটি পরিকল্পিত। হাশেমের সঙ্গে গাড়িতে যাওয়ার সময়

[১৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩১
[১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

রোকেয়ার মৃত্যু হয়। হাশেম সেই ঘটনাকে সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবে উপস্থিত করে। কিন্তু আবদুল গণির পরিবার তা মানতে পারে না, তারা মনে করে রোকেয়ার বান্ধবী নার্গিসকে বিয়ে করার জন্যই হাশেম এই দুর্ঘটনার নাটক সাজিয়েছে। তাই লোকটিকে দেখামাত্রই ওসমানের রাগ হয়। বাবা আবদুল গনিও তাকে তিরস্কার করে মেয়ের খুনি বলে। মেয়েকে দেওয়া হেয়ার স্ট্রিটের বাড়িও ফেরত চায়। কথা শেষ করে আবুল হাশেম চলে গেলে আনিস বলে:

> এই লোকটা, এই বেটা হলো নাম্বারি শয়তান। ... দ্যাখো না শালাকে আমি কি করি! আব্বা একটু সেরে উঠুক, শালাকে আমি একেবারে সাফ করে দেবো, টোটাল এ্যানহিলেসন।[২০]

আনিসের এ সংকল্প যেন থামে না। কিছুক্ষণ পর চা খেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওসমানকে জানায় –

> শালাকে সাফ না করা পর্যন্ত আমার রেস্ট নেই, দ্য বাগার মাস্ট গেট এ্যানিহিলেটেউ।[২১]

কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে ওসমান জানে, এসবই আনিসের ফাঁকা আস্ফালন। সম্পদ অর্জন ও স্বার্থ রক্ষার সহযোগী বলে সে কোনো দিনও আবুল হাশেমকে হত্যা করবে না। তাই আবুল হাশেমকে হত্যা করতে উদ্যত হয় ওসমান। গল্পে সে তিনটি পরিকল্পনা করে হাশেমকে হত্যা করার জন্য। প্রথম পরিকল্পনায় সে হাশেমকে রড দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে হত্যা করতে চায়:

> এই স্তূপ থেকে বেছে বেছে বেশ মোটাসোটা ১টা রড তুলে নিলে ভালো হয়। এই রডের একটা আঘাতই যথেষ্ট। খুব জোরে একটা বাড়ি মারো মাথার ঠিক মাঝখানটায়; করোটি, কোঁকড়ানো চুল সব ভেদ করে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোবে, মনে হবে কালো ঝোপের মধ্যে ১টা ফোয়ারা থেকে লাল রঙের জল বেরিয়ে অকালে সন্ধ্যাকাল ঘটিয়ে দিলো।[২২]

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ওসমান আবুল হাশেমকে হত্যা করতে চায় ছাদ থেকে নিচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে :

> ছাদের এই তীরে দাঁড়ালে শুরকির স্তূপের পাশে উঠানকে মনে হয় উঁচু পাড়ওয়ালা পুকুর। এখান থেকে আবুল হাশেমকে ধাক্কা দিয়েও ফেলে দেওয়া যায়। আবুল হাশেম

---

[২০]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৮
[২১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[২২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

> তাহলে ঠিক সুরকির স্তূপের ওপর পড়বে; সুরকির হৃদপিন্ড স্পর্শ করবে বলে আবুল হাশেম ওর ফর্সা, মোটাসোটা, লম্বা শরীর নিয়ে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হবে।[২৩]

আবুল হাশেমকে হত্যায় ওসমানের তৃতীয় পরিকল্পনা :

> এইতো সুযোগ! এই জায়গাটায় সিগ্রেড কিনবে বলে দাঁড়িয়ে, 'পাঁচটা ক্যাপস্টান দাও'-- দোকানদারকে এই নির্দেশ দিয়ে আবুল হাশেমকে আলগোছে ১টা ধাক্কা দিলেই হারামির বাচ্চা পড়বে ট্রাকের সামনের ডানদিকের চাকার ঠিক তলায়। শালার একটু ইন্টেলেকচুয়াল, একটু পলিটিক্যাল, একটু কালচার্ড ও একটু কমার্শিয়াল মুন্ডু ট্রাকের চাকায় চমৎকার ডিসেকটড হয়ে যাবে।[২৪]

এই তিন ধরনের হত্যা পরিকল্পনাই ওসমানের মধ্যে তৈরি করে আত্মবিকার। নিজেরই অচেতন সত্তায় তৈরি এসব মৃত্যুফাঁদ। সেই ফাঁদে নিজে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয় তার ভেতর। সেখান থেকে উদ্ধার পেতে তাই সে তাড়াতাড়ি সামলে নেয় নিজেকে।

আনিস ও আবদুল গনিরও মনোভাব পরিবর্তিত হয়। ওসমান বাড়িতে ফিরে দেখে বিরক্তি কেটে গিয়ে আনিসের মুখে যেন চাঁদ উঠেছে। আবদুল গনির শরীর অনেকটা ভালো। কারণ আনিস ও আবদুল গনি সম্পদ বাড়ানোর দৌড়ে কোনোভাবেই পিছপা হবে না বলে পণ করেছে। ঘোড়াশাল-টঙ্গী ট্রান্সমিশন লাইন তৈরির কাজ চলছে। সেখানকার কাজের টেন্ডার পেতে হবে আনিসকে। আর এ জন্য আবুল হাশেমের সহযোগিতার দরকার। 'আবুল হাশেম যদি মিনিস্টারের সঙ্গে একবার দ্যাখা করে, তাহলেই কাজটা পাওয়া যাবে।' হতদরিদ্র অবস্থা থেকে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছে হাশেম যে পথে, যেভাবে নিজের শ্রেণি পরিবর্তন করেছে, আনিস আর তার বৃদ্ধ বাবা আবদুল গনিও মরিয়া সে পথে হাঁটতে। গন্তব্যে পৌঁছাতে তাদের দরকার আবুল হাশেমকে। মেয়ের খুনি বলে জানে যাকে, তাকেই সে দাওয়াত করে খাওয়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করে। রাতে আবুল হাশেমকে ডাকার সিদ্ধান্ত হয়, দুই ভাই তার সঙ্গে বসে একটু খাওয়া দাওয়া করবে, আবদুল গণি তা দেখেই সুখী হবে। আনিস যাকে বারবার হত্যা করার সংকল্প করে, সেও আবুল হাশেমকে ভালো মানুষ হিসেবে সনদ দেয় :

> হাশেম ভাই ঐ টাইপের লোকই না। লেফটিস্ট তো, খুব স্ট্রেট ফরোয়ার্ড লোক। মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলে একটু রাফ, কোনো রাখা ঢাকা নেই। যা মনে হয় বলে ফেলে। কিন্তু হার্টটা ভালো।[২৫]

---

[২৩]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪২

[২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[২৫]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজের নানা গোঁজামিল ও ভন্ডামি, রাজনীতির ছত্রচ্ছায়ার সম্পদ লুণ্ঠনের মচ্ছব, মুক্তিযোদ্ধা নামধারীদের সুবিধাবাদী চিত্র আনিস ও আবুল হাশেমের চরিত্রের সূত্রে গল্পে স্থান পেয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আনিস সভা করতো, যোগ দিত ধর্মঘটে। এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর করে, ওখানে আইয়ুব খানের ছবি পোড়ায়। রমনা পার্কে সুন্দরী মেয়েদের পেছনে ঘুরে ঘুরে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চর্চা করে বেড়ায়। সব ব্যাপারে আবুল হাশেমের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে যায়। সেখানেও সে আবুল হাশেমেরই আতিথেয়তায় আনন্দ-ফুর্তিতে দিন কাটায়। স্বাধীনতার পর দেশে ফেরে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা'র বেশে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর কলকাতা পালালে সেখানেও আনিসের ৮/৯ মাস কাটে আবুল হাশেম ও নার্গিসের সঙ্গেই।

> আনিসের কতো বন্ধু বান্ধব এ ফ্রন্টে ও ফ্রন্টে ফাইট করে মারা পড়লো, ক্যাম্পে চাষাভুষার সঙ্গে শুয়ে এইসব ছোটলোকের ঘাম-পেচ্ছাপপায়খানার মধ্যে কি কষ্টই না করলো। কিন্তু আবুল হাশেমের কল্যাণে আনিস কটা মাস প্রতিবাদ সভা ও শোক সভায় যোগদান করে, এখানে কটা মাস লাঞ্চ ডিনার মেরে ও লাঞ্ছিতা মাতৃভূমির জন্য নিবেদিত অশ্রুর সঙ্গে পাঞ্চ করা হুইস্কি জিনের স্বাদে আপ্লুত হয়ে দেশে ফিরলো বিজয়ীর বেশে। গোলমালটা আর মাস তিনেক চললেই আবুল হাশেমের সঙ্গে কোনো ডেলিগেশনের মেম্বর হয়ে ইস্ট ইওরোপটা দিব্যি ঘরে আসা যেত।[২৬]

দেশে ফিরেই আনিস মনোযোগ দেয় লুটপাটে। তার ব্যবহৃত হোন্ডাটা জোগাড় করেছে, এর আগে ভেসপা এনেছিল। পুরানা পল্টনের ১ বোম্বেওয়ালার ফক্সওয়াগন গাড়িও নিয়ে এসেছিল একসময়। হাসান আলী ওয়ালীর গ্লাসের দোকানও আনিস ও তার বন্ধুবান্ধব দখল করে নিয়েছে। অর্থের ভাগাভাগিতে বনিবনা না হওয়ায় মালপত্র সরিয়ে নিয়ে দোকানটাই বন্ধ করে দিয়েছে। আনিসের কাছে সম্পদ হাতিয়ে নেওয়াই মুখ্য আদর্শ। আবুল হাশেমের সঙ্গেও সে একই কারণে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

আদর্শবিচ্যুত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বামপন্থী সম্পদলোভী মানুষদের ইলিয়াস এ গল্পে একেবারে উদোম করে দেখিয়েছেন আবুল হাশেম চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আবুল হাশেম বামপন্থী রাজনীতি করতো ও তাদেরই একটি পত্রিকায় চাকরি করতো। ঠিকমতো মাইনে পেত না। কিন্তু তার মুখে কলকাতা মস্কো ছাড়া কথা নেই। নিয়মিত সংস্কৃতি চর্চা ও গণসঙ্গীতের ভক্ত ভণ্ড আবুল হাশেমদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ - পরবর্তী বিশৃঙ্খলা আশীর্বাদ হয়ে

[২৬]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪০-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

আসে। সংস্কৃতি ও তথাকথিত সমাজতন্ত্রের চর্চা করে, ব্যবসা করে তারা মস্ত বড়লোক বনে যায় মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে।

'প্রতিশোধ' গল্পে ওসমানের প্রতিশোধ স্পৃহার নানামাত্রিক মনস্তাত্ত্বিক গতিপ্রকৃতি ও বিভঙ্গতা, তার অপারগ আত্মঘাতী প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন লেখক। যারা নানা অসন্তোষ নিয়ে পরিকল্পনা করে প্রতিশোধ নেওয়ার; কিন্তু কার্যে পরিণত করতে পারে না, ওসমান তাদেরই একজন। ইলিয়াস ইঙ্গিতে ওসমানের ব্যর্থতার দিকটি প্রকাশ করেছেন গল্পে–

স্বপ্নেও না বাস্তবে ও না, ওসমান কোনোখানেই সাঁতার জানে না[২৭]

তাই ওসমানদের প্রতিজ্ঞাও আটকে থাকে পরিকল্পনাতেই। পরিকল্পনাগুলো ক্রমশ তাদের নিয়ে যায় বৈনাশিকতার পথে। ওসমানের তাই ভয় হয় 'কখন কি বাসনা হয় কে বলতে পারে।' সোজাসুজি না বললেও লেখক ইঙ্গিত দেন এ 'বাসনা' আত্মঘাতী হওয়ার।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজগতির যাত্রা, উন্মাদনা ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির যে মহোৎসবের সূচনা তার পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায় এ গল্পে। সব মুক্তিযোদ্ধার তৎপরতা যে এ রকম ছিল না সেটাও সামাজিক ও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু বেদনাদায়ক হলেও সুবিধাবাদী ও ভণ্ড এসব মুক্তিযোদ্ধা রাজনৈতিকভাবে পেয়েছিল উদার পৃষ্ঠপোষকতা।

যোগাযোগ

একজন মা ও তার সন্তানের মানসিক ও বাস্তব 'যোগাযোগের' আখ্যান হচ্ছে যোগাযোগ গল্প। মা রোকেয়ার মধ্য দিয়ে নানা রকম স্বপ্ন অনুষঙ্গ, পরাবাস্তব পরিবেশ, কাতরতা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা উঠে এসেছে। অসুস্থ মামাকে দেখার জন্য বাবার সঙ্গে স্বরূপখালি যায় রোকেয়া। স্বামী ও সাত বছরের ছেলেকে বাড়ি রেখে যায়। এক মাস পর ছেলে খোকনের পরীক্ষা। তাই স্বামী হান্নানের কাছে রেখে যায় তাকে। রোকেয়ার বাবা সোলায়মান আলী বহুদিন পর শ্বশুরবাড়ি স্বরূপখালি এসেছে। তাই আনন্দেই দিন কাটছিল রোকেয়া ও তার বাবার। কিন্তু খোকনের দুর্ঘটনার খবর সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। কিন্তু সেই দুর্ঘটনার আগাম সংবাদ রোকেয়া পেয়েছিল মৃত মায়ের সাবধানী সংকেতে, মাতৃহৃদয়ে। মামার বাড়ির পুকুর পাড়ে মায়ের লাগানো সজনে তলায় আলো অন্ধকারে সাদা শাড়ি পরা অল্প বয়সী মেয়ে বাঁশঝাড় পার হয়ে এসে বলে 'রোকেয়া তর পোলায় কেমুন

[২৭]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আছে?' রোকেয়া ঘরে ফিরেই শুনে তার স্বামী হান্নানের টেলিগ্রাফ এসেছে। দোতলার কার্নিশ থেকে পড়ে গিয়ে খোকন শরীরে আঘাত পেয়েছে।

এরপর সমস্ত গল্পজুড়েই মা ও সন্তানের আত্মিক যোগাযোগ,পরস্পরকে স্পর্শ করে প্রশান্তি প্রাপ্তির আকুলতা। এসবই মাতৃহৃদয়ের আকুলতা। যদিও তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নানা ঘটনা ও অনুষঙ্গের মধ্যে দিয়ে। বড় মামির কথাতেও রোকেয়ার হৃদয় কেঁদে ওঠে। 'মায়েরে না দ্যাখলে পোলায় সারবো ক্যান?' রোকেয়ার অন্তর্লোকে বাজে 'আমি তাড়াতাড়ি পোলার কাছে গিয়ে খাড়াইতে পারলেই হ্যার ব্যাবাকটি বিষ মুইচ্ছা ফালাইতে পারতাম।' বাস্তবে রোকেয়া যখন হাসপাতালে যায়, তখন খোকন ব্যথায় ও জ্বরে কাতর। তার মুখ দিয়ে অবিরাম গোঙানির স্বর বেরুতে থাকে; মাকে চিনতে পারে না। রোকেয়ার আঙুল এই জ্বরের কম্বল ভেদ করে খোকনকে স্পর্শ করতে পারে না। খোকন এদিক-ওদিক এলোমেলো তাকাতে থাকে। রোকেয়া খোকন খোকন বলে গোটা বুকের সব শক্তি উজাড় করে ডাকে। খোকন সাড়া দেয় না।

খোকনের অমঙ্গলের সংবাদ আগাম উপলব্ধি করতে পারলেও বাস্তবে তার ব্যথার শুশ্রূষা নেই রোকেয়ার কাছে। এই যন্ত্রণা বিচ্ছিন্নতার; তবুও তা বাস্তব। নিরাবেগ ভাষা, শ্লেষ ও বিদ্রূপ, ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন, সংঘাত ও স্বপ্নভঙ্গ এসব বিষয় ইলিয়াসের গল্পের অন্যতম সুর হলেও 'যোগাযোগ' গল্পে তা অনুপস্থিত। সেখানে স্থান পেয়েছে অমৃত স্নেহরস। গল্পের একটি অংশে কেবল তৎকালীন ঢাকার সরকারি হাসপাতালগুলোর অব্যবস্থাপনার চিত্র এঁকেছেন তিনি।

> মেডিকেলের কথা কও বাবাজি, হ, তোমরা গেরামে থাকো, তোমরা কইবা না ক্যান? তোমাগো ক্যামনে কই, ঢাকার হাসপাতালগুলি মানুষ মারণের ফ্যাক্টরি।[২৮]

ফেরারী

'ফেরারী' গল্পটি পুরান ঢাকার সমাজ জীবনের বিশ্বস্ত স্মারক। লেখক ইলিয়াসের ক্রম-পরিণতি লক্ষ করা যায় এ গল্পে। 'উৎসব' গল্পে পুরান ঢাকার জীবনযাত্রার যে উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে এখানে বর্ণিত পট-প্রতিবেশ বিস্তৃত ও গভীর। লেখকের রাগও খানিকটা স্তিমিত। পুরান ঢাকার কালিঝুলি মাখা বদ্ধ প্রতিবেশ গলি ঘুপচি ও নালায় ভরা। সেখানে মলমূত্রের দুর্গন্ধ, পার্কে কুকুর ও মানুষের অহিংস-সহাবস্থান বাস্তবনির্ভর। মূল ঢাকার সচ্ছল প্রতিবেশ

[২৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ছিটকে পড়ে পুরান ঢাকা ক্রমশ হয়ে পড়েছে জরাজীর্ণ, বসবাসের অনুপযোগী। কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের যে আর্থিক সামর্থ্য ও সম্বল, তা বর্ধিত ঢাকা শহরে বসবাসের নিশ্চয়তা ও সাহস যোগায় না। এই বদ্ধ পরিবেশে হানিফ তার বাবা ইব্রাহিম ওস্তাগরের জীন-পরির স্বপ্নসংবলিত জীবনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। ডামলালুদের রাহাজানি-মাস্তানির উত্তেজিত ও উল্লাসময় জীবন থেকেও সে বঞ্চিত। তাই সে পালাতে চায় তার বর্তমান জীবন থেকে। কিন্তু পালানোর পথও তার কাছে রুদ্ধ। তাই সে কারাগারকেই নিরাপদ মনে করে। তার কাছে কারাগার যেন পুরান ঢাকার উত্তরাধিকার অর্জিত-জীবন থেকে ভালো।

ইব্রাহিম ওস্তাগরের অসুখ ও হানিফের অবিরাম ছুটে চলা এ গল্পে নাটকীয় গতি সঞ্চার করেছে। ইব্রাহিম ওস্তাগরের যে অস্বাস্থ্যকর ঘর, আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার অপ্রতুলতা, সবই ঢাকার মানুষের জীবনের জলছবি। ৪০ টাকার পরামর্শ ফি দিয়ে নামেমাত্র ডিগ্রিওয়ালা ডাক্তারকে নিয়ে এসেছে ওস্তাগরের বড় ছেলে হান্নান। যার হাতে সবে কাঁচা পয়সা আসতে শুরু করেছে। এই ডাক্তার ওস্তাগরের কিছু করতে পারে না। অসন্তুষ্ট মুখে সে ইব্রাহিমের নাড়ি টিপে। বুকে স্টেথিস্কোপ লাগায়, জিভ দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয়। ডাক্তার জানে ইব্রাহিম ওস্তাগরের অসুখ নিরাময়-অযোগ্য। ঠিক একইভাবে নিরাময়-অযোগ্য পুরান ঢাকার বাসিন্দাদের দুর্গন্ধময় জীবনও:

> আরো একটু এগিয়ে গেলে ভিক্টোরিয়া পার্কের পেছনে বালির স্তূপ। গোটা পার্ক ঘিরে রাত্রি কাটায় সারি সারি অতিকায় ট্রাক। পার্কের পেছনদিকের ফুটপাতে মানুষ, মেয়ে মানুষ, কুকুর ও মেয়েকুকুরের অহিংস সহ-অবস্থান। তাদের মলমূত্রের মিলিত ঘ্রাণ লক্ষ্মীবাজারের খানিকটা, একদিকে কলতাবাজার ও অনদিকে নর্থব্রুক হল রোডের ১টা অংশকে গেঁথে রেখেছে একসূত্রে।[২৯]

স্বাধীনতা-পরবর্তী ঢাকা শহরের যে নতুন বিন্যাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতি, তা থেকে পুরান ঢাকা ছিটকে পড়ে; ক্রমশ পরিণত হতে থাকে টিকে থাকার এক জরাজীর্ণ ভূমিতে।

ইলিয়াস ইতিহাস ও সমাজসচেতন লেখক হিসেবে পুরান ঢাকার বদ্ধ জীবনের আখ্যান রচনার পাশাপাশি স্বাধীনতা-পরবর্তী শিক্ষিত শ্রেণির অবক্ষয় ও অস্থিরতার চিত্রও গল্পে এঁকেছেন। ছাত্রদের রাহাজানি-ছিনতাই, ধর্ষণ এ সময় নতুন মাত্রা পায়। ডামলালুর

[২৯]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৭৫

Dhaka University Institutional Repository

রিকশা ছিনতাই করার পরিকল্পনা ভেস্তে যায় তার চেয়ে প্রশিক্ষিত বড় মাস্তান ছাত্রদের জন্য। লম্বা চুল জুলফিআলা মাস্তানদের পুলিশের ওপরে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ডামলালুকে বিরক্ত করে তোলে :

> ইসটুডেন হালার কি করবো তুমি জানো না, না? কেলাব থাইকা হোটেল থাইকা সায়েবরা বারাইবো মাল টাইনা, অরা হেই গাড়িগুলা ধইরা মালপানি কামায়, মাগীউগি পছন্দ হইলে ময়দানের মইদ্যে লইয়া হেইগুলিরে লাগায়। অহন বুঝলি হালার বাঙ্গুচোদা বুঝলি? [৩০]

এই গল্পের কবন্ধ সমাচারের সঙ্গে লেখক ইতিহাসকে মিলিয়ে দিয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহের নায়কদের ভিক্টোরিয়া পার্কে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের অশান্ত আত্মাই নিরবয়ব কবন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ায় ও মানুষদের ওপর ভর করে যেন।

শিক্ষিত যুবকদের অধঃপতনের সমান্তরালে পুরান ঢাকার ডামলালু, সালাউদ্দিন ও আহসানউল্লা ছিনতাই, রাহাজানি, জুয়াখেলার পাশাপাশি নিয়মিত হাজিরা দেয় মেয়েদের স্কুল গেটে; স্কুল ছুটির পর। তবে শ্রমনির্ভর পুরান ঢাকার নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন বৈচিত্র্যময়। সেখানে আছে ট্রাক ও লরির চালক, মিষ্টির দোকানদার, হার্ডওয়্যারের দোকান, লন্ড্রির দোকান, মোসলমানির বৈদ্য, হোটেল ব্যবসায়ী। নিমতলীর 'খানকিপট্টি'ও পুরান ঢাকার জীবনেরই আরেক বাস্তবতা। সে জীবনেও রাজনীতির হস্তক্ষেপ ঘটে। তুলে দেওয়া হয় এ খানকিপট্টি। জীবিকা হারিয়ে তারা কোথায় নিরুদ্দেশ হয় তা জানা যায় না গল্পে। তবে ইঙ্গিতে বোঝা যায়, তারা আরও নিরবলম্ব হয়ে পড়ে।

পুরান ঢাকার যে মিথ, যে জীন-পরি, কবন্ধ সমাচার তা ইলিয়াস ছোটবেলা থেকেই শুনেছেন, সে কাহিনিগুলো এই অঞ্চলের মানুষের রোমাঞ্চ ও সত্যের মিশেল। লেখক রোমাঞ্চকর এ বিশ্বাসকে গল্পে যুক্ত করেন সামাজিক বাস্তবতা বোঝাতে। তাদের বিনোদনের যে ঘাটতি তার খানিকটা পূরণ হয় এসব রোমাঞ্চ-নির্ভর উপাখ্যানে। সিনেমা-মাধ্যমেরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন লেখক। তবে এ জীবন বিগত। এ ঐতিহ্য বিদায় নিয়েছে বর্তমান প্রজন্মের জীবন থেকে। তাদের লক্ষ্য এখন অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করে শ্রেণি পরিবর্তন করা। নতুন ঢাকায় জায়গা করে নেওয়া। উত্তর প্রজন্মের সমাজ বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করা। হান্নান তাই নির্দ্বিধায় বলে–

---

[৩০]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৬৩

Dhaka University Institutional Repository

> ওল্ড ঢাকা খুব ন্যাস্টি স্যর। আমি স্যর মালীবাগে বাড়ি করতাছি, দোয়া কইরেন স্যর। বাড়ি কমপিলিট হইলেই চইলা যাই স্যর। ওল্ড ঢাকার যা কন্ডিশন স্যর।[৩১]

হান্নানের পুরান ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলেও মুক্তি মেলে না হানিফের। হানিফ তাই কারাগারকেই বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মনে মনে। তবে সেখানেও তার দ্বিধা, সূত্রাপুর থানার পুলিশ তাকে আটক করে থানার মধ্যে রাখবে কি না। হানিফের আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে মুখ্যত তার সুস্থ জীবন-তৃষ্ণাই প্রকাশিত হয়েছে।

অন্য ঘরে অন্য স্বর

সময়ের পরিক্রমায় রাজনৈতিক কারণে বঙ্গভূমি বারবার খণ্ডিত হয়েছে। খণ্ড-বিখণ্ডের এই মানচিত্রে কত অসহায় মানুষ কোথায়, কখন, কীভাবে গৃহহীন হয়েছে, তার সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই। কেউ কেউ আবার মাতৃভূমি আঁকড়ে থেকেছে শত কষ্ট-যন্ত্রণাতেও। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগের সময় যেসব হিন্দু পরিবার নির্যাতন সহ্য করেও পূর্ব বাংলায় থেকে যায় এবং যারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি জান্তাদের অমানুষিক নির্যাতন সত্ত্বেও অসহায়ত্বের কারণে বা মাতৃভূমির প্রতি মমতায় এই বঙ্গভূমিকে আঁকড়ে পড়ে থাকে, তাদের সেই নিগূঢ় করুণ যন্ত্রণাকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে নিরাবরণভাবে বিবৃত করেছেন। প্রদীপের পিসি ও পিসতুতো ভাই ননীও এ রকম মানুষ। যারা থেকে গেছে জন্মভূমির ভালোবাসায়। ননী ব্যবসায়ী। স্বাধীনতাযুদ্ধের নয় মাস আগরতলা থেকেছেন। দেশ স্বাধীন হলে আবার আনন্দচিত্তে ফিরে এসেছেন মাতৃভূমিতে। কিন্তু এই স্বাধীনতাও তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশেও সে স্বাধীনভাবে পথ চলতে পারেনি। সে পারেনি তার ছেলে-মেয়েকে নিরাপদে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাতে। সর্বদাই তার মাথার ওপর ঝুলে আছে ভয়। সে ভয় সংখ্যালঘুর ভয়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও হিংস্রতার ভয়। আক্রমণের শিকার হওয়ার ভয়। ছেলের বয়সী আঠার-উনিশ বছরের সন্ত্রাসী কামাল ও তার সহযোগীদের তাই সে সমীহ করে, তোয়াজ করে। চাঁদা ওঠাতে আসা কামালের ভয়ে ভীত ননীর উচ্চারণ:

> কামালের কথায় ননীদা হাঁ হাঁ করে উঠে 'কি যে কও! কি যে কও! আমি কই তোমরা ব্যস্ত মানুষ, কনফারেন্স লইয়া দৌড়াদৌড়ি করো, কহন আইতে পারো কিছু ঠিক আছে নি? ... 'কামাল তোমরা চা খাও।' তারপর নেপালচন্দ্রকে ধমকায়, 'চা না দিয়াই আমারে ডাকতে গেলি? নেপালচন্দ্রের হাতে ১০ টাকার নোট গুজে দিয়ে একই সুরে বলে 'অন্নপূর্ণা থাইক্যা রসমালাই লইয়া আয়।[৩২]

---

[৩১]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৬৬

[৩২].প্রাগুক্ত, পৃ.৮০

Dhaka University Institutional Repository

ননীর অন্তর্জ্বালা ও সংকটই সমকালীন সমাজবাস্তবতা। ব্যবসা করে যে লাভ হয়, তার বেশির ভাগই রাজনৈতিক দলের নানা অনুষ্ঠানের 'চান্দা' দিতে ব্যয় হয়। নাভিশ্বাস ওঠে সংসার চালাতে। আর 'চান্দা'র উপলক্ষেরও অভাব হয় না। সারা বছর লেগেই থাকে। এই জোরজবরদস্তি ও চান্দার রাজনীতি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরই চর্চিত হয় বেশি। ননীর যন্ত্রণাকাতর সংলাপে রাজনৈতিক এই লুণ্ঠনবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় :

> কিসের বিজনেস? এই দ্যাশে ক্যামনে থাকি? বিজনেস এট্টু যদি ভালো হইছে তো চান্দা লইয়া লইয়া ব্যাকটি পয়সা খসাইয়া লইবো। এইতো একখান টাউন, আধা ঘন্টা হাঁইটা গেলে এই মাথা ঐ মাথা ফালা ফালা কইরা ফালান যায়! আর দ্যাখ, সপ্তার মধ্যে তিনখান চাইরখান কনফারেন্স, সম্মেলন, সমাবেশ লাইগাই রইছে। পয়সা আদায়ের ফন্দি, বুঝলি না? এই ভাই আইবো ঐ ভাই আইবো, বাপে আইবো, বন্দু আইবো! আর কি ? ছাড়ো, মালপানি ছাড়ো।[৩৩]

১৯৭১ পরবর্তী রাষ্ট্রযন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় যে, চাঁদা আদায়ের সংস্কৃতি, অর্থ উপার্জনের সহজ পথ চালু হয় তা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে। বড় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রমশ ফুটপাতের হকার হয়ে বাস-ট্রাকচালক ও মদ্য ব্যবসায়ী পর্যন্ত প্রসারিত হয় চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্র। বাছবিচারহীন জোর জবরদস্তি করে আদায়কৃত এই চাঁদাই প্রতিষ্ঠিত ও উঠতি রাজনৈতিক বড় ও উঠতি নেতাদের অঢেল সম্পদের মালিকে পরিণত করেছে। সমকালীন সমাজের এই গতিচিত্র গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক। একই সঙ্গে বড় শিল্পীর প্রেক্ষণে দেখছেন পিসীমার অন্তর-তল। ছুঁয়ে গেছেন তার অস্তিত্বের, আনন্দ-বেদনার ইতিহাস। স্মৃতিময় অতীত হয়ে ওঠে বর্তমান। প্রদীপের মনে হয়, সে একবার বাবার কোলে, আরেকবার পিসীমার কোলে দোল খাচ্ছেন। পূর্ব প্রজন্মের ইতিবাচক কর্মযজ্ঞ ও শুভচেতনাই প্রদীপকে বর্তমানের বিকৃতি থেকে রেহাই দেয়।

অবশেষে প্রদীপও যুক্ত হয়ে যায় প্রজন্মের প্রবাহে। তার পিসিমার ঘরের শালগ্রামশিলা, পরমহংসদেব নেংটি ইন্দুরসহ পিসিমা-নিরস্তিত্ব হয়ে মিলে যায় প্রদীপের ভেতরে। প্রদীপ ঘিয়ে ভাজা মুড়ি খেতে খেতে চিৎকার ছোড়ে 'মা' বলে। পিসীমার গান ও গুঞ্জরণ তাকে দূরে ঠেলে দেয় 'মাস্টারবেশন' থেকে। দু-দুবার মাস্টারবেশনের পরিকল্পনা করেও পিছিয়ে যায় পিসির মাধ্যমে পাওয়া প্রজন্মচেতনায়। পিসির গান তার মধ্যে ঢেউ তোলে। ভুলিয়ে দেয় এ দেশের নানা অসঙ্গতির বর্তমান অনুষঙ্গ। কিন্তু ভুক্তভোগী ননীর স্ত্রী কীভাবে ভুলবে? তার কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে যে বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছে ঘরে। ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক মাস্তানদের ভয়ে তিনি মেয়েকে কলেজে পাঠাতে পারছেন না।

---

[৩৩]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৮০

পিসিমার ঘরের অবস্থান চিত্র ও তার গল্প প্রদীপদের অস্তিত্ব ও অবয়রের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। কিন্তু সেই সূত্র ছিঁড়ে গেছে বর্তমানে। প্রদীপরা দেশ ছেড়েছেন যুদ্ধের সময়েই। তিনভাই ব্যবসাবাণিজ্য করে দুধেভাতেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু রক্ত-সূত্রে এখনো রয়ে গেছে পিসিমা ও ননীর মধ্যে পূর্ব প্রজন্মের জন্য আবেগ। যদিও তা বর্তমানে আক্রান্ত। ননী ও তার পরিবার যন্ত্রণাকাতর দিন পার করছে। মাতৃভূমির মমতায় নিরুপায় ননী দেশ ছাড়তে পারেননি ১৯৭১ সালে। ননীর বর্তমান সংকট ও পিসিমার বিগত জীবনের নানা প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ, আনন্দ বেদনার ফুলকি প্রদীপকে নিয়ে যায় এক অনিকেত শূন্যতার বোধে। এ শূন্যতায় মিশে থাকে অতীত ও বর্তমান বিমূর্ত হয়ে।

খোঁয়ারী**

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *খোঁয়ারী*। ১৯৮২ সালে রাজশাহীর তরঙ্গ প্রকাশন থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। ততদিনে স্বতন্ত্র ধারার শক্তিমান এক লেখক হিসেবে মননশীল পাঠকের নজরে এসে গেছেন তিনি। ‘খোঁয়ারি’, ‘অসুখ-বিসুখ’, ‘তারা বিবির মরদপোলা’ ও ‘পিতৃবিয়োগ’ এই চারটি গল্প নিয়ে ‘খোঁয়ারি’ গল্পগ্রন্থ। ‘খোঁয়ারি’ গল্পটি শুরুতে বসিয়ে প্রথম গ্রন্থের শেষ গল্প ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ ধারাক্রম রক্ষা করা হয়েছে। দুটি গল্পই মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়নের চিত্র। যুগের প্রতিক্রিয়ায় ইলিয়াস সর্বদাই কান পাতেন। দ্রোহ ও শ্লেষে খুলতে থাকেন ভণ্ডামির ভাঁজ। ক্রমাগত সমাজ-রাজনীতির অনুষঙ্গ ব্যাপকভাবে উঠে আসে ইলিয়াসের গল্পে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার মানে যে ব্যক্তি ও সম্প্রদায় ভেদে কত সংকীর্ণ, কত পৃথক তার যন্ত্রণাকাতর বাস্তব চিত্র ফুটে-উঠেছে ‘খোঁয়ারি’ গল্পে। মাতৃভূমির সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ কামনায় নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা, বাঙালি চিত্তে যার স্বরূপ ছিল–

> সেদিনের আশায় পথ চেয়ে আছে দেশের প্রতিটি সন্তান। যেদিন বাংলার স্বাধীনতা সূর্যে প্রতিফলিত হবে অধিকারবঞ্চিত শোষিত, নিপীড়িত বুভুক্ষু সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা[৩৪]

---

[৩৪]. একাত্তরের চিঠি, প্রথমা প্রকাশন, ষোড়শ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৪

***খোঁয়ারি* আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহীর তরঙ্গ প্রকাশন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন রণজিৎ পাল চৌধুরীকে। ‘খোঁয়ারি, ‘অসুখ-বিসুখ’, ‘তারাবিবির মরদ পোলা’ ও ‘পিতৃবিয়োগ’ মোট চারটি গল্প স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থের গল্পসমূহের রচনাকাল ১৯৭৫–১৯৭৯ পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জাগ্রত বাঙালির এ আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ বিভক্ত হতে থাকে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে শাসনযন্ত্র ও রাজনৈতিক দলের দখলদারিত্বের 'উৎসবে' ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বপ্ন ও সম্পদ। ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ভক্তি ও ভালোবাসা দখল হয়ে যায়। নিজের বাড়ি নিজেরই জন্য হয়ে ওঠে খোঁয়ারি। এ গল্পে খোঁয়ারিতে আবদ্ধ পরাজিত মানুষের ফাঁকা হুংকার, চাপা আর্তনাদ ও যন্ত্রণা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দৌরাত্ম্য ও অধঃপতনকে তুলে ধরেছেন লেখক।

মানিক ভাই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি দলীয় আদর্শের জন্য যেকোনো অপ্রিয় কাজ করতে পারেন। মানিক ভাইয়ের সাংগঠনিক আদর্শ 'ইয়াং জেনারেশনের আনলিমিটেড এনার্জিকে ঠিকভাবে চ্যানেলাইজ করা'। যাতে তারা 'সাব ভারসিভ এলিমেন্টস বিপ্লবের নাম করে কিংবা গভর্নমেন্টের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশকে ধ্বংস করতে না পারে।' এই সংগঠনের আরও দায়িত্ব আছে। দুর্নীতিবাজ লোকজন জাতীয় সংগঠনে ঢুকে কোনো কিছু যাতে অর্জন করতে না পারে, সেই দিকটিও তাদের দেখতে হয়। এই মহৎ দায়িত্ব বাস্তবায়নে তাদের দরকার হয় একটা অফিস। সেই সূত্রে সমরজিৎদের বাড়ি দখল, অতঃপর সেখানে সংগঠনের অফিস তৈরির উপায় খুঁজতে থাকে তারা। এখান থেকে তারা নিয়ন্ত্রণ করবে 'কাগজীটোলা, সূত্রাপুর বাংলাবাজার, ওদিকে ফরাশগঞ্জ শ্যামবাজার হোল এরিয়াটা।' এই নিয়ন্ত্রণের নামেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি দখল, অন্যের টাকায় খাবার, মদ, কেতাদুরস্ত পোশাক পরিচ্ছদ, গাড়ির জ্বালানি সবই হয়। একই সঙ্গে চলে 'রঙবাজি'। প্রথম দিকে সব রকমের আশ্বাস, লোভ, তারপর ভয়-ভীতি ও বিপদের হুমকি – এমন সব পরস্পরবিরোধী কথায় সমরজিৎকে বোঝানোর চেষ্টা চলে। বাড়ি ভাড়া দিলে সমরজিৎরা ভালো টাকা পাবে, এ লোভে যখন কাজ হয় না তখন চলতে থাকে মৃদু ভয়ভীতি দেখানো; বিপদের আশঙ্কার কথা, এবং সবশেষে আদেশ। ভয়ের ভাষা ও আদেশের সুরে সমরজিৎকে জানানো হয়:

> তুমি আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট করতে রিফিউজ করেছো শুনলে হি মে পুট ইউ ইনটু ট্রাবল।' ... বাড়িটা আমাদের দরকার[৩৫]
>
> রাজি হয়ে যাও সমরজিৎ। তোমার ভালোর জন্যেই বললাম। এরপর কোনো অসুবিধা হলে আমি হেল্প করতে পারবো না।[৩৬]

'খোঁয়ারি'র আগে রচিত দুটি গল্প 'প্রতিশোধ' ও 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'-এ যুদ্ধ না করেই রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযোদ্ধার সুবিধাদি ভোগ ও অর্থসম্পদ লুণ্ঠনের রাজনৈতিক

---

[৩৫]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১১১

[৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি অর্জনের বিষয়টি এসেছে। দুটি গল্পেই ব্যাপারটা ততটা প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ও ভীতির ব্যাপার হয়নি, যতটা দেখা যায় 'খোঁয়ারি' গল্পে। আগের গল্প দুটিতে টাকাপয়সা অর্জন ও চাঁদা আদায়, মাস্তানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাদের তৎপরতা। কিন্তু 'খোঁয়ারি' গল্পের তিনজন যুবকের রাজনৈতিক তৎপরতা বেশ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি হিসেবে হাজির হয়, যা দুর্বৃত্তায়নের চিত্রই প্রকাশ করে। তাদের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ক্ষোভের দিকটিও উঠে আসে। এগুলো সাংগঠনিক জটিলতারই প্রকাশ। সরাসরি যুদ্ধ করা-না করা নিয়ে তাদের যে মানস-দ্বন্দ্ব, যুদ্ধকালে মদ্যপানের চর্চা, পোশাক-আশাক, অন্যের টাকায় চলা, দখলদারিত্বের মানসিকতা, নেতার নজর কেড়ে দলে সুবিধাজনক পদ পাওয়া – এমন নানা বিষয়ের যে ছবি পাওয়া যায় গল্পে, তা সমকালীন সমাজেরই বাস্তবতা:

> ফারুক অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে সিগ্রেট ধরায়। গ্যাস লাইটারের দীর্ঘ নীলাভ শিখায় তার মুখের আঁকাবাঁকা রেখা বড়ো চঞ্চল। লাইটার ধরে-থাকা ডান হাত দিয়ে কিংবা এমনি খালি বাঁ হাতে জাফরের গালে গোটা দুয়েক চড় দিতে পারলে সুখ পাওয়া যায়। শুওরের বাচ্চা খুব ফ্রন্টের গরম দ্যাখাস, তোর বাপ মানিক ভাই ফ্রন্টে গেছে কখনো? ..এই সব নবজাগ্রত তরুণ মস্তানদের কিছু বলবার জো আছে? মানিক ভাই কাকে যে কার পেছনে লেলিয়ে রেখেছে কেউ বলতে পারে না।[৩৭]

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের বাস্তবতা সমরজিৎদের অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা, নিরালম্ব হওয়ার বেদনায় ভরপুর। সমরজিৎরা স্বাধীনতার সময় অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে থাকা বাড়ির পারিবারিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুভূতির পরাজয়, বিক্ষুব্ধ ধ্বনিপুঞ্জ হয়ে ভেসে ওঠে সমরজিৎদের সংলাপে। যুদ্ধের সময় নিরামিষ ও তাদের ঠাকুরের ভোগ রান্নার আলাদা রান্নাঘর ও কুয়া ভেঙে তছনছ করে পাকিস্তানি সেনারা। বাড়ির সব দরজা জানালাসহ পুরো স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমরজিৎ ও তার বাবা অমৃতলাল ফিরে আসে যুদ্ধের পর। ঐতিহ্য ও অতীত গৌরবের সুখ নিয়ে বাড়ির সবার মধ্যে নতুন করে বসবাস করার স্বপ্ন। কিন্তু তা চুরমার করে দেয় ফারুক ও জাফর। সমরজিৎ টলমল করে ডুবতে থাকে গৃহবাস চিহ্নহীনের অনিশ্চয়তায়, আর অমৃতলাল মদে চুর হয়েও বাড়ি ভাড়া না দেওয়ার কথায় অটল থাকে; হাতড়াতে থাকে হৃতগৌরব ও ঐতিহ্যকে। গল্পটি শেষ হয় রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের মাধ্যমে শিকড়- বিচ্ছিন্ন হওয়ার অশেষ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে।

অসুখ বিসুখ

'অসুখ বিসুখ' গল্পে ইলিয়াস পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে একজন নারীর মর্মযাতনা ও

---

[৩৭]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯৯-১০০

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনহীন জীবনের গল্প বলেছেন। আতমন্নেসা যৌবনে কোনো পরিচর্যা ও মমতা পায়নি স্বামীর কাছ থেকে। সন্তান প্রসবের সময়ও কোনো বিশেষ পরিচর্যা মেলেনি তার। তারপর পরিবারে চালু হয়ে যায় তার লৌহকঠিন রোগহীন শরীরের ইতিহাস। আতমন্নেসার অসীম ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতার কারণে ছোটখাটো অসুখ বিসুখের কথা সে কখনো কাউকে জানাতো না।

> অবেলায় গোসল করে আতমন্নেসার যদি কখনো গা গরম করেছে সে আর বলা হয়নি। এই না-বলাটাই হয়েছে তার কাল। এতে সকলে ভাবতে শুরু করলো কি বৌয়ের গতর হইল লোহার পিঞ্জর একখান। পানি হাওয়া রইদে এ্যারে কিছুই করবার পারে না।[৩৮]

অথচ নিম্নবিত্তের পারিবারিক কাঠামোতেও আতমন্নেসার স্বামীর চিকিৎসার ঘাটতি নেই। তার হাঁপানির অসুখের দাওয়াই আসে প্রায় প্রতিদিন। হাঁপানির রোগীর চিংড়ি মাছ খেতে মানা, তাই তা আর বাড়িতে আনা হয় না। বাচ্চা হওয়ার পর চিংড়ির তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়ার জন্য আতমন্নেসার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু সেই ইচ্ছা পূরণ হয় না। অসুখ-বিসুখের জন্য কোনোদিন কোনো দাওয়াই আসেনি আতমন্নেসার জন্য। কোনো বিশেষ পথ্যিও আনা হয়নি কোনোদিন। স্বামী মারা যাওয়ার পর তার সন্তানেরাও আতমন্নেসার দিকে খেয়াল করেনি; মায়ের প্রতি কোনো কর্তব্য পালন করেনি। আতমন্নেসার বাস্তব কঠিন অসুখকে তারা ভেবেছে মায়ের 'মনের বিমার'। আর আতমন্নেসা দুরারোগ্য ক্যান্সারের হাত ধরে ক্রমশ এগিয়ে চলে মৃত্যুর দিকে।

একজন মানুষের অযত্ন-অবহেলার করুণ দৃশ্য ইলিয়াস ফুটিয়ে তুলেছেন এ গল্পে। আতমন্নেসার অসুখ যখন কুরে কুরে তাকে খাচ্ছে, তখনও সে ওষুধ পায় না। তখন ওষুধ চুরির মানসিক বৈকল্য তৈরি হয় তার মধ্যে। নিজের রোগের উপশম হবে কোন ওষুধে তা জানা নেই আতমন্নেসার। কিন্তু তার ভাবনা ওষুধ খেলেই বুঝি তার কষ্ট লাঘব হবে। তাই ছোট মেয়ে মতিবানুর হাঁপানির ওষুধ চুরি করে খায় সে। নিজের সুস্থতার জন্য মানুষের যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তার পরিচয় পাওয়া যায় আতমন্নেসার ওষুধ চুরির ঘটনার মধ্য দিয়ে।

সমাজ-সংসারে বয়স্ক মানুষের গুরুত্ব কম। সংসারে মা-ছেলে কিংবা মা-মেয়ের চিরন্তন ও মধুর সম্পর্কও একসময় হয়ে পড়ে মূল্যহীন। আতমন্নেসার ছেলে-মেয়েরাও নিজের জীবন সংসার নিয়েই ব্যস্ত। বড় ছেলে সোবহানকে ডেকে আতমন্নেসা তার অসুখের

---

[৩৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সুলতান ডাক্তারের কাছ থেকে দাওয়াই আনতে বলে। কিন্ত সোবহান মায়ের ঘরে যায় না। বরং বিরক্তিতে, রাগে অবিরাম বিড়বিড় করে বলে:

> কৈ যাওনের টাইমে খালি পিছে ডাকবো, খালি পিছু-ডাক দিবো। কাম হয় ক্যামনে? দুনিয়ার মাইনষে হালায় কামাইয়া লাল হইয়া গেলো, আমাগো হইবো ক্যামনে?[৩৯]

দুই মেয়ে মতিবিবি ও নুরুন্নাহার স্বামী, সংসার, নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত। সচ্ছল মধ্যবিত্তের সংসার তাদের। মেজো ছেলে খোরশেদকে কষ্ট করে পড়াশোনা শিখিয়েছেন। সেও মায়ের অসুখে নির্লিপ্ত বরং সে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বের করেছে যে, অসুস্থ স্বামীর পরিচর্যা করে আতমন্নেসার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। পরিবারের সবাইকে সে জানিয়েছে, মায়ের পুরোটাই হলো 'মনের বিমার'। এই অবহেলা ও কৌতুক বড় বেদনা হয়ে বেজেছে আতমন্নেসার বুকে। এই অবহেলাই তাকে পৌঁছে দেয় মনোবিকলনে। নিজের অসুখ সমন্ধে না জেনেই মেয়ে মতির ওষুধ চুরি করে খান। অতঃপর যখন তার ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে তখনও এ রোগের ভয়াবহ পরিণতি চিন্তা করেন না। বরং তিনি উল্লসিত হন জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তার চিকিৎসা করা হচ্ছে এ ভেবে।

তারা বিবির মরদ পোলা

ইলিয়াস অবক্ষয় পীড়িত সমাজের কথক। বরাবরই থেকেছেন মাটির কাছাকাছি। বঞ্চিত মানুষের হাহাকার শব্দরূপ ও শিল্পরূপ পেয়েছে তার গল্পে। 'তারা বিবির মরদ পোলা' গল্পে ইলিয়াস তারা বিবির যৌন জীবনের অপূর্ণতার যন্ত্রণা, খেদকে বিষয়বস্তু করেছেন। 'মানুষের জৈবিক প্রণোদনা, ইচ্ছানিরপেক্ষ চৈতন্য, নঞর্থক জীবনবোধ আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছেন তিনি। গল্পটিতে ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্বের ছাপ স্পষ্ট।' একই সঙ্গে সামাজিক প্রবণতা, অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র ও পার্থক্যভেদকে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

ষাট বছর বয়সে রমজান আলী দ্বিতীয় বিয়ে করে ঘরে আনে পঁচিশ বছরের তারা বিবিকে। তারা বিবির সুঠাম যৌবনে স্বপ্ন-কল্পনায় যে ধরণের পুরুষকে প্রত্যাশা করেছেন, তা অপূর্ণই রয়ে যায় বৃদ্ধ রমজান আলীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কারণে। যৌন জীবনের অচরিতার্থতায় ক্রমশ মনোবিকার তৈরি হয় তারা বিবির মধ্যে। অন্যের বলিষ্ঠ যৌন-জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা বিনিময় বিষয়ে অতিরিক্ত সন্দেহ প্রবণতা তৈরি হয় তার মধ্যে। নিজের

[৩৯]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান গোলজারকে নিয়ে তিনি নানা রকম সন্দেহ প্রবণতায় ভোগেন। বন্ধুর বৌ আলী হোসেনের স্ত্রীর সঙ্গে, বিনয়ের বোনের সঙ্গে, কাজের ঝিয়ের সঙ্গে গোলজারের যৌন যোগাযোগের কল্পনা ও বিশ্বাসে সে স্থিরচিত্ত। ছেলের বৌ সকিনাকে সে এসব ব্যাপারে সতর্ক করে। আসলে তারা বিবি ছেলের 'জুয়ান মরদ' যৌবন, যৌনচেতনা ও তার বিনিময় বিষয়ে বেশি মাত্রায় কৌতূহলী। এতে সত্য ঘটনার চাইতে তারা বিবি বেশি নির্ভরশীল তার মনোকল্পনার ওপর। এ তার এক ধরনের মানসিক জটিলতা, মনোবিকার। একদিকে নিজের স্বামী রমজান আলীর যৌন উত্তেজনার অনুপস্থিতি, অন্যদিকে মানস চোখে পূর্ণ কামোত্তেজনার প্রবল প্রকাশ দেখতে চায় সন্তান গোলজারের মধ্যে। কল্পনার এ দেখা ও কল্পিত অনৈতিক কাজের চর্চার জন্য গোলজারকে বকাঝকাও করেন। কিন্তু বাস্তবে কাজের ঝি সুরুজের মায়ের সঙ্গে গোলজারের সত্যি যৌন সঙ্গমের আয়োজন টের পেয়ে ক্ষোভে দুঃখে বাবা রমজান যখন চিৎকার, চেঁচামেচি ও বিলাপ করে, তখন তারা বিবি স্বীকৃতি দেয় ছেলের 'জুয়ান মরদের কাম'কে। ছেলের অনৈতিক কাজের জন্যে বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে তারা বিবির মনোভাব :

> হইছে! তারাবিবি, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে স্বামীকে থামিয়ে দেয়, 'এমুন চিল্লা চিল্লি করো ক্যালায়? গোলজারে কি করছে? পোলায় আমার জুয়ান মরদ না একখান? তুমি বুইড়া মড়াটা, হান্দাইয়া গেছো কব্বরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে? [৪০]

স্বামীকে নিয়ে তারা বিবির ক্ষোভ-ধ্বনি অন্তত তিনবার বাঙ্ময় হয়েছে গল্পে। সবকিছুতেই সে স্বামীর অক্ষমতাকেই দায়ী করে। গোলজারের বেশি রাত করে বাড়ি ফেরার ঘটনায় উদ্বেগগ্রস্ত তারা বিবি স্বামীকে তিরস্কার করে বলে :

> তুমি তো একখানা মরা মানুষ! তামামটা জিন্দেগী ভইরা খালি বিছানার মইদেই পইড়া রইছো, একটা দিন বুঝবার পারলা না আমি ক্যামনে কি পেরেশানির মইদ্যে ঘরবাড়ি চালাই। কি একখান পোলারে প্যাটে ধরছিলাম ... [৪১]

কৈশোর ও যৌবনের প্রথম পর্যায়ে কখনো কখনো গোলজারের ঘুম ভেঙেছে তারা বিবির খস খসে কণ্ঠস্বরে। রমজান আলীর ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সে বলে :

> অ গোলজারের বাপ! এক্কেরে লাশটা হইয়া রইছো, না? আরে বুইড়া মরদ, খাটিয়ার লাশটা ভি নড়েচড়ে, তোমার নড়ন নাই? বিছানা জুইড়া ভ্যাটকাইয়া রইছো, অ গোলজারের বাপ! [৪২]

---

[৪০]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪৭
[৪১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
[৪২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

শৈশবে তারা বিবির ক্ষোভ ও বিলাপ, রমজান আলীর ধমক ও তারা বিবির গোঙানি গোলজারকে নিরাশ্রয় করে দিতো। নিজেকে মনে হতো ছায়া। মনে হতো, বুড়ো বয়সে তার বাবা বিয়ে না করলে সে জন্মাত না দুনিয়ায়। গ্লানিকর জীবনে না জন্মাবার সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত করে খুব অন্যায় কাজ করেছে তার বাবা। বড় হয়ে বিয়ে করার পর তার সে আক্ষেপ দূর হয়েছে। স্ত্রী সখিনাকে নিয়ে আপাতসুখের দাম্পত্য গড়ে উঠেছে। তবে গোলজার সখিনাকে নিয়ে পুরোপুরি তৃপ্ত নয় সুযোগ বুঝে কাজের ঝি সুজনের মায়ের দিকেও হাত বাড়ায় সে। কাজের ঝি, ছেলের চিকিৎসার দশ টাকার জন্য গোলজারের শরণাপন্ন হলে গোলজার তাকে বিছানায় টানে– এসবই অবক্ষয়িত সমাজের চিত্র। তারা বিবিও পঁচিশ বছরের যৌবন নিয়ে ষাটোর্ধ্ব রমজান আলীর প্রতি তৃপ্ত নয়। মানুষের অবদমিত প্রবৃত্তির অনিবার্যতা, বাঙালি সমাজের সংস্কারগুলো প্রথাবদ্ধতার বৃত্ত ভেঙে অস্বাভাবিক ও উৎকটভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে নানা ঘটনাচক্রে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজের স্পর্শকাতর এ বিষয়টিকে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন গল্পে। সমাজের নানা প্রথার বৃত্তে বন্দী মানুষ ক্রমশ পৌঁছে যায় মানসিক বৈকল্যে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে যাপন করে গ্লানিকর জীবন। সুজনের মা তার উদাহরণ। সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ও নানারকম বিকার তৈরি করে মানুষের মনে। গোলজারের বন্ধু আসাদুল্লা নারীদেহ ভোগ ও মদ্যপানে বেশ অভ্যস্ত। আসাদুল্লা বন্ধুকে এ অভ্যাসে চালিত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে 'তরে মানুষ করতে পারলাম না গোলজার।' এই বক্তব্য থেকে সামাজিক মূল্যবোধের অধঃপতনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে বেশ্যাপল্লীতে যাওয়া ও মদ্যপান মানুষ হওয়ার মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত।

অর্থনৈতিক বৈষম্য, গ্রাম ও শহরের পার্থক্যও খুব স্বল্প কথায় উল্লেখ করেছেন লেখক গল্পে। তারা বিবি পুত্রবধূ সকিনার সঙ্গে আচরণে, কথোপকথনে, অকারণ মন্তব্যে বুঝিয়ে দেয় দুই পরিবারের অর্থনৈতিক বৈষম্য, গ্রাম ও শহরের আভিজাত্যের বিষয়:

> খাল চিনো না?' তারা বিবি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে 'গেরাইম্যা মাইয়া তুমি খাল চিনো না? খালের ধারে হাগামোতা কইরা মানুষ হইচো, আউজকা খাল চিনবার পারো না?[৪৩]

তারা বিবির ভাবনার এই সংকীর্ণ বোধ, জৈবিক অবদমন, প্রতিকারহীনতার পরিণামে অকারণ হট্টগোল ও মনোবিকারের শৈল্পিক উপস্থাপন গল্পটির সমাজ-সত্য নির্দেশক।

---

[৪৩]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩ , পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃবিয়োগ

'পিতৃবিয়োগ' গল্পে পিতাপুত্রের দুরতিক্রম্য দূরত্বের বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে। আশরাফ আলী বিয়ে করে, নিজের চেষ্টায় চাকরি জোগাড় করে স্বাবলম্বী হয়। পোস্টমাস্টার পদে চাকরি সূত্রে ঘুরতে থাকে কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে। প্রথম চাকরিস্থল খুলনায় নিয়ে যায় বৌকে। বৌ গর্ভবতী হয়। বাচ্চা হওয়ার জন্য নিয়ে আসে ঢাকায়। প্রসব ব্যথা উঠলে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে মারা যায় স্ত্রী। ছেলে বড়ো হতে থাকে নানির কাছে। প্রতি মাসের শুরুতে মনি অর্ডারে টাকা পাঠানো এবং মাঝামাঝি সময়ে চিঠি পাঠানোর মধ্যেই আটকে থাকে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। মনি অর্ডারের কুপন ও চিঠিতে ঠাসা থাকে উপদেশ। বাস্তব অভিজ্ঞতাতেও বাবা আশরাফ আলীর সংযম-গভীর আচরণই দেখে এসেছে পুত্র ইয়াকুব। বাবার সঙ্গে আদর যত্ন সোহাগে জড়াজড়ি করতে ইচ্ছে করে ইয়াকুবের। কিন্তু বাবার অনাগ্রহে তা হয়নি। আশরাফ আলী এ ধরনের আচরণকে অনুচিত জ্ঞান করে। বাড়ির আত্মীয়স্বজন, মামা-খালাদের কাছেও বাবার নীরস জীবনেরই গল্প শুনেছে ইয়াকুব। এর মধ্য দিয়ে বাবার সম্পর্কে ইয়াকুবের তৈরি হয় বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ধারণা। কিন্তু বাবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাতে চিড় ধরে। কর্মস্থলে হঠাৎই বাবার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ইয়াকুব ও তার ছোট মামা যান সেখানে। সেখানকার মানুষজন আশরাফ আলী সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার বয়ান করে, তাতে ইয়াকুব জানতে পারে, তার বাবা খুব হাস্যরসিক লোক ছিলেন। গ্রামের ডাক্তার এহসান আলি জানান:

> কতোক্ষণ ধরি গল্পগুজব করলে! উজির আলী সরকার এলো। তার সাথে কতো ঠাট্টা-ইয়ার্কি, কতো হাসাহাসি!' ...'এতো হাসিখুশি মানুষ, এরকম কাউরি কিছু না বলি চেরটাকালের মতো বিদায় নিয়ে যায় এ্যাঁ? [৪৪]

সাহামশাই নামের লোকটিও তার বাবার রসবোধের দিকটি তুলে ধরে। তাদের দোকানের গদিতে গিয়ে বসলে সবাই কাজকর্ম ফেলে আশরাফ আলীকে ঘিরে বসতো :

> এরকম মাটির মানুষ কোনোদিন এই পোস্ট অফিসে আসে নাই। কি রসিক মানুষ, একবার গল্পগুজব শুরু করলো তো রাত দশটাই কি আর বারোটাই কি? [৪৫]

সড়ক দুর্ঘটনার খবর শুনে আশরাফ আলীর আফসোস ও কান্না করা, গ্রামের কোনো গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙে যাওয়া বালিকাকে আদর করে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ানোর গল্প–বাবা সম্পর্কে ইয়াকুবের অভিজ্ঞতাকে এলোমেলো করে দেয়। আর

[৪৪]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩ , পৃ. ১৫২
[৪৫]. প্রাগুক্ত , পৃ. ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতার উচ্চতায় যার অবস্থান, সেই বাবা মদ খেতো, তা কল্পনাতেও ভাবতে পারে না সে। মানুষের জীবনের দুই ভিন্ন চরিত্রের সমন্বয় আশরাফ আলী। ছেলের কাছে সে আদর্শ বাবা ধৈর্যগম্ভীর ও দৃঢ় চরিত্রসম্পন্ন। কিন্তু প্রতিবেশীদের কাছে সে রসিক ও উচ্ছল মানুষ। গল্প করতে গিয়ে যার সময়জ্ঞান থাকে না। উন্মত্ত পানেও তিনি অভ্যস্ত। মানুষের জীবনের দুই ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তার জীবনেরই অত্যাবশ্যক অংশ। ইলিয়াস মানবজীবনের এ বৈচিত্র্যকেই স্থান দিয়েছেন আশরাফ আলী চরিত্রে।

'খোঁয়ারি' গল্পগ্রন্থে ইলিয়াস অনেক বেশি মানব চরিত্র-অনুসন্ধানী। এ গ্রন্থের কিছু গল্পে সমাজ চিত্র স্পষ্টতর হলেও অবশিষ্ট গল্পে মানুষের বৈচিত্র্যময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মনন ও ক্রিয়ানুভূতিই প্রধান হয়েছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সময়ের মধ্যে লেখা *খোঁয়ারি* গ্রন্থের গল্পগুলো। এই সময়টাই বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও বন্দুকের মুখে ক্ষমতা দখলের কাল। এই সময়েই জনমনে ভীতি ও নিরাশার ভার জমতে থাকে। ইলিয়াস এ সময় মানব চরিত্রের গভীরে প্রবেশের অনুশীলন করেছেন। খুব গভীর তলদেশ স্পর্শ করতে পেরেছেন কি না, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে এসব গল্পেই ইলিয়াসের নির্মাণপ্রতিভা ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুধভাতে উৎপাত*

দুধভাতে উৎপাত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থের চারটি গল্পেই সমাজের গতি-চিত্র প্রধান হয়েছে। 'মিলির হাতে স্টেনগান', 'দুধভাবে উৎপাত', 'পায়ের নীচে জল' ও 'দখল'–গল্প চারটি গ্রাম ও শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত। এই গ্রন্থেই প্রথম ইলিয়াস গ্রামীণ পটভূমি নিয়ে দুধভাতে উৎপাত, পায়ের নিচে জল ও দখল গল্প তিনটি রচনা করেন। প্রত্যেক গল্পেই অর্থনৈতিক জীবনচিত্র, সামাজিক রীতিনীতির গোঁজামিল ও গোঁয়ার্তুমি, দরিদ্র জীবনের বঞ্চনা, আশার আলোকচিহ্ন স্পষ্টতর হয়েছে।

মিলির হাতে স্টেনগান

'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী অরাজকতার ভয়াবহ বিস্তার ও গণচেতনার স্বপ্ন ভঙ্গ ও বেদনার স্মারক। মিলির ভাই রানা তার বন্ধু সোহেল, সিডনি, ফয়সালসহ পাঁচজন মিলে গড়ে তোলে পঞ্চপাণ্ডব বাহিনী। এই বাহিনী দামি দামি জিনিসপত্রে ঘর ভরে তুলছে। ছিনতাই করা জিনিসপত্রে ঘর ভরলেও তাদের কেউ ধরা পড়ে না। কারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক। দুর্বৃত্তায়নের এই প্রাতিষ্ঠানিক চক্র মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজের অধঃপতনের বাস্তব চিত্র। এই চক্র ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। রানাদের দলে যে পাঁচজন ছিল তাদের একজন গাড়িওয়ালা; যার বাবার অবস্থান ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। গল্পে উঠে এসেছে তার বিবরণ:

> ওর বাবা টপ লেবেলের এম.পি। আবার সেক্রেটারিয়েট আত্মীয়-স্বজনে ভরা।[৪৬]

পঞ্চপান্ডবের দলে আরও একজন আছে, দেখতে 'রোগাপটকা'। কিন্তু তাতে কী? ব্যবসা হোক, আর ছিনতাই ও মানুষকে ভয়ভীতি দেখানো হোক– সব ধরনের কাজেই তার মাথা একেবারে পরিষ্কার। লুটপাটের ব্যাপারে এক হতে এমপি পুত্র ও কেরানি আশরাফ আলীর পুত্র রানার সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদায় কোনো সমস্যা হয় না। টেলিভিশন থেকে শুরু করে ফক্সওয়াগন গাড়ি– সব কিছুই আসে রানার বাড়িতে। পঞ্চপাণ্ডবদের নিজস্ব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও হয়েছে, 'ইনডেন্টিং ফার্ম'। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তারা প্রতিবেশী ও অন্যান্য লোকের মুখ বন্ধও করেছে সাফল্যের সঙ্গে। শুধু অসুস্থ আব্বাস পাগলাই প্রচণ্ড ঘৃণা ও আঘাতের সংকল্পে দৃঢ়চিত্ত; অবিন্যস্ত বাক্য বিন্যাসে উগড়ে দিতে থাকে রানার ও তার

[৪৬]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩ , পৃ. ১৬৬

*** *দুধ ভাতে উৎপাত* আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ। ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন বন্ধু ফিরোজ হোসেনকে। 'মিলির হাতের স্টেনগান, 'দুধ ভাতে উৎপাত', 'পায়ের নিচে জল' ও 'দখল' মোট চারটি গল্প স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। এসব গল্প গ্রামীণ ও শহুরে পটভূমিতে লেখা।

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধুর দেশদ্রোহী চরিত্র ও অপকর্মের ফিরিস্তি। রানার বোন মিলিকে সে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে, রানা বাসায় নেই। আব্বাস পাগলা মুখ ভ্যাংচায়। রানার বাসায় না থাকার কারণটি উঠে আসে আব্বাস পাগলার উচ্চারণে:

> নেই! নাই কেল্লায়? কৈ গেছে? কারে হাইজ্যাক করবো? দুই ঘন্টা আগে দেখলাম মস্তানগুলি টেলিভিশন লইয়া আইলো, অহন গেছে রেফ্রিজারেটর আনতে? কৈ গেছে, কইলি না? [৪৭]

রানা মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে যুদ্ধাস্ত্রসহ। অস্ত্র ফেরত না দেওয়া বেপরোয়া যুবকদের দেশপ্রেম, স্বাধীনতার মূল্যবোধ কিছুদিনের মধ্যেই মুছে যায়। প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে অস্ত্রের জোরে সম্পদ লুট, ছিনতাই, ব্যবসা, রাজনৈতিক ও আইনের লোকজনকে 'ম্যানেজ' করা। এই দুর্বৃত্তায়ন প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের ফেলে দেয় অনিকেত যন্ত্রণার বোধে। স্বাভাবিক সুস্থতা তিরোহিত হয় জনমন থেকে। অসুস্থ, উত্তেজিত, অক্ষম এই জনমনের প্রতিভূ চরিত্র আব্বাস পাগলা। স্বাধীনতার সময় তিনি যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের যে লক্ষ্য তা ধূলিসাৎ হতে দেখে আব্বাস মাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বাঙালি বেঈমান মুক্তিযোদ্ধা, দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করতে চান। সে কারণে তার একটা স্টেনগান দরকার। রানা তাকে দিতে চেয়েছিল বলে তার মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে রানা তাকে জানে 'ইনটলারেবল বাস্টার্ড' হিসেবে। আব্বাস পাগলার মানস-চোখে ধরা পড়ে:

> রানায় আমারে দিলো না। একটা স্টেনগান দিবো– আমারে জবান দিয়া অহন খালি ঘুরাইতেছে! উই হালায় ভি অকুপেশন আর্মির লগে লাইন দিছে কৈ যাই? খালি দালাল, খালি কুইসলিং!' মন খারাপ করার ভঙ্গিতে সে বলে 'ঠিক আছে! আমারে তো চিনে নাই। এই কোলাবোরেটারগুলিরে আমি টিকটিকি দিয়াও মারাই না। ... একদিন না একদিন তগো ব্যাকটিরে কব্জার মইদ্যে পামু, দুই উংলির মইদ্যে ধইরা তগো মাক্ষির লাহান জাইত্তা মারুম[৪৮]

অবশ্য আব্বাস পাগলার জীবনে সে সুযোগ কোনো দিনও আসে না। রানা ও তার বন্ধুর তত্ত্বাবধানে আব্বাস পাগলাকে ভর্তি করানো হয় পি.জি. হাসপাতালের মানসিক ওয়ার্ডে। আর পঞ্চপাণ্ডব মেতে থাকে মজনু ভাই ও অন্য নেতাদের ধরে 'পারমিট পাওয়ার' ব্যাপারে। ঢাকা ক্লাবের প্রোগ্রাম, অ্যাকশন ও ইনডেন্টিং ফার্ম নিয়ে তারা ব্যস্ত। কয়েক মাস পর চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে আব্বাস পাগলা। মিলতে চায় রানার সঙ্গে। রানার ফার্মে কাজ নিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য তার অনুনয়-বিনয় শোনা যায়। আব্বাস পাগলা

[৪৭]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৭১
[৪৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

অসুস্থ অবস্থায় রানা ও তার বন্ধুদের অন্যায় অপকর্ম স্পষ্ট দেখতে পায়। প্রতিশোধ নিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। সুস্থ হয়ে ভিড়তে চায় রানার সঙ্গে। রানার বোন মিলিকে বলেন,

> রানারে একটু বুঝাইয়া কইয়ো। রানারা কয় বন্ধু একটা ইন্ডেনটিং ফার্ম করছে। রানা ইচ্ছা করলে আমারে প্রভাইড করতে পারে।[৪৯]

মিলি তার শুদ্ধ চেতনায় মিলে গিয়েছিল অসুস্থ আব্বাস পাগলার প্রতিবাদী চেতনার সঙ্গে। তাই মিলি লুকিয়ে স্টেনগান তুলে দেয় আব্বাস পাগলার হাতে। তিনি তখন জানান 'মিলি আমি ভালো হইয়া গেছি।' ১৯৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশে সুস্থতার মানে অন্যায়ের সঙ্গে আপস, গতানুগতিক সামাজিক যাত্রায় শামিল হওয়া। বিবেকবান, প্রতিবাদী মানুষেরা তখনকার সমাজে অসুস্থ বলে বিবেচিত হয়। অসুস্থ আব্বাস পাগলার স্টেনগানের দরকার হয়, সুস্থ হলে তিনি কোনো অন্যায় দেখতে পান না। তাই স্টেনগানেরও কোনো প্রয়োজন হয় না। মিলি স্টেনগান হাতে উঠে যায় ছাদে। দখল হয়ে যাওয়া চাঁদের বিস্তৃতিতে যাওয়ার জন্য উড়াল দিতে পাখা ঝাপ্টায়। চাঁদের ভূমি আসলে মিলি ও আব্বাস পাগলাসহ আপামর জনগণের স্বপ্নময় মাতৃভূমির চিত্রকল্প।

মিলির মা-বাবাও ছেলের অপকর্মে মানসিকভাবে শামিল হয়। নিজেদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের একটা বড় উপায় হিসেবে দেখে ছেলে রানার ছিনতাই করে আনা দামি জিনিসপত্রকে। রানার জন্যেই ঘরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে, কিছুটা মানুষের মতো দিন যাপন করা সম্ভব হচ্ছে। মা-বাবার এমন মানসিকতা বলে দেয় রানার কর্মে তাদের খুশির খবর।

'মিলির হাতে স্টেনগান' ইলিয়াসের সচেতন সমাজ ভাবনার স্মারক; যেখানে শিল্পিত রূপে যুক্ত হয়েছে তার কমিটমেন্টও। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সমকালীন সমাজ-গতির বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছেন লেখক। আব্বাস পাগলা স্বাধীন বাংলাদেশের গণমানুষের বিবেক। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের প্রত্যয়ের প্রতিভূ চরিত্র। আব্বাস পাগলার প্রতিজ্ঞা ও প্রবণতা

মিলির মনে দাগ কাটে। মিলির বাবা-মা, ভাই রানা তাদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভাজনসৃষ্ট অসচ্ছলতা আশরাফ সাহেবের মূল্যবোধ, রানার মা মনোয়ারা বেগমের মাতৃত্ব ও রানার বেড়ে ওঠা–

[৪৯]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮২

সবকিছুতেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সমাজের সম্পদ বন্টনে সমতা না থাকায় তাদের সৎভাবে বাঁচার পথ রুদ্ধ হয়েছে। আশরাফ আলীর মূল্যবোধে চিড় ধরিয়েছে। রানা বাবার অক্ষম হাতের যন্ত্রণা ঘোচায়। অবৈধ পথে, অস্ত্র হাতে রোজগার করে আনে ভালোভাবে বাঁচতে। তৈরি হয় আগ্রাসী ভাবনার বোধহীন তৎপরতা। মিলি এ তৎপরতার বিরুদ্ধে। সমস্ত বিবেকবর্জিত কাজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য আব্বাস পাগলার হাতে স্টেনগান তুলে দিতে চায়। অসুস্থ আব্বাস পাগলা প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু সুস্থ আব্বাস পাগলা অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা চায়। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় রানারা রোজগারের চোরাগোপ্তা পথে উপরের স্তরে উঠতে চায়। সেই সমাজ গতিচিত্রের বাস্তব-পাঠ 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্প।

দুধভাতে উৎপাত

'দুধভাতে উৎপাত' গল্পে লেখক গ্রামীণ পটভূমিতে জয়নাব নামের এক নারীর ক্ষুধা বুভুক্ষার চিত্র তুলে ধরেছেন। সেই সাথে বঞ্চনা ও অবিচারের যন্ত্রণা, শোষণের নানান মাত্রাও উঠে এসেছে গল্পে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে অবক্ষয়ের প্রধান কারণ, 'প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। পরিণামে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির অন্তর্গত ব্যবধান আরো প্রকট হওয়াই স্বাভাবিক।'[৫০]

'দুধভাতে উৎপাত' গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসুস্থ জয়নাবের দুধ ভাত খাওয়ার আকুতি ও তার অপূর্ণতার কাহিনি। স্বামী কসিমুদ্দিন বাস করে তিস্তাপারের গ্রাম খোলামহাটিতে। থাকেন গ্রামের মাতব্বর আজমত আলী প্রধানের বাড়িতে। বাড়ির মক্তবে গ্রামের ছেলেমেয়েদের আমপারা সেপারা পড়ান; মসজিদে আজান দেন। ইমাম সাহেব এদিক-ওদিক জেয়াফতে গেলে নামাজও পড়ান। কোরবানির ঈদে তিনি বাড়ি আসেন অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি বোঝাই ৮/১০ সের জ্বাল দেওয়া খাসি ও গরুর মাংস নিয়ে। বছরে এই একবারই তাদের ছনের ঘরে গোশতের ঝোল ও ভুনার সুবাসে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। বছরের অবশিষ্ট সময় তারা আধাপেট কিংবা উপোস করে। জয়নাব ও তার সন্তানদের ক্ষুধা ও অন্নাভাবের যে মর্মন্তুদ বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পে, তা বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রাত্যহিক ঘটনা। লেখক হিসেবে ইলিয়াসের বিশিষ্টতা, তিনি কোনো তাত্ত্বিক বিষয়ের আশ্রয় না নিয়ে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষুধা-যন্ত্রণার সাদামাটা ঘটনাকে ভাষারূপ

[৫০]. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আমাদের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান, দৈনিক ইত্তেফাক, ১ বৈশাখ, ১৩৯৯ সন

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন। পাশাপাশি হাশমত মুহুরির পরিবারের যে ভূমিকা গল্পে উঠে এসেছে, তা সমকালীন বাংলাদেশের উঠতি ধনিক শ্রেণির শোষণের চিত্র।

জয়নাবের তিন ছেলে অহিদুল্লা, আহমদউল্লা, বয়তুল্লা, মেয়ে হাজেরা সারা বছরই ক্ষুধায় কাতর থাকে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় বড় ছেলে অহিদুল্লাহ ক্ষুধা নিবারণের জন্য মিথ্যা অভিনয় করে। স্কুলে যাওয়ার নাম করে সে যায় ধলেশ্বরী নদীর লঞ্চঘাটে। উঠে পড়ে ভেড়ানো লঞ্চে। লঞ্চ চলতে শুরু করলে খোঁড়ার অভিনয় করে যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা চায়। নবীজীর মৃত্যুবৃত্তান্ত বর্ণনা করে, মা ফাতেমার আহাজারি শুনিয়ে কাপড়ের ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে দুই-আড়াই টাকা জোগাড় করে। তারপর রামেশ্বর ঘাটে নেমে কদম আলীর দোকানে বসে চায়ে ভিজিয়ে বনরুটি, পেয়ারা, গাব খেয়ে পেট ভরে। এরপর একে একে পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয় জয়নাবের পরিবারের ক্ষুধা-বৃত্তান্ত। মাখন ঘোষের পোড়ো ভিটায় মেটে আলুর খোঁজ, হাশমত মুহুরির জামাই হারুন মৃধার দোকান থেকে বাকিতে আধমণ চাল আনা সবই ক্ষুধা কাতর পরিবারের ক্ষুধা নিবারণের প্রচেষ্টা। পরিবর্তে তার কালো গাভিকে নিয়ে যায় হারুন মৃধা। মৃত্যুকালে জয়নাবের নিজের ও সন্তানদের দুধভাত খাওয়ানোর শখ এবং সেই আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতায় আটা গুলে দুধ তৈরি ও তাতে এক শানকি ভাত মাখানোর চিত্র অনন্য। আর সেই ভাত নিয়ে জয়নাবের সন্তানদের কাড়াকাড়ি, দরিদ্র মানুষের ক্ষুধার ভয়াবহতাকেই চিত্রময় করেছেন লেখক :

> বিছানার ওপর থেকে মাটির সানকিটা কখন যে পাচার হয়ে গেছে ঘরের পূর্ব কোণে এমন কি ওহিদুল্লাও টের পায়নি। কাদাকাদা মেঝেতে একমাত্র সে ছাড়া আর সবাই লেপ্টে বসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটির সানকির ওপর। হাজেরা তার ডান হাত দিয়ে খাচ্ছে বটে ... কানা রহমতউল্লা এক চোখে যা দেখে সমস্ত সানকিটা দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে তাই যথেষ্ট ... মনে হয় খাওয়ার সুখে তার চোখটা বুজে এসেছে। আর কনিষ্ঠ আহমদউল্লা দুই হাতে ভাত খাচ্ছে ... এই সব জানোয়ারের ওপর রাগে তার সর্বশরীর অর্থাৎ সমস্ত পেট জ্বলে ওঠে, ইচ্ছ করে সানকিটা কেড়ে নিয়ে দুধ ভাত সমেত চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।[৫১]

দুধভাত নয়, শুধু ভাতের অভাব ও ক্ষুধার তাণ্ডব ও তাড়নাই প্রধান ব্যাপার। এই ক্ষুধার তাড়না থেকে রক্ষা পেতে পরিবারের একমাত্র সম্বল কালো গাইও আধমণ চালের মূল্য হিসেবে চলে যায় হাশমত মুহুরির জামাই হারুন মৃধার দখলে। মৃত্যুকালে জয়নাবের দুধভাত

[৫১]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৯৩-১৯৪

খাওয়ার বাসনা এবং হাশমত মুহুরির পরিবার কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যানের যে ভাষা ও স্বর গল্পে প্রকাশিত হয়েছে, তা ধনী এবং নির্ধনের দ্বন্দ্বকে প্রকট করেছে।

> ওহিদুল্লা মিন মিন করে, 'না, হ্যার হাউস হইছে দুধভাত খাইবো, মায়ে বলে বাঁচবো না।'' ... মুহুরির শহরবাসী ছেলের কথা বরং সর্ষের তেলের ঝাঁঝে খোনা শোনায়, 'দুধভাত খাইলে তর মায়ে ফাল পাইড়া উঠবো, না?... মুহুরির বউ বলে, তর মায়ে–বুইড়া মাগীটার ঢঙের হাউস হইছে দুধভাত খাইবো! [৫২]

শ্রেণিচেতনার মধ্য দিয়ে ইলিয়াস নির্মম বাস্তবতার পরত উন্মোচন করেছেন। আর্থসামাজিক বাস্তবতায় হাসমত মুহুরি ও হারুন মৃধারা নির্মম শোষণের জাল বিস্তার করে, ক্রমাগত আর্থিকভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠে; অহিদুল্লারা বাঁচার সংগ্রামে, অন্নের সংস্থানের জন্যই জীবনের সব তৎপরতা চালায়। সমাজগতির এই চিত্রের ভাষারূপ 'দুধভাতে উৎপাত'।

পায়ের নিচে জল

'পায়ের নিচে জল' গল্পটি ইলিয়াসের সার্থক শিল্প-নিদর্শন। এ গল্পে যেমন গ্রামীণ ও শহুরে প্রেক্ষাপটে শোষণের চিত্র এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত সম্প্রসারণের চিত্র উঠে এসেছে তেমনি স্থান পেয়েছে শ্রেণি পরিবর্তনের ধাক্কায় তলিয়ে পড়া, গড়িয়ে পড়া নিমজ্জিত গরিব মানুষের মনের যাতনা। এক শ্রেণি ক্রমশ উঁচু তলায় উঠছে, আরেক শ্রেণি তলিয়ে যাচ্ছে দারিদ্র্যের অতলে। দরিদ্র মানুষদের বসতভিটা ভেঙে গেছে নদীর তোড়ে। ক্ষুধার তাড়নায় তারা হারাতে হয়েছে জমি, বসতভিটা সব। বিনিময়ে পেয়েছে অল্প কিছু ধান। ভিটেমাটি বসত বাড়ি হারানো এসব ভুখা মানুষের ভিড় জমছে বাঁধের ওপর। জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে একমাত্র অবলম্বন এই বাঁধ, এই মাটি। পায়ের নিচে তাদের মাটি নেই। শুধুই জলের দাপাদাপি। গ্রামের মাতব্বর উঠতি ধনিক ও লুণ্ঠনকারী আলতাফ মৌলবীর তৎপরতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাদের বাঁধে উঠে আসতে বাধ্য করেছে। এসব সহায়সম্বলহীন দরিদ্র কৃষকদের ওপর আলতাফ মৌলবীর রাগ ও ক্ষোভ, দরদ ও ভালোবাসার যে ক্রূর ও কপট মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, গল্পে তার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

> তিনটা বছর আগে বান্দের ওপর উঠলি, তগো নামাবো ক্যাডা? এই বান্দ ভাঙলে নোকসান কার? নদীর মাথাও ঘুরান দেওয়া লাগবো না, এ্যাল্লাখানি হাত-পাও মোচড়াইলেই ভাঙা বান্দ দিয়া পানি ঢুক্যা পশ্চিমমুড়ার তামাম গাঁও তলায়া দিবো না? থানা হাসপাতাল ইস্কুল কিছু থাকবো? [৫৩]

[৫২]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮৮
[৫৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

গ্রামের লোকদের জন্য দুশ্চিন্তা নয় বরং বন্যার পানিতে নিজের সম্পদ নষ্টের চিন্তায় আলতাফ মৌলবি কাতর। এই সম্পদ, স্বার্থের দুশ্চিন্তাই ক্ষোভ ও করুণা হয়ে ঝরে তার মুখ থেকে। গ্রামের মানুষের সম্পদ দখল ও লুঠ করে সম্পদশালী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সে কৌশলী ও হিংস্র। সবার থেকে তার অবস্থান উচ্চে। দুই ছেলের একজন জেলা খাদ্য অফিসের পিয়ন। অন্যজন থাকে মধ্যপ্রাচ্যে। কাঁচা টাকা ও বুদ্ধির তেলেসমাতিতে গ্রামের মানুষের ক্ষুধা ও অভাবকে অবলম্বন করে আলতাফ মৌলবির লুণ্ঠন তৎপরতা গতি পায়। গ্রামের দরিদ্র কৃষক কিসমত সাকিনদারের ছোট ছেলে আকালুর বক্তব্যে ধরা পড়ে আলতাব মৌলবির প্রকৃত চরিত্র :

> আকালের বছর গাঁয়ের ছয় আনি জমি তো তাঁই (আলতাব মৌলবী) নিলো। কিসের ট্যাকা, কিসের দাম, কয় মন ধান দিয়া কয়, চল রেজিস্টি অফিসত চল। কতো দলিল কর‍্যা নিছে তার বলে হিসাব কিতাব নাই। মানষেক ভিটা ছাড়া করছে, মানষে এখন বান্দের উপরে ঘর তুললে তার গোয়া কামড়ায়।[৫৪]

আশির দশকে গ্রাম-শহর উভয় প্রেক্ষাপটেই সম্পদ দখল ও পুঞ্জীভূত করার এক মহা-উৎসব শুরু হয়। এ সময়কালে বাংলাদেশের মানুষ নতুন করে সামরিক শাসনের অধীনে আসে। 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোয়' চলতে থাকে রাষ্ট্র। মানুষের মনে ভীতি ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সম্পদ রক্ষা ও আহরণে কোনো আদর্শই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আতিকের বড়ো ভাই কট্টর সমাজতান্ত্রিক। উঠে পড়ে লেগে যায় সম্পদ বাড়ানোর দৌড়ে। তাদের গ্রামের জমিতে বর্গার ফসল দিয়ে চলছে কিসমত সাকিনদারের পরিবার। তাদের জমিতেই বসতভিটা গড়ে এই পরিবারটি। অথচ তাদের উচ্ছেদ করে টাকা সংগ্রহের প্রচেষ্টায় কোনো ব্যাঘাতই ঘটাতে পারে না তার সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী মতাদর্শ। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ মিলিয়ে যায় সম্পদ আহরণের ভাবনায়। টাকা দিয়ে টাকা বাড়ানোর ব্যাপারে সে নিঃসঙ্কোচ। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই তার মনে। ঢাকায় একাধিক বাড়ি করে ভাড়া দিয়ে সম্পদ বাড়ানোর প্রচেষ্টায় তাই সে একনিষ্ঠভাবে তৎপর। তার কাছে সমাজতান্ত্রিক হওয়া আর সমাজতান্ত্রিক দেশের দূতাবাসকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে মাসে মোটা অঙ্কের টাকা রোজগার করা প্রায় একই। দুয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করে সে। সমাজতান্ত্রিকদের এই গোঁজামিল দেওয়া মতাদর্শের কারণে বড় কোনো ধাক্কা তারা লাগাতে পারেনি সামরিক সরকারের গায়ে। সে

[৫৪]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২০৭-২০৮

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের ঢাকা শহরের শিক্ষিত, প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার দৈন্য ও দুর্দশাকে স্পষ্ট করেছেন লেখক গল্পের এই অংশটুকুতে:

> কিন্তু টাকারও খুব দরকার। ধানমন্ডির বাড়ি তিনতলা করতে হবে, টাকা চাই। গুলশানের প্লট আর কতোকাল ফেলে রাখবে-টাকা চাই। মেজোভাই ইকনমিকস পড়ার জন্য হার্ভার্ডে এ্যাডমিশন পেলেও স্কলারশিপের নিশ্চয়তা নাই, টাকা চাই। এখন টাকা সংগ্রহের এই তেতো কাজটা করতে হবে আতিককে। গুলশানের প্লটে কনস্ট্রাকশন শুরু করার জন্যে বড়োভাই হন্যে হয়ে উঠেছে। কোন গভর্নমেন্ট কি পলিসি নেয় এই দেশে কে বলতে পারে? শহরে জায়গা খালি রাখা রিস্কি। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না বলে বড়োভায়ের আক্ষেপের সীমা নাই। গুলশানে বাড়ি করে সমাজতান্ত্রিক কোনো দেশের এমব্যাসিকে ভাড়া দিলে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে একটা লিঙ্ক থাকে, মাসে বিশ পঁচিশ হাজার টাকাও আসে।[৫৫]

আতিকের পরিবারের এই তৎপরতায় কিসমত সাকিনদারের পরিবারের অনিবার্য পরিণতির ঘোষণা আসে ছোট ছেলে আকালুর মুখ থেকে :

> জমি তো আমাগো আছেই। আমাগোর জমি বান্দের উপরে। আমরা বান্দের জমিনদার।[৫৬]

কিসমতের পঙ্গু ও অসুস্থ ছেলে আসমতের করুণ আবদার ও অনুরোধে পরিবারটির অস্তিত্ব রক্ষার শেষ প্রচেষ্টাটি উচ্চারিত হয়। সে উচ্চারণ আসমতেরই মতো রুগ্‌ণ ও ক্ষয়িষ্ণু। যা বাস্তবে খুঁজে পায় না ভরসার আশ্বাস :

> অ হুজুল, আমাগোলে উথায়া দিবেন না গো! [৫৭]

এই কাতরধ্বনি কেবল তাদের নিরস্তিত্বকেই প্রকট করে তোলে। গ্রাম শহর দুই দিকের তৎপরতায় এসব দরিদ্র মানুষ কেবলই নিমজ্জিত হতে থাকে জলে। মুছে যেতে থাকে অস্তিত্বের ভৌগোলিক সীমানা থেকে। হয়ে পড়ে চিহ্নহীন, ভাসমান মানুষ। বাঁধের বাসিন্দা।

---

[৫৫]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২০৬
[৫৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
[৫৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

Dhaka University Institutional Repository

দখল

'দখল' গল্পটিতে ইলিয়াসের সচেতন রাজনীতিমনস্কতার ছাপ আছে। ব্রিটিশ রাজত্ব, পাকিস্তান শাসনামল ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের ঘটনাবলি এ গল্পে স্থান পেয়েছে। গ্রাম ও শহরের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতি ও গণমানুষের আন্দোলন সংগ্রামের অনন্য চিত্র হয়ে উঠেছে গল্পটি। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র মোয়াজ্জেম হোসেন। ব্রিটিশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সব আমলেই যার মূল পরিচয় শোষক হিসেবে। জনগণের শ্রম ও ঘামে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে সে; জমিদার হয়েছে। আশপাশের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের সে বিনা পারিশ্রমিকে খাটায়; এমনকি তাদের খোরাকিও দেয় না। মজুরেরা খাবার চাইলে সেটা মহা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। তাদের শায়েস্তা করতে ডাকাতির মিথ্যা মামলা দিতেও বাধে না তার। আকালু পরামানিককে ডাকাতির মামলার প্রধান আসামি করা হয়, মোয়াজ্জেম হোসেনের তৈরি করা তালিকায়। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে মার খায় আকালু। আর পুলিশের কর্তব্য ও কৃতজ্ঞজ্ঞানে খুশি থাকেন মোয়াজ্জেম হোসেন। ব্রিটিশ রাজত্বে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, ন্যায়নীতি ও সুশাসনের জন্য তাই হতাশা প্রকাশ করতে শোনা যায় পাকিস্তান শাসনামলে মোয়াজ্জেম হোসেনকে। মোয়াজ্জেমের বড় ছেলে মোবারকের পুত্র ইকবালের কাছে তার বাবার জন্মের সময়কালের বর্ণনা দেন মোয়াজ্জেম।

> তখন ব্রিটিশ আমল। যাই বলো না সায়েবদের আমলে অফিসারদের কেরানিদের ঘুষ খাওয়া আর কাজে ফাঁকি আর কারণে-অকারণে জমির ওপর ট্যাক্স বসানো ছিলো না। ভেজাল কি জিনিস তাদের আমলে কেউ জানতো না। তা সুখে থাকলে ভূতে কিলায় বাপু- এত সুখ সহ্য হবে কেন? দেশের মানুষ সায়েব তাড়াবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠলো[৫৮]

মূলত এই শ্রেণিটি বিদেশি শাসকদের গোলাম, সুবিধাভোগী জোতদার। তাই ব্রিটিশ শাসন অবসানের পরও তাদের মনেপ্রাণে থেকে যায় গোলামি চেতনা। উপনিবেশবাদ ভর করে থাকে তাদের মস্তিস্কে-মননে। ব্রিটিশ শাসকের হাতিয়ার হওয়ায় লাভের অঙ্কটাই তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে, লোকসান কখনো চোখে পড়ে না। পরাধীনতার গ্লানিও কোনো দিন স্পর্শ করতে পারে না মোয়াজ্জেম হোসেনদের। ব্রিটিশরাজের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্য দিয়েই সেটা বোঝা যায়।

> পুলিশ কও, দারোগা কও, এস.ডি.ও কও, ম্যাজিস্ট্রেট কও, সেই আমলে এলাকায় এলে সবাইকে একবার এই বাড়িতে আসতেই হতো।[৫৯]

---

[৫৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১৫

[৫৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ শাসকদের জন্য এত দরদি মোয়াজ্জেম হোসেন নির্দ্বিধায় সহজেই ভিড়ে যায় পাকিস্তান আমলে, শাসকগোষ্ঠীর চেতনায়। নিজের সুবিধার্থে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের সঙ্গেই সে গাঁটছড়া বাঁধে। বড় ছেলে মোবারককে কলকাতায় কলেজে ভর্তি করে। সেখানে সে মুসলিম লীগের ছাত্রনেতা ইয়াসিন সাহেবের হাতে তুলে দেয় নিজের ছেলেকে। আর ভোটের সময় নিজের বাড়িতেই খুলে বসে মুসলিম লীগের অফিস। নিজের সুবিধা আদায়ে যেমন দরকার ছিল শাসকদলের সহযোগিতা, তেমনি শাসক দলের হাতিয়ার হিসেবেও তার ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। পরস্পরের জন্য সেই সম্পর্ক সব সময় ছিল অটুট। স্বাধীনতার পর মোয়াজ্জেম হোসেনের মেজো ছেলে মোতাহের যোগ দিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগে। ছেলের সঙ্গে বাবারও ভরসা হয়ে উঠে সরকারি রক্ষী বাহিনী। গ্রামের গরিব চাষি, জেলে, কলুদের শায়েস্তা করার জন্য সে ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে রক্ষী বাহিনী নিয়ে আসে। দাদার এ চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে নাতি ইকবালের দৃষ্টিকোণ থেকে:

> তুমি শালা বুড়ো শয়তান তোমার আরেক ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে রক্ষী বাহিনী নিয়ে আসো গ্রাম উজাড় করার জন্য![৬০]

কাঁঠালপোঁতা, শিবহাটি, গুনাহার, তেলিহার গ্রামের চাষিদের শোষণ করেছে যেভাবে চিরকাল, নিজের নাতিকেও শরিয়তের কথা বলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে মোয়াজ্জেম হোসেনের বাধে না। তার শোষক চরিত্র পুরোটাই আয়ত্ত করেছে ছেলে মোতাহার হোসেন। মোতাহারের এই শোষক ও লোভী চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে ভেদুর সংলাপে:

> তুমি বাপ তোমার দাদার সাথে হাত মিলাও ক্যা কও? তোমার দাদা তোমাক সম্পত্তি দিবি? তোমার চাচা,– তাঁই পয়সার জোঁক, পিঁপড়ার গোয়া টিপ্যা তাঁই গুড়ের অস বার করে, তাঁই তোমাক জমির ভাগ দিবি? [৬১] (পৃষ্ঠা ২২৫)

এই শোষণ চলমান রাখার পথে যখন বাধা হয়েছে কাঁঠালপোঁতা, শিবহাটি, তেলিয়াহাটি, গুনাহারের দরিদ্র ও রাজনীতি-সচেতন জনগণ, তখনই প্রতিশোধের জন্য উঠে পড়ে লাগে মোতাহার। রক্ষী বাহিনীর প্রতি তার নির্দেশ:

> সব শালাকে মারো, শত্রুর বীজ রাখা আহাম্মুকি[৬২]

মোবারক হোসেন কম্যুনিস্ট পার্টির যে সাম্যের বাণী ও শত্রুকে প্রতিরোধের কথায় দীক্ষিত করেছে গ্রামবাসীদের, তা বিফলে যায়নি। গ্রামবাসীর সম্মিলিত বুদ্ধি ও প্রচেষ্টায় রক্ষী বাহিনীকে দু-চারটি বন্দুকের গুলির শব্দে ভুলিয়ে তারা নিয়ে যায় তেলিহারের দিকে। আর

---

[৬০]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২২০
[৬১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫
[৬২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

হাজার হাজার গ্রামবাসী সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে শোষক মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ি। সরকারি বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে এ প্রতিরোধ টিকতে না বেশিক্ষন। ইকবালের ভাষ্যে তাই শোনা যায় এই করুণ বাস্তব কথাটা:

> এই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ বড়ো জোর সকাল পর্যন্ত টিকবে। বগুড়া কি রংপুর শহর থেকে রক্ষীবাহিনীর বড় দল আসছে। রক্ষী বাহিনীতে না কুলালে সেনাবাহিনী আসবে। কিন্তু তারা আসার আগেই এই বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। টিকে থাকবে কেবল ওর বাপের কবর।[৬৩]

ইলিয়াস ইতিহাস-সচেতন। তাই তিনি ইতিহাসের সত্যকে এড়িয়ে যাননি। বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির দুর্বলতা ও অসততাকেও সামনে এনেছেন তিনি। ইকবালের বড় মামার সুবিধাবাদী বামপন্থী রাজনৈতিক চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে গল্পে। অপরপক্ষে প্রকৃত ত্যাগী কর্মীর উদাহরণ হয়ে রয়েছে ইকবালের বাবা মোবারক হোসেন। যিনি 'মানুষের হৃত অধিকার উদ্ধার করতে গিয়ে' নিহত হন জেলখানার মধ্যে পুলিশের গুলিতে। ভেদু পরামানিকের ভাষ্যে কমিউনিস্ট এই নেতা ও কর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়।

> মানুষের খিদা তাঁই বুঝিছে লিজের গতর দিয়া, বুঝল্যা? [৬৪]

মোবারক হোসেনের এই রাজনৈতিক চেতনা, সাম্যবাদ ও শোষণহীন সংগ্রামের বীজ রয়ে গেছে এই সব গ্রামে। তিনি কৃষক, জেলে, কলুদের মাঝে গড়ে তুলেছেন রাজনৈতিক সংগঠন। তাই তার চেতনা প্রবাহিত হয়ে চলেছে বংশপরম্পরায়।

দোজখের ওম****

দোজখের ওম আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। 'কীটনাশকের কীর্তি', 'যুগলবন্দী', 'অপঘাত' ও 'দোজখের ওম' এই চারটি গল্প নিয়ে এ গ্রন্থ। গল্পগুলোতে বিষয় চিত্রণের ক্ষেত্রে সমাজের প্রবল ভাংচুর, সমাজব্যবস্থায় নতুন নতুন শক্তি ও উপাদানের সংযোগ গুরুত্ব পেয়েছে। একই সঙ্গে তৎকালীন সমাজগতির ফলাফল হিসেবে মানুষের গভীর ভেতরের রদবদলের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কাজে

---

[৬৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

[৬৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

**** *দোজখের ওম* আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ। ১৯৮৯ সালে প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন প্রয়াত ছাত্র ও বন্ধু হেলাল উদ্দিনকে। 'কীটনাশকের কীর্তি', 'যুগলবন্দি', 'অপঘাত' ও 'দোজখের ওম' মোট চারটি গল্প স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে।

মনোযোগের দিকটিও লেখকের নজর এড়ায়নি। ব্যক্তির সংকট তো আর সহজেই স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে না। কারণ, সেই সংকট এক রৈখিক না থেকে হয়ে পড়ে বহুমাত্রিক, জড়িয়ে থাকে নানামাত্রিক রাষ্ট্রীয় সামাজিক উপাদান ও অনুষঙ্গের সঙ্গে।

কীটনাশকের কীর্তি

ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর*-এ 'উৎসব' গল্পের নায়ক আনোয়ারের সংকটকে পাঠক সহজেই বুঝতে পারে। নিম্নমধ্যবিত্ত আনোয়ারের আকাঙ্ক্ষা উচ্চবিত্তের, অতঃপর ব্যর্থ হয়ে মানবিক অবনমন। কিন্তু কীটনাশকের কীর্তি গল্পের রমিজের সমস্যা অতো সহজে বোঝা যায় না, চিহ্নিত করা যায় না। উঠতি পুঁজিপতিদের কৌশল ও তৎপরতায় নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী ছোট থেকে আরো ছোট হয়। তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশও লক্ষণীয় হয় না, আগের অনেক অভ্যাসও লুপ্ত হয়, অথচ নতুন সংস্কৃতির স্পন্দনও সে অনুভব করতে পারে না, ক্রমশ হয়ে পড়ে বেপরোয়া, অস্থির,অসহিষ্ণু। নিজের গ্লানিবোধকে ঢাকতেই সে এসব আচরণ করে। 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পের রমিজও এমন চরিত্র। হাত-পা বাঁধা গ্লানিকর জীবনে সে হয়ে ওঠে বেপরোয়া, অসহিষ্ণু, অস্থির।

রমিজের পূর্বপুরুষেরা গ্রামের মাতব্বর ও জোতদার মিরধাবাড়িতে গায়ে খেটে অন্নের সংস্থান করে জীবন পার করছে। বংশীয় সেই বৃত্তি ছেড়ে রমিজ এসেছে ঢাকা শহরে। উঠতি শিল্পপতি সাহেবের বাড়ির শত শত ঝি চাকর ড্রাইভারের মধ্যে সে একজন। সাহেবের অবস্থা বর্ণনা করেছেন লেখক এভাবে –

> ১টা কাপড়ের মিল, ১টা কাঁচের কারখানা, শোনা যাচ্ছে ইলেকট্রিক বাল্‌ব তৈরি করে ফরেনে পাঠাবে – টাকা পয়সা বলো, গাড়ি বলো, বাড়ি বলো, চাকরবাকর বলো, কুকুর বিড়াল বলো – কোনো লেখা জোকা নাই।[৬৫]

এই শিল্পপতির স্ত্রী, সন্তান ও বন্ধুবান্ধবকে দেখে ও তাদের গল্প শুনে তা ভালোভাবে 'ঠাওর' করা রমিজের পক্ষে শক্ত। সাহেবের মেয়ের 'কাঁদো কাঁদো গলায় নাচের মেডেল পাওয়ার খবর' ও মহাউল্লাসে প্রায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার বিবরণ দেওয়ার বিষয়টি রমিজের পক্ষে বোঝা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। রমিজ দেখে রেফ্রিজারেটর খুলে বোতল বার করে ঢক

[৬৫]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৩৫

ঢক করে পানি খাওয়া, সাহেবের ধমক সত্ত্বেও কোকাকোলার বোতল খুলে ২/৩ ঢোঁক কোকাকোলা গিলে ফেলা, লিচু খাওয়া, এসবই তার জীবনাভিজ্ঞতার বাইরে। তার অভিজ্ঞতা রয়েছে আগের রাতে মিরধাবাড়ির মেজো বৌয়ের না খাওয়া ভাতে লবণ মরিচ পেঁয়াজ লেবু মেখে মা, বোন অসিমুন্নেসার সঙ্গে বসে খাওয়া। মিরধাবাড়ির তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে লবণ মুখে অসিমুন্নেসার কাঁচা তেঁতুল খাওয়ার চুকচুক আর চটাৎ চটাৎ ধ্বনি এখনো রমিজের কানে বাজে। বাবার পাঠানো চিঠিতে রমিজ জানতে পারে কীটনাশক খেয়ে অসিমুন্নেসা মারা গেছে। আর এই মৃত্যুর জন্য মিরাধাবাড়ির 'ম্যাট্রিক পাস', অসিমুন্নেসার স্বামী হাফিজুদ্দিনের দায়ভার রয়েছে, রমিজের তা জানা। কিসমত মৃধার শোষক চরিত্রের পরিচিত একটা পাঠ রয়েছে রমিজের এবং সে তা মেনেও নেয়।

> ক'বছর আগে দারুন খরা গেলো, রমিজের বাপ ঐ জমি বেচে দিলো মৃধাদের কাছে। তা মৃধারা দাম যাই দিক, আর রমিজের দাদী ঐ জমি আর কাঁঠালগাছ নিয়ে যতোই প্যানপ্যান করুক, ঐ সময় ঐ টাকাটা না পেলে বাড়িশুদ্ধ সবাইকে না খেয়ে মরতে হতো।[৬৬]

কিন্তু শহরের সাহেবদের কাণ্ডকারখানা রয়ে যায় তার চেনার বাইরে। চাকর ড্রাইভারদের মুখে শোনা সোনারগাঁও, শেরাটন, পূর্বাণী, গুলিস্তান, শিশুপার্ক, নিউমার্কেট, স্টেডিয়াম, হাইকোর্টের মাজার দেখা হয় না রমিজের। সে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

বোন অসিমুন্নেসার মৃত্যুর সময় থানা দারোগা পুলিশের পেছনে ২৪৭ টাকা খরচ হয়ে গেছে। বাড়ি যাওয়ার খরচসহ ওই টাকাটা তার দরকার। সাহেবকে বোনের মৃত্যুর খবর জানিয়ে টাকা চেয়ে বাড়ি যেতে চায় রমিজ। কিন্তু তার এ উদ্যোগ একবারও সফল হয় না। বারবার সে এই উদ্যোগের ছক আঁকে মনে মনে। প্রথমে সাহেবের কুকুর, তারপর আছরের আযান, তারপর সাহেবের ঘুমিয়ে পড়া, সাহেবের মেয়ের ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসা, বিবি সাহেবের বাসায় ফেরা এসব ঘটনার মধ্যে দিয়েই রমিজের উদ্যোগ পর্ব ভেস্তে যায়। তার আর টাকাসহ বাড়িতে রওনা করা হয় না। ক্ষোভে ও দুঃখে সে হয়ে পড়ে বেপরোয়া। সে কীটনাশক পুরে দেওয়ার চেষ্টা করে সাহেবের মেয়ে শাম্মীর মুখে। রমিজের এই উদ্যোগ বোনের মৃত্যুর বিপরীতে এক উদ্দেশ্যহীন প্রতিশোধ।

---

[৬৬]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিশোধের পাত্র এখানে বহুদূর, বিপরীত ও পৃথক। কিন্তু রমিজের প্রতিশোধ স্পৃহার রাষ্ট্রীয় সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যই রমিজের মনোজগতের প্রতিফলন। মিরধাদের ছেলের ভোগ লালসার শিকার হয় তার বোন অসিমুন্নেসা। আর সেই যৌন অনাচারের ফসল পেটে বয়ে বেড়াচ্ছে বলে স্বামী হাফিজদ্দিও তাকে ত্যাগ করে। কীটনাশক খেয়ে মৃত্যুবরণই তার নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। দেশের প্রচলিত আইনকানুন, থানা আদালতে ছাড় পেয়ে যায় 'ম্যাট্রিক পাস'। অন্যদিকে সাহেবের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মৃত বোনের কাছে রমিজের যাওয়াও নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন প্রতিশোধে বাহ্যজ্ঞানশূন্য বেপরোয়া, উদ্ধত, অস্থির হয়ে ওঠে রমিজ। সামাজিক এই বিভেদ ও অনাচারের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে রমিজের প্রতিশোধস্পৃহার সূত্র।

যুগলবন্দি

মানুষ ও কুকুরের 'একস্তরে' নেমে যাওয়ার ঘটনা আমরা দেখেছি ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থের 'উৎসব' গল্পে। পুরনো ঢাকার ঘিঞ্জি বসতির রাস্তার মোড়ে কুকুররতি দেখে শীতল আনোয়ার নিজের যৌন উত্তেজনা ফিরে পায় এবং স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমসুখ উপভোগ করে। বড়লোক বন্ধু কাইয়ুমের বাড়িতে দেখা শিক্ষিত সুন্দরী উচ্চবিত্তের মেয়েদের কল্পনা করে সে সঙ্গমসুখ পেতে চায়। আর তা বাস্তবে না পেয়ে শীতল হয়ে পড়ে তার যৌন উত্তেজনা, হাতে পুরু রাবারের গ্লাভস এসে ভর করে।

'যুগলবন্দি' গল্পে কুকুর ও মানুষের 'সমান্তরাল' অবস্থান নিম্ন-মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তে ওঠার জন্য। কাস্টমস কর্মকর্তা সরোয়ার বি কবির সরকারি অর্থ লোপাট করে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছে। তার পোষা কুকুর অরগস । কবির সাহেবের মন পেতে; তারে আশ্রয় করে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে দুঃসম্পর্কের আত্মীয় ও আশ্রিত আসগর হোসেন নেমে যায় কুকুরের সমান্তরালে। উভয়ের এই যুগলবন্দি অবস্থান সমাজ-সত্য। সরোয়ার বি কবিরদের জৌলুশপূর্ণ জীবনযাপন, সম্ভ্রান্ত, মহামার্জিত ও ক্ষমতাবান লোকদের অবস্থা কেরানিপুত্র আসগর হোসেনদের মনে আশার সঞ্চার করে। তারাও স্বপ্ন দেখে সরোয়ার কবিরের কাছাকাছি উচ্চতায় পৌঁছাতে। আর এ অভিযানে আসগরদের ভরসা সরোয়ার কবিররাই। এতে দুপক্ষেরই লাভ। সরোয়ার কবিরের সম্পদ বাড়ছে, কিন্তু ঝুঁকি পোহাচ্ছে আসগর হোসেন। সে সরোয়ার কবিরকে প্রভুভক্তি দেখিয়ে ম্যাকডোনাল্ড এন্ড রবিনসন কোম্পানিতে চাকরি জুটিয়ে নেওয়ার ধান্ধায় থাকে। এ কোম্পানিতে চাকরি মানেই কুলশিতে অভিজাত বাড়ি পাওয়া যাবে। সে কারণে সরোয়ার কবিরের প্রতি আসগরের সনিষ্ঠ প্রভুভক্তি অব্যাহত থাকে। রাত একটার সময় আনন্দচিত্তে বেরিয়ে পড়ে সাহেবের বৌয়ের জন্য কমলা কিনতে। আসগরের কাছে এসব তো কোনো কাজই না, বরং আরো দায়িত্বপূর্ণ

'রিস্কি' কাজ সে করে চলে প্রতিনিয়ত সরোয়ার কবিরের জন্য। বড় বড় প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া কমিশনের টাকা সামলানো, পোর্ট থেকে কোনো কোনো জিনিস আনা...এসবে খাটনি কি কম। খাটতে আসগরের আপত্তি নাই; ঝুঁকি নিয়েও ভালো চাকরি ও অভিজাত বাড়ির আশায় সবকিছু করতে রাজি।

সরোয়ার কবিরের কাতারে দাঁড় করিয়ে আসগর নিজের মা-বাবাকে অবজ্ঞা করে। রীতিমতো ছুড়ে ফেলতে পারলেই যেন স্বস্তি পায়। তা না করলেও আচরণে ও কাজে তার শাসানি অব্যাহত থাকে। এতে তার গ্রামের মা-বাবার জন্য তার করুণার সীমা নেই। তার নিজের বাস্তব-উত্তরাধিকার তাকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে।

> ভাত খা। এখন লেবু খেলে ভাত খেতে পারবি না।' মার এইসব বাঙাল মার্কা কথাবার্তা সে আর কতো সহ্য করবে? এদের ধারণা গাদাগাদা ভাত না গিললে খিদে মেটে না। সরোয়ার কবিরের বৌ কেমন দিনের পর দিন ভাত না খেয়ে কাটায়, তাতে কি তার শরীর ভেঙে পড়েছে, না আরো সুন্দর হয়ে উঠছে? ... খাওয়া কন্ট্রোল করা তো আছেই, যখন তখন ঘুম পেলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলে চলবে না, ঘুম পেলেও নয়, সেকস ফিল করলেও নয়। ক্ষুধা, নিদ্রা, কাম সব রকম স্পৃহা জয় করার জন্য ওদের ঐ সাধনা এই রিটায়ার্ড পোস্টমাস্টার আর তার বৌ কি কল্পনাও করতে পারে? না এরা সব সংশোধনের অতীত।[৬৭]

সংশোধনের অতীত উত্তরাধিকার ফেলে আসগর প্রবল বিক্রমে এগিয়ে চলে সরোয়ার কবিরের কাছাকাছি সোসাইটির দিকে। সরোয়ার কবিরের প্রত্যেকটা কথাই সে মনোযোগ দিয়ে শোনে ও বুঝতে চায়। করতে চায় সরোয়ার কবিরকে খুশি করার কাজটিও।

বন্ধুর সঙ্গে আলাপে, কবির সাহেবের আলাপে উঠে আসে 'বাউয়েলস ক্লিয়ারে'ই জীবের শরীরের ভারসাম্য রক্ষা ও আরাম হয়। একই সঙ্গে উঠে আসে নিজের বাউয়েলস ক্লিয়ারের প্রচেষ্টা ও সফলতার বিবরণ। জানা যায় তার সকালবেলার 'জগিং ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ' ও 'শর্ট ইন্টারকোর্সে'র পরপর তিনটি সিগারেট শেষ করার কথা। তার প্রিয় এ্যালসেশিয়ানকেও 'ডাল' হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য বাউয়েল ক্লিয়ার করার ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয় আসগরকে। 'কুকুরের যত্ন নিলে মানুষ ছোটো হয়ে যায় না' বলেও মন্তব্য করেন সরোয়ার কবির। তখন কুকুরের যত্নের নামে ও কবির সাহেবকে খুশি করে কাজ বাগাতে আসগর কুকুরের সঙ্গে চাকরের মতো আচরণ করে। আরগসের দায়িত্ব সে জোর

---

[৬৭]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৫৮-২৫৯

করে দারোয়ান আবদুলের হাত থেকে নিজের হাতে নেয়। তাকে নতুন খেলা শেখানোর কথা বলে এক্সারসাইজ ও জগিং করায়। আবদুলের নির্দেশিত স্থানে কুকুরকে বাউয়েলস ক্লিয়ার করতে সাহায্য করে। কুকুরের শিকল ধরে কবির সাহেবের মতো পরপর তিনটি সিগারেট টানে। আর অনুভব করে এ্যালসেশিয়ানটি খুব তৃপ্তি ও আরামের সঙ্গে বাউয়েলস ক্লিয়ার করছে। সে সুখ ছড়িয়ে পড়ে আসগরের শরীরেও।

> '...২য় সিগ্রেটটি ধরিয়ে গোটা তিনেক লম্বা টান দেওয়ার পর আসগরের হাতের শিকল শান্ত ও শিথিল হয়ে আসে। আসগর সিগ্রেটে বেশ কয়েকটা সুখটান দেয় আর অনুভব করে যে আরগস খুব আরাম ও তৃপ্তির সঙ্গে বাউয়েলস ক্লিয়ার করছে। শিকলের ধাতব বিনুনি বেয়ে সেই তৃপ্তি আসগরের শরীরে চমৎকার মৌতাত ছড়িয়ে দিচ্ছে।'[৬৮]

আসগরের এই যত্ন প্রাণীটির প্রতি ভালোবাসা থেকে নয়; বরং কুকুরের সঙ্গে আত্মিক ও দৈহিকভাবে মিলে যায় আসগর – প্রভু সরোয়ার কবিরকে খুশি করার জন্য। 'ক্লাস' পরিবর্তনের জন্য এই অমানবিক প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা বাংলাদেশের সামাজিক ব্যাধিকেই চিহ্নিত করেছে। চট্টগ্রাম পোর্টের ডাকসাইটে কাস্টমস অফিসারের অর্থলোলুপ, অসৎ কার্যকলাপের সহযোগী হয়ে অঢেল সম্পদের মালিক হওয়ার স্বপ্ন আসগরের। সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে দিব্যি ব্যবসা, আমদানি রপ্তানি চালিয়ে যাচ্ছে সরোয়ার কবিরের সহায়তায়। বিনিময়ে কমিশন পাচ্ছেন তিনি। এসব কাজ একার পক্ষে সম্ভব নয়, প্রয়োজন সহযোগীর। আসগর সে রকমই তার একজন সহযোগী। আরো অনেক সহযোগী রয়েছে তার এ রকম। এসব সহযোগী কোনোদিনই সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদায় সরোয়ার কবিরের উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু প্রচেষ্টা তাদের একনিষ্ঠ। সে প্রচেষ্টায় কুকুরের সঙ্গে শারীরিক ও মানসিকভাবে যুগলবন্দি হতেও কোনো দ্বিধা নেই আসগরদের।

অপঘাত

'অপঘাত' ইলিয়াসের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে লেখা মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের গল্প। গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ চেষ্টা এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের হত্যাকাণ্ড, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও নারী নিগ্রহের অমানবিক ঘটনা স্থান পেয়েছে। সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও শেরপুরের গ্রাম ও মফস্বল শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ তৎপরতা এবং তা গ্রামের একেবারে নিরীহ কৃষক ও মজুরদের মনেও সঞ্চারিত করেছেন লেখক। এ গল্পের প্রধান চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা বুলু। সে শহীদ হয়েছে বৌডোবা ব্রিজে মিলিটারির জিপে গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পর একজন পাকিস্তানি সেনার গুলিতে। এই মুক্তিযোদ্ধার তৎপরতা, তার সাহস ও শক্তি, প্রতিরোধ আকাঙ্ক্ষাই বারবার উচ্চারিত হয়েছে গল্পে। এর বিপরীতে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী পাকিস্তান সেবকদের দুর্দশার চিত্রও ফুটে উঠেছে গল্পে।

---

[৬৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৬৬-২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পাকিস্তানি সেনাদের খুশি রাখতে সদা সচেষ্ট থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ে পাকিস্তানি সেনারা ক্যাম্প করেছে। কেরানি মোবারককে নিয়ে টুকিটাকি দাপ্তরিক কাজ সে বাড়িতেই করে। এই চেয়ারম্যানের সর্বক্ষণের ভাবনা পাকিস্তানির সেনাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। তার ভাষায় মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে গোলমাল। মুক্তিযোদ্ধাদের এসব গোলমাল থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয় সে। মুক্তিযোদ্ধা বুলুর ব্যাপারে তার বাবা মোবারক আলীর কাছে নালিশ করে সে। নিজের মেধাবী ছেলে শাহাজানকে রাখতে চায় এসব থেকে একেবারেই দূরে, নিরাপদে। আর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে তার মনে কোনো আশাবাদও ছিল না। পাকিস্তানি সেনাদের শক্তি, সাহস ও শোষণের প্রতি ছিল তার অকুণ্ঠ প্রভুভক্তি :

> চেয়ারম্যান একদিন এসে অভিযোগ করে, 'মোবারক মিয়া, বুলু এই গোলমালের মধ্যে যাচ্ছে, আপনে শাসন করিচ্ছেন না? আবার শাজাহানকে খালি খালি চেতাচ্ছে, শাজাহান স্কলার ছাত্র, অর কি ইগলান করা মানায়, কন?' তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'কী পাগলামি শুরু করিছে কন তো! চ্যাংড়াপ্যাংড়ার মাথার মধ্যে পোকা ঢুকিছে! গাদাবন্দুক আর দাও কুড়াল খন্তা লিয়া মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করবি, এ্যাঁ? [৬৯]

গদা বন্দুক, দা, কুড়াল, খন্তা, গ্রেনেড এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতা ও স্বপ্নে ভর করে একদিন স্বাধীনতা ঠিকই আসে। বুলুদের নাম লেখা হয় ইতিহাসের সোনালি পাতায়। পক্ষান্তরে সামরিক জান্তাদের পদসেবা করেও তাদের জুলুম থেকে রক্ষা পায় না এসব রাজাকার, দেশদ্রোহী। ইসলামের নামে দেশ শাসন করলেও ধর্ম, নৈতিকতা, মানবিকতা কোনো কিছুর প্রতিই দায়বদ্ধ ছিল না পাকিস্তানি শাসকেরা। তার অজস্র উদাহরণ রয়েছে গল্পে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনো যুদ্ধনীতিই তারা মেনে চলেনি। তাই উপকারী, সাহায্যকারী চেয়ারম্যানের ছেলে শাজাহান জ্বরে মারা গেলে তার লাশ কবরে নিতে দেয় না ক্যাম্পের সামনের রাস্তা দিয়ে। ক্যাম্পের সামনে দিয়ে শবযাত্রীদের যাওয়া যাবে না, এটা কোনো যুদ্ধ-নিয়ম, মানবিক কিংবা ধর্মীয় কারণ হতে পারে না। জবরদস্তির নিয়মে তারা জুলুম করে বাঙালিদের ওপর, কিন্তু মনে তাদের জুজুর ভয়। কখন হয়তো প্রতিশোধ নেবে বাঙালি। আরজ আলী সাকিদারের জবানিতে ইলিয়াস চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বিষয়টি :

> কিসের ক্যাম্প খাড়া করছে, তার সামনে দিয়া যাবার দিবি না। – ক্যান? – মুর্দা কি কাফনের মধ্যে বন্দুক লিয়া যাচ্ছে? মুর্দার হাতে হাতিয়ার আছে? [৭০]

---

[৬৯]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৭৬-২৭৭

[৭০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

ইসলাম ধর্মবিরোধী কাজকর্ম নির্দ্বিধায় করতে থাকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। তারা চেয়ারম্যানের ছেলের লাশ পুঁতে ফেলতে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেয়। এমনকি পোড়ানোর জন্য সেনাবাহিনী দেশলাই সরবরাহ করতে প্রস্তুত আছে বলেও জানায়। এই অমানবিক বোধে উজ্জীবিত হয়েই তারা 'যে গ্রামে একবার হাত দেয় তার আর কোন চিহ্ন রাখে না।' 'সিংড়া ক্যাম্প থেকে মিলিটারি এসে গোটা গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়'। সরকার বাড়ির বর্গাদার বিলের ধারে পায়খানা করতে বসলে হাইস্কুল ক্যাম্প থেকে গুলি করে হত্যা করা হয় তাকে। হাট ফেরত নিরীহ নজীবুল্লাকে মারা হয় গুলি করে :

> আমিনুদ্দিন সরকারের ভাইপো তবারক, লাঠিডাঙার আয়নুল, পদুমশহরের হাশেম মন্ডল, হাইস্কুলের অংক স্যার নূর মোহাম্মদ এদের মারা হয় লাইনে দাঁড় করিয়ে। ... বিলের ধারে লাশ, বাঁশঝাড়ে লাশ, স্কুলের পেছনে লাশ।[৭১] (পৃষ্ঠা ২৭৪)

গল্পে সামরিক জান্তাদের জুলুমের বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ ও প্রতিরোধের বিষয়গুলোকেও উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ইলিয়াস:

> হাটে শুনে (মোবারক আলি) এসেছে যে সেরপুর শহরে মিলিটারি ঢুকে বাড়িঘর তছনছ করে ফেলেছে। তারপর বগুড়া নাকি মিলিটারির বিরাট আড্ডা। মানুষের লাশের গন্ধে নাকি টাউনে ঢোকা যায় না। আবার এরই মধ্যে কোন এক বড়ো মিলিটারি অফিসারকে মেরে ফেলেছে কারা। বর্ডারে জোর যুদ্ধ চলছে।[৭২]

ইলিয়াস বাঙালির এই অপরাজেয় চেতনাকে এ গল্পের ভীত, নিরীহ, জীবিত মানুষ থেকে অসুস্থ শাজাহানের মধ্যেও সঞ্চারিত করেছেন। মোবারকের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ছেলে বুলুর সঙ্গে মিশে যুদ্ধে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে মারা যায় চেয়ারম্যানের ছেলে শাজাহান:

> খালি বুলু, খালি বুলু! তামাম রাত খালি বুলুকই ডাকে, খালি বুলুকই ডাকে। বুলুর সাথে চল্যা যামু, --বুলুক কও আমাক না লিয়া যেন যায় না।[৭৩]

গল্পের শুরুতে মোবারক হোসেনকে মুক্তিযোদ্ধা পুত্র বুলুর মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখতে বিশেষ তৎপর দেখা যায়। অথচ সেই মোবারকই গল্পের শেষে পৌঁছে যায় এক ভয়শূন্যহীন অনিকেত মানবিকতার ও সাহসিকতার দ্বারে। সবার কাছে বলতে থাকে মুক্তিযোদ্ধা বুলুর

---

[৭১]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৭৪
[৭২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
[৭৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

পাকিস্তানি সেনাদের হত্যার কাহিনি। সেই গল্পে বুলুর পাশাপাশি স্থান পায় অন্য মুক্তিযোদ্ধার অভিযানের কাহিনি :

> ছেলেরা বোমা ছুড়েছিল স্কুলের উত্তরের বাঁশঝাড় থেকে। মিলিটারি যতগুলো গিয়েছিলো প্রাণ নিয়ে কেউ ফিরেনি। ছেলেদের মধ্যে মারা গেছে একজন, হ্যাঁ প্রথম বোমাটি সেই ছুঁড়েছিল।[৭৪]

সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে এক স্বপ্নময় আখ্যান বর্ণনা করে চলে মোবারক। আর সেটাই এ গল্পে তৈরি করেছে অনন্য এক শিল্পভাষ্য।

দোজখের ওম

'দোজখের ওম' গল্পগ্রন্থের শেষ ও নাম গল্প 'দোজখের ওম'। বলা যায়, বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অমর গল্পগুলোর মধ্যে এর স্থান উজ্জ্বল। নতুন এক টেকনিকের আশ্রয় নিয়েছেন লেখক এ গল্পে; যা পরবর্তীকালে আরো ব্যাপকতা নিয়ে হাজির হয়েছে তাঁর *খোয়াবনামা* উপন্যাসে। গল্পের প্রধান চরিত্র কামাল উদ্দিনের আধখানা সচল ও আধখানা অচল শরীরে চোখ ভরে স্বপ্ন নামে। স্বপ্নকে সে মনে করে বাস্তব জীবনের ঘটনা। দুই বছর আগে মারা গেছে তার বৌ। কিন্তু সে রোজই স্বপ্নে হাজির হয় কামালউদ্দিনের ঘরে। কামালউদ্দিনের জিনিসপত্র গুছিয়ে দেয় :

> আকবরের মা যখনি আসে তার ছায়া-ছায়া হাত দিয়ে, ওষুধপত্র, পানির জগ, গ্লাস, ইসবগুলোর ভুষিভেজানো বাটি, তসবি, টুপি এবং 'মকসুদুল মোমেনিন' বইটা গুছিয়ে রাখে, গোছানো থাকলেও ফের গোছায়। তায়াম্মুম করার মাটির ঢেলাটি রেখে দেবে কালামউদ্দিনের বালিশের পাশে[৭৫]

মৃত স্ত্রী রক্তমাংসের মানুষ হিসেবেই প্রতিদিন হাজির হতে থাকে কামালউদ্দিনের ঘরে। জীবিত অবস্থার মতোই রাগ তার এখনও কমে নাই। সে শুধু কামাল উদ্দিনকে ডাক দিয়ে যায় পরলোকের যাত্রায়। কামালউদ্দিন তার ডাকেই সাতগম্বুজ মসজিদের নকশা ও ছায়া দেখতে দেখতে ভাসতে চায় পাল তোলা রঙিন নৌকায়। ওঠার আগেই নৌকা চলতে শুরু করলে কামালউদ্দিন পড়ে যায় ডাঙায়। বর্তমান ও বিগত জীবনের নানা ঘটনা স্বপ্ন হয়ে ভাসতে থাকে তার চোখের তারায়। দুনিয়াতেই দোজখের আজাব ভোগ করতে থাকা কামালউদ্দিনের জীবনে আনন্দের পরশ বয়ে আনে স্বপ্ন। আর এসব স্বপ্ন-বাস্তবে ক্রমাগত মিশতে থাকে পুরান ঢাকার মানুষের সমাজচেতনা, ধর্মবিশ্বাস, ঐতিহ্য, বাংলাদেশের

---

[৭৪]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৯২

[৭৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

মুক্তিযুদ্ধ, দাঙ্গা, যুদ্ধপরবর্তী সমাজ। একই সঙ্গে তাতে যুক্ত হয় কামালউদ্দিনের পরিবারের নানা আনন্দ-বেদনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

নিজের ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী-নাতি-নাতনির মৃত্যু দেখেছে কামালউদ্দিন। সে নিজের দীর্ঘ আয়ুকে অপরাধ ও ধৃষ্টতা হিসেবে মনে করেছে সমস্ত গল্পে। প্রিয়জনের মৃত্যুতে, বিচ্ছেদ বেদনায় নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা সাময়িক। গল্পশেষে মানুষের ভেতরকার সেই আদি অকৃত্রিম জীবনতৃষ্ণাই ব্যক্ত হয়েছে তার অন্তর থেকে। এত বছর বয়সে কামালউদ্দিনের বেঁচে থাকা নিয়ে হানিফের মা ভাবি বিস্ময় প্রকাশ করলে সে বলে 'বাঁচুম না' ক্যালা। নিজের অস্তিত্ব প্রকাশে আধখানা শরীর নিয়ে সে হয়ে ওঠে অপরাজেয়। লাঠি ও নাতনির শরীরে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে চলতে থাকে নিজের ঘরের দিকে। বাড়ির সম্পত্তিতে নিজের মালিকানা ঘোষণা করে বেশ জোরেশোরে:

> ঠোঁট, জিভ ও গলার সচল অচল ও নিমচল টুকরাগুলো জোড়াতালি দিয়ে কামালউদ্দিন একটি লালা-বলকানো হুঙ্কার ছাড়ে, 'তর চাচারে কইস, দাদায় অহন তরি বাঁইচা আছে।[৭৬]

বার্ধক্যপীড়িত, হতাশা ও যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত, অর্ধেক অচল ও অর্ধেক সচল শরীরের কামালউদ্দিন ও তার পরিবারের এক দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে গল্পে। প্রায় পৌনে এক শ বছরে ঘটে যাওয়া তিন পুরুষের জীবন-সার বর্ণনায় মূল টেকনিক হিসেবে লেখক স্বপ্ন ও স্মৃতিকে অনুষঙ্গ করেছেন। কামালউদ্দিনের পরিবারের ঘটনা বর্ণনার সময় ইতিহাসের ঘটনাক্রমকে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। পুরান ঢাকার প্রথা, জীর্ণ-সংস্কার ও দারিদ্র্যের কষাঘাতের ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল হয়েছে মানুষের প্রাণময় সজীব অস্তিত্ব। হাসমত ওস্তাগরের ছেলের সঙ্গে মুনীর হোসেন লেন, শাহ সাহেব লেন, শরৎগুপ্ত রোড ধরে গোল্লাছুট খেলে খেলে বেড়ে ওঠে কামালউদ্দিন। নারিন্দায় বিবির মসজিদের মক্তবে মকবুল মুন্সির কাছে আমপারা সেপারা পড়তো যে সহপাঠীর সঙ্গে, সেই একদিন ইসমাইল সাহেবের বাড়ির ছাদে ওঠার সময় তার লুঙ্গি খুলে ফেলে প্রবল জড়াজড়ি করে যৌন অভিজ্ঞতার প্রথম পরশ বুলিয়ে দেয় কামালউদ্দিনের জীবনে। যার স্মৃতি প্রায় অচল শরীরেও স্পষ্ট।

---

[৭৬]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

পীর সাহেবের নানা রকম কেরামতির গল্প, খরায় বৃষ্টি নামানো ও স্বেচ্ছায় মৃত্যুর দৃশ্যও ভাসতে থাকে কামালউদ্দিনের চোখ জুড়ে। ছোটবেলায় বাবার কাছ থেকে এসবের বর্ণনা বহুবার শুনেছে। অতিলৌকিক বিশ্বাসে মানুষের মনে জায়গা করে নেওয়ার ধূর্ততা এবং আর্থিক লাভের আশায় অবৈধ অর্থ উপার্জনকারীদের সঙ্গে পীরের সম্পর্ক পুরান ঢাকার সমাজবাস্তবতা। নোংরা জীবন থেকে মুক্তি ও সচ্ছল জীবনে স্থায়ী হওয়ার জন্য পীর সাহেবের দোয়া দরকার হয় কিছু মানুষের জীবনে। ধর্মের নামে ধোঁকা দেওয়া ও সম্পদ অর্জনের অবৈধ চেষ্টা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে। সমাজগতির এই গোঁজামিল তুলে ধরেছেন লেখক এ গল্পে।

কামালউদ্দিনের কর্মজীবন শুরু হয় ইসলামপুরের ছাতা ও খেলার সরঞ্জামের দোকানের বারান্দায়। সেখানে তিনি সেলাই মেশিনে লুঙ্গি, বালিশের অড় ও মশারি সেলাই করেন। কর্মজীবনে তার আর কোনো উন্নতি হয়নি। জীবন পার হয়েছে একইভাবে টুকরো কাপড় সেলাই করে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধ– সবকিছুরই স্পর্শ লেগেছে তার জীবনে। জীবন বাঁচাতে জগদীশ বাবুর কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিতে হয়। বাবুদের বাসার বাজার করে দেওয়ার সময় মাছ, সবজি, তেল, নুন চুরি করে সংসার চালাতে বাধ্য কামালউদ্দিন। এই অনিচ্ছাকৃত চুরির জন্য সে ক্ষমা চায় বারবার। কিন্তু কামালউদ্দিনের মেজো ছেলে আমজাদ নিজের অক্লান্ত চেষ্টা-তদবিরে ঘুরিয়ে নেয় জীবনের গতি। ফ্যান, বাল্ব, সুইচ সরবরাহের ব্যবসা করে এবং পীর হুজুরের মুরিদানা ও তাদের নেকনজরে থেকে অর্থ সম্পদে সে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। বড় ভাই আকবর মারা গেলে তার মিলাদে আমজাদের আয়োজনের জমকালো পরিবেশই তার অবস্থান বলে দেয়। মুখে হুজুরপাক ও ধর্মের কথা বললেও আমজাদ মূলত লুণ্ঠনকারী। অনেক আগে থেকেই তার এ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পর দিল্লিওয়ালা জুতার দোকাদারের বাড়ি লুট হলে আমজাদ সেখান থেকে দুটো ফ্যান নিয়ে এসেছিল। এখন সে কামালউদ্দিনের বাড়ি থেকে বড় ভাই আকবরের প্রাপ্য উত্তরাধিকার মুছে ফেলতে চায়। নিজ দখলে নিয়ে সেখানে গড়ে তুলতে চায় বড়ো ভবন।

> হুজুরপাকের দোয়ার বরকতে দেইখেন এই বাড়ি ভাইঙ্গা আমি কেমুন বিল্ডিং বানাই।[৭৭]

[৭৭]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

নিজের শ্রেণি পরিবর্তনে মরিয়া আমজাদ তার ভাইকে ঠকাতেও দ্বিধাবোধ করে না। আমজাদের স্বার্থপরতার সাথে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চরিত্রেরও পরিচয় পাওয়া যায় গল্পে। কামালউদ্দিনের ছোট ছেলে সোবহান পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে। তারই বন্ধুরা টিকাটুলির ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিয়ে এসে কামালউদ্দিনের ঘরে আশ্রয় চাইলে আমজাদ তাদের কারফ্যুর ভেতরও বের করে দেয়।

সামরিক শাসনের ডান্ডাবেড়ি টিকিয়ে রাখতে ধর্মীয় উন্মাদনায় জনগণকে শামিল করে এরশাদ সরকার। হুজুরপিরের আস্তানায় যাতায়াত বেড়ে যায় সরকারের লোকজন ও রাষ্ট্রপতির। তার অনুসারী ক্ষমতা ও অর্থবিত্তের প্রত্যাশী ব্যক্তিরাও হাঁটে একই পথে। তারা ক্রমশ পৌঁছতে থাকে নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তে। সে প্রতিযোগিতায় অস্বীকার করা হয় ন্যায় ও আইনকে, রক্তের সম্পর্ককে, মানবিকতাকে। সামাজিক এই বাস্তবতাকে লেখক তুলে ধরেছেন 'দোজখের ওম' গল্পে। কামালউদ্দিনের বড় ছেলে আকবরের মৃত্যুর পর তার বৌ ও ছেলেমেয়েকে বাবার বাড়ি থেকে মেজো ছেলে আমজাদ তাড়িয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। আকবর ও আমজাদ আইনত সমান মালিক কামালউদ্দিনের বাড়ির। কিন্তু আমজাদ আকবরের মেয়েকে জানায়, কামালউদ্দিনের বাড়িতে তাদের কোনো অংশ নেই। হুজুর পাকের দোয়া নিয়েই সে এ কাজে অগ্রসর হয়। ধর্মীয় মুখোশের অন্তরালে সম্পদ লুণ্ঠনের এই সমাজগতিকে এই গল্পে লেখক স্পষ্ট করে তুলেছেন। এর বিপরীতে মানুষের শুভ চেতনার বোধও উদ্ভাসিত হয়েছে গল্পে। বড় ছেলে আকবরের অন্যায় কাণ্ডকীর্তির জন্য কামালউদ্দিন তার নিজের সম্পত্তি থেকে আকবরকে উচ্ছেদের কথা বলেছে অনেকবার। কিন্তু সেটা তার ক্ষোভের কথা, মনের কথা নয়। তার নিজের ক্ষোভের কথা আমজাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলে কামালউদ্দিনের মানবিকতার শুভবোধে আঘাত লাগে। নিজের বিগত জীবনের পাপকার্য, টুকটাক চুরি, হানিফের মা-ভাবির প্রতি কিঞ্চিৎ আকর্ষণ, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় না দেওয়া, বৌ-ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনির মৃত্যুর পরও তার বেঁচে থাকার অপরাধবোধ– সবকিছু মিলে নিজের ঘর যেন দোজখে পরিণত হয়। দোজখের ওমে জ্বলতে জ্বলতে যখন যন্ত্রণাময় সময় পার করছে, তখনও কামালউদ্দিন তার শুভবোধ নিয়ে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। এই গভীর জীবন সত্যই উচ্চারিত হয়েছে গল্প শেষে।

Dhaka University Institutional Repository

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল***

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পঞ্চম ও শেষ গল্পগ্রন্থ। লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে পাঁচটি গল্প। গল্পগুলো যথাক্রমে 'প্রেমের গপ্পো', 'ফোঁড়া', 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল', 'কান্না' ও 'রেইনকোট'। গল্পগুলো মূলত অপ্রাপ্তির বেদনা ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় ভরপুর। গল্পগুলো ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে রচিত। এ সময়কালে ইলিয়াসের তিনটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেসব গ্রন্থে স্থান পায়নি পঞ্চম গ্রন্থের কোনো গল্প। গল্পগুলোর আরো শৈল্পিক পরিচর্যা প্রত্যাশা ছিল লেখকের। সে সময় তিনি পাননি।

'প্রেমের গপ্পো' গল্পটি ফাঁপা মানুষের অতিকথনের ঘটনা নিয়ে। গল্পের মূল চরিত্র জাহাঙ্গীর ওষুধ কোম্পানির ব্যর্থ রিপ্রেজেনটেটিভ। তার জীবনের শূন্যতা পূরণ হয় সদ্য বিয়ে করা স্ত্রী বুলার কাছে মিথ্যে গল্প বলার মাধ্যমে। জীবনে যা সে হতে পারেনি, অথবা মেয়েদের কাছে যে কদর ও আকর্ষণ সে কোনো দিনই পায়নি, তারই রঙিন সব গল্পগাথা বলতে থাকে জাহাঙ্গীর, স্ত্রীর কাছে। অতিকথনে একই গল্পের দুই দিনের ঘটনার বিবরণে পার্থক্য ধরা পড়ে। জাহাঙ্গীরের প্রেমে- পড়া গুলশানের অ্যাথলেট মেয়েটি সম্পর্কে প্রথম দিন গল্প বলার সময় তার নাম বলে শাহনাজ। দ্বিতীয় দিন একই গল্প বলার সময় মেয়েটির নাম বলে শাহিন। এই শাহিন কিংবা শাহনাজের অ্যাথলেট অনুশীলন, নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ লোক হিসেবে হাজির করা, আগা খাঁ টুর্নামেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকা, গাড়ি পাঠিয়ে শাহিন কিংবা শাহনাজের পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে স্টেডিয়াম থেকে নিয়ে আসা, উপভোগ্য প্রেমের প্রস্তাব, যত্ন-আত্তি, মনোযোগ, ভালোবাসার ঘটনাগুলো একেবারেই বানোয়াট। নিজের গুরুত্ব বাড়াতে সে একের পর এক মিথ্যে গল্প বলে চলে স্ত্রী বুলার কাছে। গল্পে আসে তার কলেজের সহপাঠী মেয়ে বন্ধুর কথাও। 'হিপ হিপ হুর রে' হিসেবে পরিচিত এই সহপাঠী পরে ট্রাফিক পুলিশ হয়। মালিবাগ পুলিশ বক্স থেকে সে বাঁশি বাজিয়ে জাহাঙ্গীরকে থামায় এবং চেপে বসে তার হোন্ডার পেছনে :

> –চলো, তোমার সঙ্গে যাবো, যাইতে যাইতে বলবো।– তারপর সে করল কী আমার পেছনে উইঠা আমারে জাপটাইয়া ধরল।[৭৮]

[৭৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৩২

***** *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রকাশিত পঞ্চম ও শেষ গল্পগ্রন্থ। ইলিয়াসের মৃত্যুর (৪ জানুয়ারি, ১৯৯৭) অব্যবহিত পর ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা বই মেলায় অনুষ্টুপ প্রকাশনী থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন বন্ধু দিলীপ পালকে। 'প্রেমের গপ্পো', 'ফোঁড়া', 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল', 'কান্না' ও 'রেইনকোট' মোট পাঁচটি গল্প স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। প্রায় একই সময়ে ঢাকার একুশে গ্রন্থ মেলায় গ্রন্থটি প্রকাশ করে মাওলা ব্রাদার্স। গল্পগুলো ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে লেখা।

Dhaka University Institutional Repository

কলেজ জীবনে পিকনিকে গিয়ে এ মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা প্রথম দিনের গল্পে ছিল না। দ্বিতীয় দিনের গল্পে তা যুক্ত হয়। বাস্তবে কলেজে থাকতে কোনো মেয়ের সঙ্গে তার আলাপই হয়নি।

জাহাঙ্গীরের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে স্ত্রীর বড় ভাই হাফিজ ও তার বন্ধু মুশতাক তাদের বাসায় এলে, শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীতবিষয়ক আলোচনার সময়। সঙ্গীত নিয়ে তাদের আলাপে ঢুকতে পারে না জাহাঙ্গীর। সে তার বন্ধু পরিচয়ের এক পপতারকার গান টেপরেকর্ডারে চালিয়ে দিয়ে মুক্তি পেতে চায় আলোচনা থেকে, বেরিয়ে পড়ে খাবার কিনতে। জাহাঙ্গীরের বন্ধুর যে সঙ্গীতচর্চা তাতে সুর, তাল, লয়ের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় না সাধনার। লক্ষ্য শুধু চটুল জনপ্রিয়তা অর্জন করা। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সাধক ও সরোদবাদক বুলার ছোটবেলার সঙ্গীতচর্চার সঙ্গী মুশতাকের সঙ্গীতবিষয়ক ভাবনা ও সাধনা তাই জাহাঙ্গীরের মাথায় ঢোকে না। বৌকে সে অভিযোগের সুরে বলে –

> তোমার আসলে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল ঐসব হাই-থটের গান বাজনা করা লোকের সঙ্গে। আমি ঐগুলি বুঝি না।[৭৯]

গানবাজনা না বুঝলেও পেশিশক্তি প্রয়োগে নিজের 'টপ' অবস্থানের কথা জাহাঙ্গীর খুব উপভোগ করে। কথায় কথায় সে বারবার বলে, আমি কলেজের 'অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি'। পুরো মহল্লা তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন এক সময়। এমনকি পুলিশের কর্মকর্তারাও অপরাধ দমনে তিনি তার সাহায্য নিয়েছেন। নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার মিথ্যা বয়ান স্ত্রী বুলার কাছে বারবার তুলে ধরে জাহাঙ্গীর। বুলাও বিশ্বাস করে সেসব। তার সন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটে গল্পে –

> 'আমি ঠিক এইরকম লোকই চেয়েছি। এই রকম হাসিখুশি, এই রকম কাজের লোক, এই রকম ফিগার, হেঁটে গেলে মাটি কাঁপে এই আমার ভালো![৮০]

কিন্তু এই তথাকথিত কেজো লোকটি তার কর্মস্থলে মূলত অকোজো, অযোগ্য ও অদক্ষ। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা তার ওপর অসন্তুষ্ট। বিরক্তি প্রকাশ পায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মুখে।

> অর্ডার আসে না কেন? কবীর অর্ডার আনে, বেলাল অর্ডার আনে, তুমি করো কী?[৮১]

---

[৭৯]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৩২
[৮০]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩০
[৮১]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৩

Dhaka University Institutional Repository

এই অযোগ্যতা নিয়েও জাহাঙ্গীর গাড়িবাড়ির স্বপ্ন দেখে। স্ত্রী বুলাকে জানায়, এখানে গুরুত্ব ও মনোযোগের সঙ্গে কাজ করলে গাড়িবাড়ি সবই হবে, বেশি দিন লাগবে না। জাহাঙ্গীরের এই শ্রমবিমুখ মানসিক দেউলিয়াত্ব সময়কালীন যুবসমাজের স্বভাবকেই প্রকটিত করে। এই মানসিক, মানবিক বন্ধ্যত্বের কারণেই জাহাঙ্গীর মেনে নিতে পারে না বুলার সঙ্গে তার ছোটবেলার সঙ্গীত শেখার সঙ্গী মুশতাকের বন্ধুত্ব। গানের শিক্ষক সুনীলদার জন্য বুলা ও মুশতাকের গভীর শ্রদ্ধা, তার ক্যান্সারের খবরে গভীর বেদনার্ত হওয়ার ঘটনাগুলো গল্পের সমকালীনতার নির্দেশক। একই সঙ্গে গল্পে উঠে এসেছে তৎকালীন যুব সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, আত্মম্ভরিতা; দক্ষতা ও যোগ্যতার ঘাটতি সত্ত্বেও সম্পদশালী হওয়ার বাসনা।

ফোঁড়া

'ফোঁড়া' গল্পটিতে সরাসরি রাজনৈতিক বিষয় এসেছে। বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতিবিদদের নানারকম ভুলভ্রান্তি ও শ্রমিকদের বাস্তব সংকট চিত্রিত হয়েছে গল্পে। বামপন্থী নেতা মামুনের কার্যতৎপরতা এবং কারখানা শ্রমিক নইমুদ্দিন ও তার মামাতো ভাই রিকশাশ্রমিকের জীবন বাস্তবতাই গল্পের উপজীব্য বিষয়।

মামুনদের দলের দর্শনে শ্রমিকের একটা ছকবাঁধা জীবন রয়েছে। সেই শ্রমিকের ধারণা মামুনের ভাবনায়ও আছে। কিন্তু এমন ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়নি নইমুদ্দিন ও তার মামাতো ভাই। সে কারণেই দুজনের প্রতি মামুনের রাগ। এমনকি এই দুজনের কার্যকলাপেরও ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না মামুন। দলের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে তাদের কার্যকলাপের মিল নেই। তাতেই মামুনের রাগ বাড়তে থাকে। দলের নেতা হামিদ ভাইয়ের সঙ্গে রাজনীতি, সরকারি দলের তৎপরতা, কারখানা মালিকের কাণ্ডকারখানাসহ নানা বিষয়ে কথা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব মামুন। কিন্তু যাদের নিয়ে দলের কাজ, তাদের জীবন, চিন্তাধারা ও অনুভূতি নিয়ে ভাবে না মামুন। এই গোঁজামিল ও বাস্তব সম্পর্কহীনতাই শ্রমিক রাজনীতির মূল সমস্যা। শ্রমিক সংগঠনের নেতারা কথা বলে বইয়ের ভাষায়। তত্ত্বের মাধ্যমে তারা পৌঁছাতে চায় সমস্যার সমাধানে। তাই নইমুদ্দিন ও রিকশাশ্রমিকের কার্যকলাপ মামুন বুঝতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

একজন কারখানা শ্রমিকের জীবনে উৎসব-আনন্দের উপলক্ষ খুবই কম। নইমুদ্দিনের কাছে ঈদ মানেই সারা বছরের সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন। আবেগ-আকাঙ্ক্ষায় মিশ্রিত এ দিনে সে বৌ-ছেলে-মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারে না। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নইমুদ্দিন নিজের অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখে এবং ডাক্তার ছুটিতে যাচ্ছে জেনে বাড়ি যায় ঈদ করতে। চিকিৎসার জন্য দেওয়া এক শ টাকা খরচ করে সে ভালো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে।

অন্যদিকে মামুনের চিন্তা, নইমুদ্দিন যাতে হাতছাড়া না হয়। দলের সহায়তায় সুস্থ হচ্ছে বলে মামুনের প্রত্যাশা, নইমুদ্দিন তার সব ভাষা ও চাওয়া বুঝবে। নইমুদ্দিনের যে জীবনচর্চা, তাতে রাজনীতি-সচেতনতার বিষয়টি তার কাছে আশা করা কতটা যৌক্তিক – মামুন তা ভাবে না।

নইমুদ্দিন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে রয়েছে বলেই তার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা মুছে যায়নি। নইমুদ্দিনের সুষ্ঠু চিকিৎসার পাশাপাশি ঈদের দিন তার পরিবারের জন্য ন্যূনতম ভালো খাবারের ব্যবস্থা ও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ – এসব সমন্বয়ের কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না মামুনের কাছে। এমনকি দলের নেতারাও তা ভাবেননি।

ঈদের দিন নইমুদ্দিনের বাড়ি যাওয়া নিয়ে হাসপাতালের ওয়ার্ডের অন্য রোগীরা নানা রকম নেতিবাচক মন্তব্য করলে মামুনও তাদের সঙ্গে একমত হয়। মালতীনগরের নতুন মসজিদের মোয়াজ্জিন পা ভেঙে ভর্তি হয়েছে নইমুদ্দিনের একই ওয়ার্ডে। 'এই জাহেলগুলির ঈদের শখ একটু বেশি'– মোয়াজ্জিনের এমন মন্তব্য মামুনকে চাঙা করে। শ্রমিক ও তার আনন্দ-উৎসব নিয়ে মামুনের এই নেতিবাচক ভাবনাই প্রমাণ করে, শ্রমিক রাজনীতি করলেও তাদের প্রতি কোনো মমত্ববোধ নেই তার। শ্রমিকদের সম্পর্কে তার মধ্যে কোনো সম্মানজনক ভাবনা কাজ করে না।

নইমুদ্দিনের খালাতো ভাই রিকশাশ্রমিক। তার রিকশায় চেপে মামুন বাড়ি ফিরছিল। তার সঙ্গে কথায় কথায় জানতে পারে, সে ঈদ উদ্‌যাপন করার জন্য মহাজনের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা ধার করেছে। ঊরুতে ফোঁড়া হওয়ার কারণে সে কয়েক দিন রিকশা চালাতে পারেনি। খুব কষ্টে দিন কেটেছে। কিন্তু কষ্টের মধ্যেও সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ঈদের দিন বৌ-ছেলে-মেয়ের মুখে একটু ভালো খাবার তুলে দিতে। রিকশা চালকের বয়ান:

> দুইসের চাল কিনলাম বারো ট্যাকা দিয়া। একসের সেমাই নয় ট্যাকা। একপোয়া চিনি পাঁচ ট্যাকা, তেল-মশলা তিন ট্যাকার।[৮২]

আর এক টাকা সে ছেলের হাতে দিয়েছে ঈদের দিন ফকিরকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য। এসব শুনে মামুনের মনে হয় লোকটা অপচয় করেছে। উৎসবের আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজনের ব্যাপারটা তার খেয়াল থাকে না। ঈদের দিন মামুনের বাড়িতে যখন রান্না হয়েছে কোর্মা পোলাও জর্দা সেমাইসহ আরো সব ভালো ভালো খাবার, তখন রিকশাওয়ালার সস্তা আধ সের সেমাই কেনাকেই মামুন মনে করে অপচয় :

> সেমাই কিনলে কেন?' মামুন ওর অপচয়ে বিরক্ত, 'সেমাইয়ের টাকায় তোমার দেড়সের চাল হতো।'... 'তা ধরেন ঈদের দিন, বছরকার একটা দিন। ব্যাটা হামার হাউস করছে, তার আবার লাচ্ছা খাবার শখ।[৮৩]

ঋণ করে শখ করে সেমাই কিনলেও খাবারের অভাবে ও স্বাদে বৈচিত্র্য আনতে ঈদের আগের রাতেই তা খেয়ে ফেলে এই পরিবারের সদস্যরা। যদিও ঠিকমতো রান্না না হওয়াতে তা পরিণত হয় আটার দলাতে। আর তার সবটাই খেতে হয় রিকশাওয়ালার স্ত্রীকে। দেড় সের চালের ভাত রান্না করে সেই রাতে সকলে মিলে কৈ মাছের ঝোল দিয়ে তারা তৃপ্তি নিয়ে খায়। কারণ বহুদিন তাদের ভাত খাওয়া হয়নি। কম দামে কেনা গমের আটার রুটি খাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। তাই রুটির পরিবর্তে ঈদের আগের রাতে ভাত ও মাছের ঝোলের আবদার ধরে তার ছেলে। খাবারের এমন অভাব ও বৈচিত্র্যহীনতার বিষয়টা মামুনের জীবনবোধ ও বাস্তবতাকে কখনো স্পর্শ করেনি। তাই সে বুঝতে পারে না রিকশাশ্রমিকের পরিবারের এই কঠিন বাস্তবতা :

> ...'ঈদের দিন খাবে কী?' মামুন থ হয়ে যায়। লোকটা কী পাগল নাকি? ধারকর্জ করে জোগাড়-করা ঈদ- উদযাপনের সমস্ত উপাদান সে শেষ করে ফেলল ঈদের আগের রাত্রে।[৮৪]

মামুনের এই আফসোসকে রিকশাচালক নাকচ করে দিয়ে জানায়, ফোঁড়া হয়েছে বলে সে কয়েক দিন রিকশা চালাতে পারেনি।

> ...হামি কই এই ফোঁড়া না হলে হামি আজ পোলায়া কোর্মা না হলেও খিচড়ি আর গোরুর গোশতো ব্যাটা-বিটির মুখোত টিকই তুল্যা দিতাম।[৮৫]

---

[৮২]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৪৬
[৮৩]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৭
[৮৪]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৮
[৮৫]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৯

Dhaka University Institutional Repository

এই ভাবনার পার্থক্যই বলে দেয় শ্রমিক ও শ্রমিকনেতার জীবন কত আলাদা। ঈদের দিন ছেলে-মেয়েকে খিচুড়ি গোশত খাওয়াতে পারেনি বলে রিকশাওয়ালার যখন কষ্ট হচ্ছে, মামুন তখন তার আধা সের সেমাই কেনাকে ভাবছে অপচয়। রিকশাওয়ালার উপার্জনের বাধা যে ফোঁড়া, তা মামুনকে দেখাতে উরুর কাপড় তুলে ধরতেও কোনো সংকোচ তার মধ্যে কাজ করে না। ভীষণ সংকোচে পড়ে মামুন ধমক দেয়–

> আরে মিয়া কাপড় ঠিক করো!। [৮৬]

এই যে রুচির পার্থক্য, কঠিন জীবন বাস্তবতা, দারিদ্র্য এসব অতিক্রম করে মামুন মিলতে পারে না শ্রমিকদের সঙ্গে। সে কারণেই এ দেশের শ্রমিক আন্দোলন তত্ত্বনির্ভর। যা বড় কোনো অর্জন, সমাজ পরিবর্তনের কোনো মাইলফলক স্পর্শ করতে পারে না।

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল

'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পটি ১৯৯২ সালে লেখা, যখন দেশের মানুষ খানিকটা হাঁফ ছেড়ে সামরিক শাসনের কবলমুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের পথে চলতে শুরু করেছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জিতে বিএনপি সরকার গঠন করে। এই সরকার গঠনে অংশীদার করে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দলগুলোকে। নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বেই দেশের মানুষের রক্তে লেখা হয় সামরিক শাসনের বিদায় পর্ব। সেই দাগ শুকাতে না-শুকাতেই রক্তশোষক রাজাকাররা, বেঈমান দেশদ্রোহীরা ঝান্ডা উঁচিয়ে দাপটে চলাফেরা করতে থাকে সংসদে, রাজপথে, দেশজুড়ে; যা দেশবাসীকে কাতর ও যন্ত্রণাময় জীবনের দিকে ঠেলে দেয়; জনগণকে করে তোলে শংকিত। দেশব্যাপী চলতে থাকে পুনর্বাসন ও সম্পদ লুণ্ঠনের মচ্ছব। জনগণের এই যন্ত্রণাকাতর চিত্ত লেখক ইলিয়াসকে স্পর্শ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তাকারী ইলিয়াসের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে দেশের ইতিহাসের উল্টোপথের যাত্রা। পশ্চাৎপদ এই যাত্রায় দেশের সমূহ ক্ষতির বিষয়টি পাকাপোক্ত হয় বড় একটি রাজনৈতিক দলের হাত ধরে।

---

[৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

লাল মিয়া, ইমামুদ্দিন, বুলেট ও নাজির আলির কথোপকথন, ক্রিয়াকর্ম, বাদানুবাদ এবং তাদের স্বপ্ন দর্শন ও বয়ানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পটি। গল্পের সময়কাল মুক্তিযুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তী কয়েক বছর। লাল মিয়ার বাল্যকালের বন্ধু ইমামুদ্দিন। সে প্রেসের কর্মচারী। জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নানা পোস্টার, লিফলেট ছাপাতো এই প্রেসে; আলোচনা করতো যুদ্ধ নিয়ে। ইমামুদ্দিন তাদের সঙ্গে পরিচয় ও আলাপের সূত্রেই শপথ নেয় দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার। ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে এসে অংশ নেয় যুদ্ধে। পাকিস্তানি সেনা জখম করে, রথখোলা মোড়ে ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে পালাবার সময় সেনাদের গুলিতে শহীদ হয় ইমামুদ্দিন। ইমামুদ্দিনের দাদি মারা যায় পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে। ছোট ভাই ও বৌকে ধরে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। বাবাকে জখম করে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে দিয়ে যায় ওদের বাড়িতেই। ইমামুদ্দিনের মা প্রথমে লাল মিয়ার মায়ের কাছে আশ্রয় নেয়। তিনি সঙ্গে নেন ইমামুদ্দিনের ছেলে বুলেটকে। দেশ স্বাধীন হলে মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে এসে ইমামুদ্দিনের মাকে বসায় নাজির আলির দখল করা নবেন্দু বসাক লেনের দোকানঘরে। সটকে পড়ে নাজির আলি। অবশ্য তা অল্প কয়দিনের জন্য। এই নাজির আলিরা পাকিস্তানি সেনাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে মনেপ্রাণে। পাকিস্তানের জয় ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধনৈপুণ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না তাদের। দ্বিধা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি ও যুদ্ধকৌশল বিষয়ে, বাংলাদেশের স্বাধীনতায়। পাকিস্তান বাহিনীর দালাল নাজির আলির মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত ভাবনা সূত্র মেলে তারই কর্মচারী লালমিয়ার ভাষ্যে –

> মগর মহাজনে কয়, এইগুলি ইন্ডিয়ার শয়তানি। হিন্দুগো লগে সাট কইরা ইন্ডিয়া এইগুলি করে, কয়টা গাদ্দার জুটাইছে, আর আমাগো পোলাপান না বুইঝা খালি ফাল পাড়ে। ... গাদা বন্দুক আর বটি আর ছুরি লইয়া লাগতে গেছে মিলিটারির লগে।[৮৭]

বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের অসীম সাহস ও ত্যাগের বিনিময়ে মিথ্যে হয়ে যায় নাজির আলিদের ধারণা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে আসে মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু স্বাধীন দেশ সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিনের যে যুদ্ধকালীন ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা তা রয়ে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। যে সাম্য- ভাবনা সে বন্ধু লাল মিয়ার কাছে

[৮৭]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৫৭-৩৫৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্ত করে স্বাধীন দেশ সম্পর্কে, তা কোনো দিন বাস্তবায়িত হয় না। ইমামুদ্দিনের মতো লাখো মানুষের স্বপ্ন-কল্পনার স্বদেশ ভাবনা হোঁচট খায়।

হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে ইমামুদ্দিনের ভাবনার কথা শোনা যায় বন্ধু লালমিয়ার সঙ্গে কথোপকথনে। সে বলে, 'গরিব মানুষের মইদ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইবো।' শুধু তা-ই নয়, তার ভাবনা আরও প্রসারিত হয়। বলে নাজ, গুলিস্তান সিনেমা হল দখল করে বাঙালিরা সেখানে ইচ্ছামতো ছবি দেখবে। গুলিস্তান রেস্টুরেন্টে ঢুকে যা মনে চায় খাবে। চু-চিন-চৌ রেস্টুরেন্টে বিলাতি বোতল সব খুলে দেওয়া হবে সবার জন্য।

কিন্তু সেই স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারি দল ও তাদের পোষা মাস্তানদের দখলে চলে যায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি, সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি দোকানপাট, দেশের অর্থসম্পদ। এ দখলের উৎসবে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীও যুক্ত হয়। সরকারি দলের সঙ্গে ভিড়ে, কখনো পরিচয় গোপন করে কৌশলে দখলে নেয় দেশের অর্থসম্পদ। মুক্তিযুদ্ধকালে তারা পাকিস্তানি বাহিনীর দালালি করে যে হিন্দু সম্পত্তি দখলে নেয়, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী কিছুদিন আত্মগোপনে থেকে তারাই ফিরে আসে রাজনৈতিক সবুজ সংকেত পেয়ে। এ গল্পের রাজাকার নাজির আলি একে একে দখল করেছে কার্তিকবাবুর লন্ড্রি, নবেন্দু বসাক লেনের রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের মনিহারির দোকান। পাকিস্তানি সেনারা ধনঞ্জয় সাহার কাপড়ের দোকান পুড়িয়ে দিলে সেই ঘরটিও দখল করে নাজির আলী। মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিন বন্ধু লালমিয়াকে জানিয়েছিল–

> সমস্ত দেশ থেকে মিলিটারি নিশ্চিহ্ন করে তাদের দালান ভাউরা যা আছ সবাইকে তারা একটি একটি করে সাফ করবে।[৮৮]

এ দেশের মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী মানুষের এই চাওয়া পূর্ণ হয়নি। নাজির আলিরা থেকে গেছে এ দেশে বহাল তবিয়তে। পাকাপোক্ত করেছে অর্থ সম্পদ ক্ষমতা। স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক শাসনের আমলে 'নতুন মিলিটারির নতুন কিসিমের দাপট শুরু হলে,' ফিরে আসতে থাকে নাজির আলিরা। যুদ্ধের পর যে সময়ে আত্মগোপন করে ছিল, সে সময়েও নাজির আলি টাকাপয়সা কামিয়েছে ও সরকারি দলের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার সূত্র খুঁজে পেয়েছে।

---

[৮৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৫৮

Dhaka University Institutional Repository

> লালমিয়া একটু-আধটু খবর পায়, নাজির আলি নাকি, চিটাগাং না খুলনা না কুমিল্লা কোথায় গিয়ে ঘাপটি মেরে থেকেও ধুমসে বিজনেস করে যাচ্ছে, তার পার্টনার নাকি কোন মন্ত্রীর ভাই, সেই ভাইও যুদ্ধে গিয়েছিল।[৮৯]

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে উপার্জনে এই টাকার পরিমাণ যে বিপুল, তা নাজির আলির আত্মকথনেই ধরা পড়েছে।

> ঘাপটি মেয়ে থাকার সময় তখনকার মন্ত্রীর মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করে যে টাকা করেছে তা কি ব্যাংকে জমাবার জন্যে? গার্মেন্টস চালু হলে তো কথাই নাই। এই মহল্লা কিনে নিতে তখন তার কতক্ষণ? তখন বুলেট তো বুলেট, তার মুরুব্বি যে লাল মিয়া তাকেও লাথি মেরে বার করে দিতে একটুও বেগ পেতে হবে না। আরে এইগুলি হইল প্যাসাবের ফেনা - এই আছে, এই নাই।[৯০]

অর্থের দাপটে মানুষকে যে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, সেই পাষণ্ড, কপট নাজির আলি ধর্মের তকমা এঁটে সমাজে পুনর্বাসিত হয়। শুক্রবার জুমার নামাজের পর সবাইকে সে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে সালাম জানায়। সকলের সঙ্গে মোসাবা করে ও বয়স্কদের সঙ্গে বুক মেলায়। পাড়ার ঘরে ঘরে যায় এবং মিথ্যা বয়ান ছাড়ে। মক্কা শরীফে বসবাসের কথা বলে। বলে, তার জীবনে এখন অপার শান্তি, মানুষের দোয়া ছাড়া আর কিছুই তার কাম্য নয়। বাঁচার জন্য সে বায়তুল মোকাররমে একটা সোনার দোকান করেছে। বাস্তবে সে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করার আয়োজন করছে। পাকিস্তানের আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতি শুক্রবারে মসজিদের সামনে ওয়াজ নসিহত করে।

নাজির আলিদের তৎপরতা ও সামরিক শাসনের নতুন উৎপাতে দেশ চলতে থাকে অন্ধকারের দিকে, পেছনের দিকে। 'উল্টো পায়ের পাতা' লাগানো নেতাদের তৎপরতায় দেশ কেবলই পিছিয়ে পড়তে থাকে। লাল মিয়া ও বুলেট এসব 'উল্টো পা লাগানো' মুসুল্লিদের খোয়াবে দেখতে থাকে। বুলেট এই উল্টানো পায়ের পাতার হুজুরদের পা মেরামতের কথা

---

[৮৯]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৬৫

[৯০]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

বলে। সংশোধনের অতীত এই জালেমগুলো বুলেটের কথায় রেগে যায় এবং তাকে ধাওয়া করে। পশ্চাৎপদ হওয়ায় তারা বুলেটকে ধরতে পারে না। অন্য এক স্বপ্নে গড়িয়ে পড়ে সে। হাউজ বিল্ডিং করপোরেশনের উঁচু ছাদের উপর থেকে এই উল্টানো পায়ের পাতাকে ত্যাগ করে এবং প্রচণ্ড বেগে প্রস্রাবের ধারা বইয়ে দেয় সেই উল্টানো পায়ের পাতায়। পুরো ব্যাপারটা ঘটে স্বপ্নে।

ইতিহাসের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ইলিয়াসকে ইতিহাসের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ছবি দেখায়। লেখক বুঝতে পারেন স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন ও দাপট নিরুদ্বিগ্ন থাকবে না ভবিষ্যতে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিস্তার লাভ করতে থাকবে ক্রমশ দেশব্যাপী। দেশদ্রোহীদের কফিনে পেরেক এঁটে দেবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। যার সূচনা হয়েছে জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জালের মধ্য দিয়ে।

কান্না

'কান্না' গল্পটিতে আফাজ আলীর দুঃখ বেদনা, অর্থকষ্ট ও কান্নার প্রসঙ্গ চিত্রণের সাথে সাথে লেখক বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী, আমজনতার দুঃখ-যন্ত্রণা, আশা ভঙ্গের বেদনা, দুর্নীতি ও জালিয়াতির সমাজ বাস্তবতাকেও তুলে ধরেছেন। ঢাকায় কবরস্তান দেখাশোনায় চাকরিরত আফাজ আলিকে সংসারের খরচ জোগাতে হিমশিম খেতে হয়। গোরস্তানের কবরবাসীর ছেলে-মেয়ে-বৌ-আত্মীয়-স্বজনদের টেলিফোন করে শবেবরাত কিংবা অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবে গোর জিয়ারত করার কথা মনে করিয়ে দিয়ে, তাদের চাহিদামতো কবরে সবুজ ঘাসের বর্ডার দিয়ে, গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেলী ফুলের গাছ লাগিয়ে, এর ওর ধমক সহ্য করে, কবরগুলো সাফ সুতরো করে, গোর জিয়ারতের সময় করুণ সুরে দোয়া-দরুদ পড়ে মুর্দার জন্য আল্লাহর দরবারে গোনাহ মাফ ও বেহেস্তের জন্য মোনাজাত করে, উপস্থিত সকলের শোককে অশ্রুতে পরিণত করে এবং এর বিনিময়ে তাদের পকেট থেকে পাওয়া টাকাই আফাজ আলীর আয়।

এত কষ্টের আয় দিয়ে আফাজ আলীর সংসার কোনোমতে চলছিল। কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনাই তাকে ফেলে দেয় বেশ অসুবিধায়। বড়ো ছেলে মোহাম্মদ হাবিবুল্লা দপদপিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাস করে বাকেরগঞ্জ কলেজে ভর্তি হয়। প্রথমবার ফেল করে। দ্বিতীয়বার পরীক্ষাকেন্দ্র বদলে শিক্ষা বোর্ড অফিসে পয়সা খরচ করে এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে। পড়ার দরকারি খরচ ও ঘুষের টাকা দুই-ই জোগান দিতে হয় আফাজ আলীকে। দেশের শিক্ষা খাতে দুর্নীতি ও জালিয়াতি আফাজ আলীর নজরে আসে। শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে সে কলেজের শিক্ষকদের ওপর :

> এইসব প্রফেসর লাইনের মানুষদের আফাজ আলি হাড়ে-হাড়ে চেনে। হাবিবুল্লাকে সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করিয়ে দিতে ঘুষ নিল যে লোকটা, দবিরুদ্দিন না কবিরুদ্দিন মোল্লা, সেও তো, কোন কলেজের মাস্টারই ছিল।[৯১]

আফাজ আলীর সাথে সাথে লেখক শিক্ষা খাতের বন্ধ্যাদশা নিয়ে পাঠকের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেন। একই সাথে তিনি পাঠকের দৃষ্টি ফেরান সামাজিক পশ্চাৎপদতা ও ষড়যন্ত্রের দিকে। বাস্তব জীবনের কর্মযজ্ঞের সাথে সম্পর্কহীন মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে সরকার, সমাজপতি উভয়ই তৎপর। একই সাথে তৎপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও সংস্থাসমূহ।

'এম.পি সাহেব বহুত তদবির' করে তাদের গ্রামের মাদ্রাসার জন্য ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়েছে। মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় কাজের ধুম পড়ে গেছে। আফাজ আলীর ছোট ছেলে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল হাবিবুল্লাহর তাগাদায়। কিন্তু ঝড়ে ওই স্কুল ভেঙে যাওয়ার পর এখনো মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। অথচ নিকটবর্তী এবতেদায়ি মাদ্রাসায় দেওয়া হচ্ছে নতুন টিনের ছাউনি।

> বাকেরগঞ্জে আলিয়া মাদ্রাসার বিল্ডিং করার টাকা এসেছে মেলা, বিলাত না আমেরিকার কোন নাসারা প্রতিষ্ঠান টাকা ঢালছে আমাদের দীনি এলেমের জন্যে[৯২]

বাংলাদেশের মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থা কত অবহেলিত, তার একটা চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক এই গল্পে। এমন সমাজ বাস্তবতার কারণেই দক্ষ জনশক্তির অভাব। ঘুষ দিয়ে পাস করা যায় বলেই, চাকরি পেতে ঘুষ লাগে। সমাজের এসব দুর্নীতি-দুর্ব্যবস্থার চিত্রও এ গল্পে এসেছে। আফাজ আলী বড় ছেলের চাকরির জন্য প্রথম কিস্তির ৫০০০ টাকা ঘুষ দেয় জাহাঙ্গীর কাজী নামের কোনো এক কলেজের শিক্ষককে। এই শিক্ষক সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছে '২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী শিক্ষা বিস্তার প্রকল্প' অফিসে। ঘুষের এই টাকা আফাজ আলী সংগ্রহ করেছে আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের কাছ থেকে ধার করে। এ জন্য তাকে ২০ শতাংশ হারে লাভও দিতে হবে। ছেলের জন্য আফাজ আলীর এই ঝুঁকির কারণও আছে।

> ছেলের যদি ছোট-খাটো চাকরি একটা জোটে তা জীবিত অবস্থায় কবরবাস থেকে সে রেহাই পায়।[৯৩]

---

[৯১]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৮১
[৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৮
[৯৩]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০

কিন্তু আফাজ আলীর সেই আশা পূরণ হয়নি। ডায়রিয়া হয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না পেয়ে মারা যায়। যে দেশের গোড়ায় গলদ, সে দেশে গ্রামে, শহরে, ধনী দরিদ্রে কত না তফাত। মৌলিক চাহিদা পূরণের সামান্য ব্যবস্থাও তাই থাকে না গ্রামে। ডায়রিয়া হয়ে তাই দক্ষিণবঙ্গের গ্রামের মানুষ মারা পড়তে থাকে প্রায় বিনা চিকিৎসায়।

> বাকেরগঞ্জ হাসপাতালে ডাক্তারদের কেউই সপ্তাহে দুই দিনের বেশি হাসপাতালে থাকে না। ছোকরা এক নতুন ডাক্তার এসেছে, সে একাই সামাল দিচ্ছে কয়েকটা ইউনিয়নের রোগী। হাসপাতালে স্যালাইনের ব্যাগ ছিল মোটে কয়েকটা... [৯৪]

ইলিয়াসের বর্ণিত চিকিৎসাসেবার এই বেহাল ও করুণ চিত্র এখনো বহাল বাংলাদেশের অনেক গ্রামে। আফাজ আলীদের কান্না তাই কখনো থামে না। এ দেশে কান্নাই যেন তাদের একমাত্র নিয়তি।

যে গোরস্তানের মুর্দা ময়মুরুব্বির জিম্মাদার আফাজ আলী, সে গোরস্তানে যাদের যাতায়াত, তারা কোনো সাধারণ লোক নন।

> মুর্দা হোক আর জিন্দা হোক, এখানে আসে সব বড়ো-বড়ো মার্চেন্ট, ফরেনারদের অফিসে কাজ করা সায়েবরা...। [৯৫]

গোরস্তানে দামি দামি গাড়ি, বিদেশি আগরবাতি, তাদের সাহেবি চালচলন ও মূল ফটকের বাইরে অপেক্ষমাণ ফকির মিসকিনের মারামারি-কাড়াকাড়ি স্পষ্ট করে তোলে এ দেশের বিপরীত দুই সমাজ বাস্তবতাকে। দুইয়ের মধ্যে ফারাক এতই বেশি যে, বোঝা যায়, শোষণ প্রক্রিয়া এখানে কতটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সমাজ বাস্তবতার এ ধারায় বাড়তে থাকে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। সমাজগতির এই অস্থিতিশীলতা সমাজে অন্যায়, অরাজকতা, ঘুষ, দুর্নীতির ব্যাপকতা বাড়ায়।

---

[৯৪]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৮৬

[৯৫]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮১

Dhaka University Institutional Repository

রেইনকোট

'রেইনকোট' মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা শহরের টুকরো টুকরো ঘটনাচিত্র নিয়ে রচিত। এ গল্পের বিষয়বস্তু পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ভয়াবহ আক্রমণ, অত্যাচার, নির্যাতন ও তাদের সেবাদাসদের প্রভুভক্তি এবং তার বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতা ও প্রতি-আক্রমণ। সেই সঙ্গে মানস শক্তিতে ভীতু নুরুল হুদার ভয়শূন্যহীন এক শুদ্ধ মানসলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার চিত্র ঘুরেফিরে এসেছে এই গল্পে।

যুদ্ধের শুরুতেই ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের কোয়ার্টার ঘেষে থাকা জিমনেসিয়ামে মিলিটারি ক্যাম্প করা হয়। তখন থেকেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে মদদ দেওয়া প্রিন্সিপালের কাছে ফরজ কাজ মনে হয়। আর সে তা করেও চলে মনেপ্রাণে। 'আভি মিলিটারি সাহেবকো মদদ করনা এখন ফরজ কাম হ্যায়।' পাকিস্তানের জন্য দিন রাত সে দোয়া-দরুদ পড়ে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বড় কর্তাদের কাছে বিনীত নিবেদনে সে জানায় –

> পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুলকলেজ থেকে শহিদ মিনার হঠাও। এসব আনঅথরাইজড কনস্ট্রাকশন হলো হিন্দুর শিবলিঙ্গের সামিল, এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে এসব কাঁটা ওপড়াতে হবে।[৯৬]

পাকিস্তানের এই দালাল, বেঈমানেরা বাঙালির জাতীয়তাবোধের চেতনাকে ঠিকই চিহ্নিত করেছিল এবং তা ভেঙে দেওয়ার জুতসই এক উপায়ও বাতলে দেয় প্রভুদের। মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তাদের ধারণা। প্রিন্সিপাল ড. আফাজ আলীর পরামর্শমতো দেশের কোনো কলেজের শহীদ মিনার তারা অক্ষত রাখেনি। ঘৃণায় ক্ষোভে বাঙালির জাতীয় চেতনা আরো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার প্রশ্নে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

যুদ্ধচলাকালীন পাকিস্তান সরকার কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে মিথ্যা প্রচারণা। মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাসহ আপামর বাঙালির মনোবল ভেঙে দেওয়ার ঘৃণ্য চেষ্টা চলে। সে বিষয়ের এক খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন লেখক গল্পে।

[৯৬]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

> রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলছে, সিচুয়েশন নর্ম্যাল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দুষমনকে সম্পূর্ণ কবজা করা গেছে। মিসক্রিয়েন্টরা সব খতম।[৯৭]

পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও শান্ত ঘোষণা করে চলতে থাকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নরপিশাচদের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা। তারা জ্বালিয়ে দেয় গ্রামের পর গ্রাম, বস্তি। বাদ পড়ে না শিশু ও বৃদ্ধ। শত শত মানুষকে পুড়িয়ে মেরে লাশ ফেলে দেয় নদীতে। মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় মিলিটারি ক্যাম্পে।

গল্পের প্রধান চরিত্র কলেজের প্রভাষক নুরুল হুদা। যুদ্ধের শুরু থেকেই যে নুয়ে পড়ে ভয় ও আশঙ্কায়। নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু তাদেরই সাথে থেকে ভেতরে ভেতরে তৈরি হয় মানসিকভাবে। মগবাজারে নুরুল হুদার দুই কামরার ফ্ল্যাট বাসা থেকে মিন্টু জুন মাসের ২৩ তারিখে রওনা হয় যুদ্ধ ক্যাম্পের উদ্দেশে। ভয়ে বাসা বদল করে নুরুল হুদা। কেউ যাতে কিছু আঁচ করতে না পারে, সে কারণে চারবার বাসা বদলায়। স্ত্রী আসমা যখন ছেলে-মেয়েদের কাছে তার মুক্তিযোদ্ধা ভাই সম্পর্কে গল্প করছে, তারাও জানে, 'ছোট মামা গেছে খান সেনাদের মারতে।' শুনে ভয়ে ও বিরক্তিতে সে স্ত্রীর উদ্দেশে মনে মনে আওড়ায় –

> মিন্টুর কথা ভুলে যাও আসমা, ভুলে যাও। আমাদের সঙ্গে কেই নাই, কেউ নাই।[৯৮]

রাজাকার ইসহাকের কথা নীরবে শুনে অফিস সময় পার করে নুরুল হুদা। যুদ্ধবিষয়ক আলোচনা, পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ে সহকর্মীদের করা মস্করা থেকে সে দূরে থাকে। নিজের নিরাপত্তার কথা সব সময় চিন্তা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবগাথাও সে কখনো ভুলে উচ্চারণ করে না। আরবির অধ্যাপক আকবর সাজিদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে। এত সব করেও রেহাই পায় না নূরুল হুদা। প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারের দেয়াল ঘেঁষে অবস্থিত ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মারে বোমা মারেন মুক্তিযোদ্ধারা। ডাক পড়ে নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধার। তাদের নামে অভিযোগ, যেসব 'মিসক্রিয়েন্ট' বোমা মেরেছে ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মারে, তাদের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে এই দুই কলেজ শিক্ষকের। প্রিন্সিপ্যালের পিয়ন ইসহাক খবর এনেছে, এক্ষুণি তাদের হাজির হওয়ার নির্দেশ পাঠিয়েছেন মিলিটারির কর্নেল।

---

[৯৭]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৪

[৯৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৯৫

Dhaka University Institutional Repository

তুমুল বৃষ্টির ভেতরই রওনা দিতে হবে। বৌয়ের জোরাজুরিতে শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর রেখে যাওয়া রেইনকোট চাপিয়ে যাত্রা শুরু করে কর্নেলের তলবে হাজির হতে। রেইনকোর্ট পরার পর থেকেই অদ্ভুত এক রূপান্তর নিজের ভেতরে টের পেতে থাকে নুরুল হুদা। মেয়ে যখন বলে, 'আব্বু ছোটমামা হয়েছে' শুনে চমকে উঠে ভাবে, 'মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে?' ক্রমশ মিন্টু সম্পর্কে ভাবনা ভিড় করে আসে তার মস্তিষ্কে। মিলিটারিদের অত্যাচার ও তার প্রতিশোধে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ বিষয়ে তার ভাবনা ও কল্পিত দৃশ্যগুলো স্পষ্ট হয়। মানসচোখে দেখতে পায়–

> ১. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি প্লাটুন গ্রাম জ্বালিয়ে শ-দুয়েক মানুষ মেরে লাশগুলোকে ফেলে জিপে করে নিয়ে যাচ্ছে জ্যান্ত জোয়ান মেয়েদের...।[৯৯]
>
> ২. মিন্টুর স্টেনগান নিশ্চয়ই তাক করে রয়েছে ঐ মিলিটারিগুলোর দিকে। মিলিটারির সব কটাকে খতম করে মেয়েগুলোকে বাঁচাতে পারবে তো?[১০০]

নানা চিন্তাভাবনা, দৃশ্য ও ঘটনার মধ্য দিয়ে বাসে করে নুরুল হুদা অবশেষে পৌঁছে ঢাকা কলেজে। জাঁদরেল টাইপের মিলিটারির হুকুমে তাদের চোখ বেঁধে তোলা হয় একটি জিপে। মস্ত উঁচু ঘরে এনে চোখ খুলে দেওয়া হয়। নুরুল হুদা আর আবদুস সাত্তার মৃধাকে দেখতে পায় না। শুরু হয় জেরা। ইংরেজিতে চলতে থাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। একজনের পর আরেকজন। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে। তাকে জানানো হলো কলেজের জন্য আলমারি কেনা হলে সেগুলো যে কুলিরা বয়ে এনেছিল তারা ছিল 'মিসক্রিয়েন্ট'। কুলির ছদ্মবেশে তারা কলেজে ঢুকেছিল। নুরুল হুদার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নিয়মিত। কলেজের শিক্ষদের মধ্যে নুরুল হুদার নামই তারা কেবল বলেছে। তাদের ঠিকানা বলে দিলেই তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে। শুরু হয় মারপিট। নুরুল হুদাও ক্রমশ পৌঁছাতে থাকে ভয়শূন্যহীন শুদ্ধ এক মানসলোকে। মুক্তিযোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়ে সে হয়ে পড়ে নির্ভয় ও যন্ত্রণা-অনুভূতিহীন। ছাদের আংটার সঙ্গে ঝুলিয়ে চাবুকের সপাং সপাং বাড়ি পিঠে পড়তে থাকলে তার মনে হয় এ স্রেফ উৎপাত। মনে হয় বাড়িগুলো পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোট খুলে নিলেও তার মনে হতে থাকে তার ওম শরীরে লেগেই রয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিজের নিবিড় সম্পর্কের উত্তেজনায়, আনন্দে সে কাঁপতে থাকে। চাবুকের বাড়ির দিকে তখন তার মনোযোগ থাকে না। নুরুল হুদার এই রূপান্তর সময়- নির্দেশিত। মিলিটারির জুলুম-

---

[৯৯]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৯৮

[১০০]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৮

অত্যাচারের ভয়ে ভীত থাকলেও অন্তরে তার রয়ে গেছে গভীর স্বদেশপ্রেম। তাই দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে ঘুরে দাঁড়ায় সে; হয়ে ওঠে ইতিহাসের নায়ক। অকাতরে স্বীকার করে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। সে তাদের ঠিকানা জানে, তাদের আস্তানা চেনে।

ইলিয়াস মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্বরাজনীতির প্রসঙ্গটিকে ও বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পে। যুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক অস্বীকার করে নুরুল হুদা আত্মকথনে জানায়–

> আমাদের সঙ্গে কেউ নাই, কেউ নাই। কিসিঞ্জার সাহেব বলেছে, এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার।- মানুষ মেরে সাফ করে দেয় বাড়িঘর, গ্রাম, বাজারহাট জ্বালিয়ে দিচ্ছে,– কারো কোন মাথা ব্যথা নাই। এসব হলো ইনটার্নাল অ্যাফায়ার।[১০১]

পাকিস্তানের শাসকেরা ধর্মের কথা বললেও ইসলাম ধর্মের শান্তি ও নীতি-নৈতিকতার ব্যাপারে তারা পরোয়া করে না। তাদের মূল উদ্দেশ্য বাঙালি নিধন ও বাংলাদেশ দখল। সে ব্যাপারটিও উঠে এসেছে গল্পে। 'ক্র্যাক ডাউনে'র ভোর রাতে আজান দেওয়ার জন্য মোয়াজ্জিন দাঁড়ায় মসজিদের ছাদে। বিদ্যুৎ ছিল না বলে মুখেই যতটা পারা যায় জোরে আজান শুরু করে। দ্বিতীয়বার আল্লাহু আকবর বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানি সেনারা তাকে গুলি করে ফেলে দেয় রাস্তার ওপর।

রাজাকারদের লুটপাটের চিত্রও এসেছে গল্পে। রাজাকারদের তৎপরতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় লাখো বাঙালি সর্বস্বান্ত হয়। এ সত্যটিকেও লেখক স্থান দিয়েছেন গল্পে। নুরুল হুদার নিচের ফ্ল্যাটে থাকে এক ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপের মালিক। তার সর্দার গোছের রাজাকার শ্বশুরের তৎপরতায় সেই চিত্র ধরা পড়ে :

> সপ্তাহে দুইদিন-তিনদিন মেয়ের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, টেপ রেকর্ডার দামি দামি সোফাসেট, ফ্যান, খাট-পালং সব চালান পাঠায়। ... ট্রাক-ট্রাক মাল আসে আবার চলেও যায়।[১০২]

'রেইনকোট' গল্পে প্রতিফলিত বাস্তবচিত্র হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধকালের এক খসড়া দলিল।

---

[১০১]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৯৫

[১০২]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের শিল্পরূপ

বাংলা ছোটগল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নিজস্ব-নির্মাণ বৈশিষ্ট্যময় হয়েছে ভাষাগত সৃষ্টিশীলতার কারণে। 'এই বিস্তৃত-জনপদের মানুষের হঠকারী চিন্তা, মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত হল্লা ও নোংরামি, ব্যর্থতা থেকে জাত অতৃপ্তি আর হতাশা থেকে উত্তরণের প্রাণান্ত অরুচিকর চেষ্টা ও নোংরা কৌশল, শৌখিনতা ও ভদ্রতার নামে মুখোশের অন্তরালে অভিনেতা ও দৃশ্যের পালাবদল এবং শিকড় ও অস্তিত্বের প্রশ্নে গ্রামীণ মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম তাঁর গল্পে বাঙ্ময় হয়েছে।'[১] ইলিয়াস নিজস্ব উপলব্ধির এই জগৎ চিত্রণে তৈরি করেছেন নিজস্ব 'ভাষা স্টাইল'। 'সবিস্তার বর্ণনা' ও 'শ্লেষ' এই দুই ভাষিক বৈশিষ্ট্য প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হয় ইলিয়াসের গল্পে। জীবনের অস্থিমজ্জা, সারাৎসারের অনুসন্ধান ও গভীর তলদেশের আলোড়ন উপস্থাপনে ইলিয়াস ব্যবহার করেছেন সবিস্তার বর্ণনা। কেবল বস্তুজগৎ ও দৃশ্যজগতের সাদামাটা বিবরণ নয়, মানসজগতের সঙ্গে বস্তুজগতের সম্পর্ক, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সৃষ্ট তরঙ্গকেও গভীর মনোযোগে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, রূপ দিয়েছেন নিজস্ব ভাষায়। ব্যাপক স্থান ও সময়জুড়ে তিনি বর্ণনা করেন গল্পের প্রেক্ষাপট, ভূগোল এবং চরিত্রের ভেতর আর বাইরের স্বরূপ।

ইলিয়াস তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা, ভণ্ডামি ও দ্বিধা, চাটুকারিতা ও সুবিধাবাদিতা, শোষণ ও দখলদারিত্ব প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপনে শ্লেষের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর গল্পে ভাষার শক্তি অনন্য। আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগেও তিনি দেখিয়েছেন অসাধারণ দক্ষতা। পুরান ঢাকার মানুষের মুখের ভাষা, তাদের ঐতিহ্যিক গ্রন্থন, খিস্তি-খেউড়, কর্মচঞ্চল প্রাত্যহিকতা রূপ পেয়েছে ইলিয়াসের ছোটগল্পে। বগুড়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষারও তিনি প্রয়োগ করেছেন গল্পে। স্বপ্নদৃশ্যের মাধ্যমে গল্পের পরিণতি নির্দেশ, সংকেত সৃষ্টি ও 'ফ্লাশব্যাক' পদ্ধতিতে গল্পের প্রেক্ষাপট বর্ণনা ইলিয়াসের গল্পের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পবৈশিষ্ট্য। উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের সংলাপে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করেছেন তিনি। তিনি গল্পের পরিচর্যায় এক্সপেশনিস্ট, ইমপ্রেশনিস্ট ও সুররিয়ালিস্ট শিল্পরীতির প্রয়োগ করেছেন অসাধারণ নিষ্ঠায়।

---

[১]. জাফর আহমদ রাশেদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা ২০১২ পৃ. ৯ ও ১০

Dhaka University Institutional Repository

গল্পে সবিস্তার বর্ণনারীতির প্রয়োগ করলেও ইলিয়াসের পরিমিতিবোধ অসাধারণ। তিনি জানেন কোথায় বর্ণনার ছেদ টানতে হয়, কাহিনির গতিকে এগিয়ে নিতে হয়। গল্পে নিজস্ব বিশ্বাস, আদর্শ, নৈতিকতা, পাণ্ডিত্য প্রচার থেকে বিরত থেকেছেন তিনি। চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রেও ইলিয়াসের নিজস্ব স্টাইল অনুসৃত হয়েছে। বিশেষ কোনো চরিত্রকে নায়ক করে তোলার প্রতি মনোযোগ নেই লেখকের। গল্পের চরিত্রগুলো মূলত সমবেত জনগোষ্ঠীর প্রতীক; সবাই জীবন্ত। ইলিয়াসের তেইশটি গ্রন্থিত ছোটগল্পের ভাষিক বৈশিষ্ট্য ও শিল্পরূপ বিবেচনা এই অধ্যয়ের আলোচনার বিষয়।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

অন্য ঘরে অন্য স্বর আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম গল্প 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র ভাষা ও শৈল্পিক পরিচর্যা ইলিয়াসের সমস্ত গল্প থেকে আলাদা। অসাধারণ কবিত্বময় ভাষা ও আবেগময় উপস্থাপন ভঙ্গি, উপমা অনুপ্রাসের আধিক্য, রোমান্টিকতা এই গল্পকে দিয়েছে অন্য এক মাত্রা।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে রঞ্জুর আত্মসন্ধানের নামে বারবার সোনালি অতীতের সন্ধান, বর্তমানের সামাজিক জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বন্দ্বময় আত্মখনন, কোনো কিছুতেই খাপ খাওয়াতে না পেরে আত্মহত্যা– এসব কিছুরই ইঙ্গিত ও আবহ সৃষ্টি হয়েছে গল্পের প্রথম স্তবকে লেখকের কবিত্বময় আবেগঘন বর্ণনায়। এখানে লেখক চরিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ায় বক্তব্য হয়েছে বাস্তব ও মর্মস্পর্শী। গল্পের প্রথম স্তবকের কিছু অংশ উদ্বৃত হলো:

> এই মনোরম মনোটোনাস শহরে অনেকদিন পর আজ সুন্দর বৃষ্টি হলো। ... আমার জানালায় রোদন রূপসী বৃষ্টির মাতাল মিউজিক, পাতাবাহারের ভিজে গন্ধভরা সারি, বিষাদবর্ণ দেওয়াল, অনেকদিন পর আজ আমার ভারি ভালো লাগছে। ছমছম করা এই রাত্রি, আমারি জন্যে তৈরি এরকম লোনলী-লগ্ন আমি কতোদিন পাইনি, কতোকাল, কোনোদিন নয়, বৃষ্টিবুনোট এইসব রাতে আমার ঘুম আসেনা, বৃষ্টিকে ভারি অন্যরকম মনে হয়, বৃষ্টি একজন অচীন দীর্ঘশ্বাস। এই সব রাতে কিছু পড়তে পারি না আমি ... আমার খারাপ লাগলো, আজ আমার একটুও ঘুম হবে না। আম্মার ঘরে কি যেনো ফেলে এসেছি।[২]

অন্য ঘরে অন্য স্বর গল্পগ্রন্থের সব গল্পের শিল্পরূপ আলোচনায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহ *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*-১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা ২০০৩, গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

গল্পে বারবার আলো-আঁধারির আবহ সৃষ্টি করেছেন লেখক রঞ্জুর অবচেতন মনের অর্গল খুলতে। বাস্তব এই আলো-আঁধারির পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে লেখক চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তন এবং অতিবাস্তব দৃশ্যের দিকে অগ্রসর হন। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি কারও সর্বনাশের খবর ছড়িয়ে চলে যাওয়ার পর--

> কেমন হতাশ চিত্তে ও বাইরে এসে দাঁড়ালো। ঘর থেকে নীল আলোর একটু খানি এখানে এসে পড়েছে; আকাশে কালো মেঘ, কিন্তু বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, গাছপালায় ভিজে অন্ধকার ছিপছিপে ছড়ানো; এই আলো ও আঁধারিতে, এই নীরব নিসর্গে ছমছম ভয় করে আমার।...[৩]

এরপরই রঞ্জু ক্রমশ এগিয়ে যায় মৃত্যুচিহ্ন চিহ্নিত অতিবাস্তব দৃশ্যের দিকে। তৈরি হয় রঞ্জুর মর্মান্তিক মৃত্যুর আবহপট। রঞ্জুর স্মৃতিময় শৈশবের আনন্দ-পরিবেশ, বর্তমানের ফাঁস লাগানো পরিস্থিতি তাকে নিয়ে যায় স্বপ্ন শেষের বাস্তবতায়। রঞ্জু এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে–

> ম্লানআলো বাল্বের অইটুকু ছায়ায় রঞ্জু দেখতে পেলো, নিশ্চিন্তপুরের সময়-কাঁদা নির্লিপ্ত মাঠে, দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। ছোটো ছোটো ছায়া ফেলে দুর্গার সঙ্গে রঞ্জু রেললাইন দেখতে কতোদূরে পাড়ি দিচ্ছে। দুর্গা সিঁদুরের কৌটো চুরি করে তাকের ওপর লুকিয়ে রেখেছিলো বলে রঞ্জুর বড্ডো মন খারাপ করে। 'দিদি, তুই সিঁদুরের কৌটা চুরি করলি কেন? [৪]

সমস্ত গল্পজুড়েই শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ করেছেন ইলিয়াস। সমকালের শোষণ নির্মমতা, স্তব্ধতা, শৃঙ্খলা বোঝাতে 'অন্ধকার' ও 'জল' এই দুই প্রতীকের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় গল্পে:

> ১. ওর এখন একটু তেষ্টা পেয়েছে; জিভ দিয়ে ঠোঁট বুলোতে বুলোতে রঞ্জু শুনতে পায়, নদীর অনিকেত জলে পাগল ঢেউয়েরা জন্ম নিচ্ছে কেবলমাত্র মরবার জন্য।[৫]
>
> ২. আমার বুকের মধ্যে, কালো, অন্ধকার ও ভারী কোনো নিরাকার নিশ্বাস স্থায়ী আশ্রয় নিয়েছে।[৬]

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২০
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে লেখক রঞ্জুর মৃত্যুর প্রসঙ্গকে উপস্থাপন করেছেন ভিন্নমাত্রায়। ইলিয়াস নিজেই তা বলেছেন পরবর্তীকালে। 'গল্পটায় ছেলেটার যে প্রবলেম সেটা অনেকটা একরৈখিক। গল্পটা বেশ রোম্যান্টিক। ছেলেটার যে এক ধরনের আত্মহত্যা, সেটাও খুব মিষ্টি করে দেখানো হয়েছে।[৭] সে কারণে অনুপ্রাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষারও যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লেখক; যা ইলিয়াসের কবিত্বশক্তির পরিচয়বাহী শব্দানুপ্রাসের সচেতন সৃষ্টি গল্পের বিষয়কে পেলবতা দিয়েছে। যেমন: 'মনোরম মনোটোনাস', 'রোদনরূপসী', 'মাতাল মিউজিক', 'লোনলী-লগ্ন', 'বৃষ্টি বুনোট', 'রিক্ত রক্তাক্ত', 'লবন লালে', 'নীরব নিসর্গ' প্রভৃতি। উৎপ্রেক্ষারও চমৎকার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ইলিয়াস এ গল্পে। পরিণাম নির্দেশক এসব উৎপ্রেক্ষা গল্পের শৈল্পিক উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রেখেছে:

> মলিন নদীতে দুঃখী চাঁদ ফ্যাকাশে জ্যোৎস্না ঢেলে দিলো, আধারে নিসর্গ হয়ে উঠলো মূর্তি; নদীর শীর্ণ সুবাস, জলের অন্তর্বাস থেকে উঠে আসা নিরেট ভারী গন্ধের মধ্যে অকাললুপ্ত হয়ে গেলো, আমার কেমন লাগতো [৮]

পরাবাস্তব ভাবনাসমৃদ্ধ এ গল্পে ইলিয়াস রঞ্জুর অতীত ও বর্তমান জীবনের আত্মভাবনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন এক বিন্দুতে। ইলিয়াস পরবর্তীকালে ছোটগল্পের এ শিল্পভাবনা থেকে সরে আসেন। গল্পের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে তিনি ব্যবহার করেছেন নির্মোহ নিরাবেগ দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষা।

উৎসব

অন্য ঘরে অন্য স্বর গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'উৎসব'। এই গল্প থেকেই বদলে যায় ইলিয়াসের শৈল্পিক পরিচর্যার ধরন, ভাষাগত প্রয়োগ ও শিল্পচেতনা। এ গল্পেই তিনি তৈরি করতে সক্ষম হন 'নিজস্ব স্টাইল'। আর রোম্যান্টিকতা নয়, মনোযোগ দেন জীবনঘনিষ্ঠ রূঢ় বাস্তব জগতের চিত্রাঙ্কনে। এ গল্পের প্রধান চরিত্র পুরান ঢাকার বাসিন্দা নিম্নমধ্যবিত্ত আনোয়ার আলী যোগ দেন ধানমন্ডির বড়লোক বন্ধু কাইয়ুমের বৌভাতের উৎসবে। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিলাসব্যসন, কুলীন কলরব ও সুন্দরী মেয়ে দেখে তার ভালো সময় কাটে। এই রেশ কিছুদিন বয়ে বেড়ানোর প্রবল ইচ্ছা হয় আনোয়ারের। কিন্তু বাড়ি ফিরেই কিছুক্ষণ পরে রাস্তার মোড়ের কুকুররতির উৎসবের হল্লায় তার সেই রেশ কেটে যায়। ফিরে যায় বাস্তবে। লেখক এ গল্পে

---

[৭]. শাহাদুজ্জামান, কথা পরম্পরা, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৬৭

[৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ২০

জীবনের নগ্ন ও কুৎসিত বাস্তবতা ও চারপাশের ছবি তুলে ধরেছেন। অভিজাত ও দরিদ্র শ্রেণির সঙ্গে নিম্নবিত্তের তুলনা-প্রতিতুলনায় তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষের ব্যবহার করেছেন গল্পে। উৎসব থেকে ফেরার পথেই আনোয়ারের মেজাজ খানিকটা বিগড়ে যায় নিজেদের সরু গলিতে প্রবেশ করে। পুরান ঢাকার মানুষ ও কুকুরের স্বভাব, ক্রিয়াকর্ম, পরিবেশ, প্রতিবেশই বলে দেয় ধানমন্ডির সঙ্গে তাদের মেরুযোজন দূরত্বের কথা। বিষয়টি উপস্থাপনে ইলিয়াস উপমা অলঙ্কারের চমৎকার প্রয়োগ করেছেন:

> ১. ধানমন্ডির রাস্তা সবই চওড়া মসৃণ, নোতুন টাটকা। দুধেল আলোর নিচে গা এলিয়ে তারা আলো পোহায়, শুয়ে শুয়ে দ্যাখে, মাথার ওপর অনন্তকাল বিরাজ করছে রহস্যময় মহাশূন্য। ... কুকুর কি আর ওদিকে নেই। ওদিকেও আছে। বিয়ে বাড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন। কি গম্ভীর তার মুখ, কি তার চেহারা। কি ডাঁটে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছিলেন মৃদু মৃদু। মনে হয় বাংলা ফিল্মের জমিদার বাবু দোতলার ব্যালকনিতে ডেক চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে সূর্যাস্ত উপভোগ করছে।[৯]
>
> ২. পুরান ঢাকার 'গলির নালায় হলদে রঙের ঘন জল ল্যাম্পোস্টের ফ্যাকাশে আলোতে ঘোলাটে চোখে নির্লিপ্ত তাকিয়ে থাকে। নালার তীরে কুকুর ও মানুষের অপকর্ম কুন্ডলি পাকিয়ে ঘুমায়। আর আর এসব লোকজন! পাড়ার অধিবাসীরাও তার বিরক্তির একটি কারণ। ... আর দ্যাখো, পাড়ার কুত্তার বাচ্চাদের একবার দ্যাখো! সবগুলো শালা নেড়ি, গায়ে লোম নেই এক ফোটা, শরীর ভরা ঘা নিয়ে কেবল কুঁই কুঁই গোঙায়। একেকটা আবার কোনো ছোটলোকের বাচ্চার মতো যা তা খেয়ে ধ্যাবড়া মোটা হয়েছে, তাকিয়ে থাকে ভাবলেশহীন চোখে, ল্যাম্পোস্ট পেলেই ছিরছির পেচ্ছাব করে।[১০]

'উৎসব' গল্পের বর্ণনভঙ্গিতে অনেক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ইলিয়াস। গতানুগতিক চিত্রায়ণ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নির্মম বাস্তবতা বোঝাতে লেখক মানুষ ও কুকুরকে 'একই স্তরে' নামিয়ে এনেছেন। কুকুর ও মানুষের যৌন ক্রিয়ারও পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়েছেন এ গল্পে। ধানমন্ডির বিয়েবাড়ির উৎসবের ভালো ভালো স্মৃতি নিয়ে বাড়ি ফিরে আনোয়ার আলীর কাছে নিজের স্ত্রী সালেহাকে মনে হয় 'আনস্মার্ট জবুথবু'। স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় কোনো আগ্রহ খুঁজে পায় না সে; উত্তেজনা ও শিহরণে ঘাটতি পড়ে। সেই সময় সরু গলির মুখে মধ্যরাতের কোলাহলে রাস্তায় বেরিয়ে কুকুরের রতিদৃশ্য উপভোগের পর সে

---

[৯]. প্রাগুক্ত, পৃ.২২, ২৩

[১০]. প্রাগুক্ত, পৃ.২২, ২৩

নিজের শরীরের শিহরণ পুনরায় ফিরে পায়। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের ভাষায় : 'মধ্যবিত্ত সঙ্কীর্ণ জীবনকে তিনি জুতাপেটা করেছেন'[১১] এ গল্পে।

হিউমার ব্যবহারের অসাধারণ সহজাত শক্তি ছিল ইলিয়াসের। জীবনের অসঙ্গতি রূপায়ণে তিনি হিউমারের প্রয়োগ করেছেন। হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেন মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা ও বিভ্রান্তি। ধানমন্ডির শিকড়বিচ্ছিন্ন ধনগর্বী মধ্যবিত্তের মেকি অথচ চাকচিক্যময় জৌলুশ উপস্থাপনে লেখক হিউমারের প্রয়োগ করেছেন। ধানমন্ডির প্রাসাদে–

> কোয়ার্টার ডজন, হাফ ডজন রূপসী অন্য কোনো ভাষায় বাক্যালাপ করে। এই সেতারে মালকোষ ধরলো কি হাই তুলতে তুলতে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে মন্থর আঙুলে। মুনতাসির কি ইশতিয়াক কি আহরার এলে কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এল. পি চালিয়ে দিয়ে সোস্যালিজম সম্বন্ধে গল্প করছে কি নরম গলায়। আবার এরই ফাঁকে ফাঁকে সময় করে লোনলিনেসে কি মিষ্টি কষ্ট পায়। তখন আর উপায় থাকে না, পুরো দুটো ঘন্টা এয়ার কন্ডিশনের ওপর ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে ডিউক এলিংটন শোনে।[১২]

ভাষা বিন্যাসেও লেখক হিউমার প্রয়োগ করেছেন। কাইয়ুমের বন্ধু ইকবালের পাঞ্জাবি স্ত্রীর বাংলা সংলাপ নিম্নরূপ :

> আচ্ছা! আপনারা কি য়েক সোঙে স্কুলে পোঢ়তেন? [১৩]

পুরান ঢাকা ও ধানমন্ডির ভাষা ব্যবহারে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এ গল্পে। উচ্চ মধ্যবিত্তের ইংরেজি ও বাংলা মিশ্রিত সংলাপ শোনা যায় কাইয়ুম, তার বন্ধু ইকবাল, হাফিজ ও পারভেজের মুখে। কাইয়ুম বলে:

> ... আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়তাম। উই সাবস্ক্রাইবড টু দ্য সেম পলিটিক্যাল ভিউজ। কলেজে খুব পলিটিক্স করতাম।[১৪]

---

[১১]. হাসান আজিজুল হক, কথাসাহিত্যের কথকতা, সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১০৫

[১২]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা ২০০৩, পৃ.২২, ২৩

[১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[১৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

অন্যদিকে পুরান ঢাকার বাসিন্দাদের যথাযথ প্রতিবেশ নির্মাণে এবং প্রতিবেশানুগ সংলাপ সৃজনে তিনি সফলতার পরিচয় রেখেছেন। রাস্তার মোড়ের কুকুররতির বায়োস্কোপ উৎসবে মাতোয়ারা জনতাকে উদ্দেশ করে নসরুল্লাহ সর্দার বলেন :

> শুয়োরের বাচ্চাগো কারবারটা দ্যাহেন। হালার বেশরম বেলাহাজ মানুষ, কি কই এ্যাগো কন? মহল্লার মইদ্যে কতো শরীফ আদমী, ঘরে বিবি বাল-বাচ্চা আছে, আর দ্যাখছেন খানকির পুতেরা কি মজাক করতাছে রাইত একটার সময়? দ্যাখছেন? [১৫]

মধ্যবিত্তের আপসকামী ভণ্ড চরিত্র, পানসে আবেগ, তুলতুলে মধ্যবিত্ত আরাম আয়েশ প্রভৃতি বিষয়কে ইলিয়াস খুলে দেখানোর পথে হাঁটেন ক্রমশ। বদলে যেতে থাকে গল্পের ভাষা ও পরিচর্যা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রও উপস্থাপিত হয় তাঁর ছোটগল্পে। ইলিয়াসের ক্রোধ প্রকাশিত হয়ে পড়ে ভাষা ও বর্ণনায়।

প্রতিশোধ

অন্য ঘরে অন্য স্বর গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'প্রতিশোধ'। এ গল্পে মূলত মধ্যবিত্ত যুবক ও ওসমানের মানসিকতা, বোনের হত্যাকারী ভগ্নিপতি আবুল হাশেমকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণের ফাঁকা আস্ফালন ও নানা পরিকল্পনার ব্যর্থতাকে তুলে ধরার পাশাপাশি সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়কেও সংযুক্ত করেছেন পটভূমিতে। গল্পের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ। স্বল্প কথায় ইলিয়াস যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশের খণ্ডচিত্র নির্মাণে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পে মানুষের উদ্বেগ ও শঙ্কার চিত্রায়ণ ঘটেছে একই সঙ্গে। ট্রেন স্টেশনে সমবেত যাত্রীদের চিন্তায় ধরা পড়ে –

> জিনিসপত্রের দাম কি ভীষণভাবে বেড়ে যাচ্ছে; প্রত্যেকটা দিনই কোথাও না কোথাও ব্যাঙ্ক লুট হচ্ছে; ঢাকার কোনো সিনেমা হলে ভালো ছবি চলছে না; কলকাতার ছরি আসে না কেন? ফরমান আলি নিয়াজীর ফাঁসি হওয়া উচিত; ঢাকায় সিমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না; ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা অধঃপতনে যাচ্ছে...পাকিস্তানী সেনাবাহিনী দেশজুড়ে সমস্ত পুল, ব্রীজ, রাস্তা বাড়ি ধ্বংস করে দিলো, সিমেন্ট না পেলে এসব ঠিকঠাক হবে কি করে? [১৬]

---

[১৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
[১৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

ওসমান এসব অতিক্রম করে অসুস্থ বাবাকে দেখতে বাড়ি পৌঁছলে উন্মোচিত হয় গল্পের মূল প্রেক্ষাপট। গোসল করতে বাথরুমে ঢুকেই দেখতে সে পায় দামি দামি বিদেশি সব প্রসাধনসামগ্রী। এসব যোগে গোসল সারলেও ওসমানের মনে হয় 'ঠিক ফ্রেশ লাগছে না'। লেখক ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন ওসমানের অন্তর্গত অতৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যহীনতার কথা।

লেখক এ গল্পে পরাবাস্তব পরিচর্যার প্রয়োগ করেছেন ওসমান চরিত্রের ব্যর্থতা ও ব্যর্থতাজাত মানসিক অসংলগ্নতা বোঝাতে। বোনের হত্যাকারী বলে বিবেচিত আবুল হাশেমকে সে তিনবার তিনভাবে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু পরিকল্পনা কোনো কার্যকর পদক্ষেপে পৌঁছায় না, বরং ওসমানই ডুবতে থাকে নিজের পরিকল্পিত সেসব হত্যাদৃশ্যে।

> ছাদের এই তীরে দাঁড়ালে শুরকির স্তূপের পাশে উঠানকে মনে হয় উঁচু পাড়ওয়ালা পুকুর। এখান থেকে আবুল হাশেমকে ধাক্কা দিয়েও ফেলে দেওয়া যায়। আবুল হাশেম তাহলে ঠিক সুরকির স্তূপের ওপর পড়বে, সুরকির হৃৎপিন্ড স্পর্শ করবে বলে আবুল ওর ফর্সা, মোটাসোটা এতো বড় শরীর নিয়ে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হবে। আবুল হাশেমের এতো বড় শরীরটা পাতালমুখী নামে আর ওসমানের ছমছম ভয় করতে শুরু করে। কেবল এই ভয়ে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকার ফলেও ওর নিজের পা জোড়া কখন আটকে গেছে চোরাবালির মধ্যে, বেচারা খেয়ালই করতে পারেনি। আস্তে আস্তে ডুবে যায় ওর সমস্ত শরীর। ওপরে তাকালে দ্যাখা যায় একটি মাত্র চাঁদ, সেও আবার তাকিয়ে রয়েছে অন্যদিকে।[১৭]

ওসমানের ছোট ভাই আনিস মুক্তিযোদ্ধার সুবিধা নিয়ে অর্থসম্পদ বাগানোর ব্যাপারে আবুল হাশেমের একনিষ্ঠ অনুসারী। দুপুরে সে হাশেমকে বোনের হত্যাকারী বলে শনাক্ত করে বারবার খুন করার সংকল্প ঘোষণা করে। আবার রাতেই ঘোড়াশাল-টঙ্গী ট্রান্সমিশন লাইন তৈরির টেন্ডার ধরার ব্যাপারে পিতার সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছায়। আনিস হয়ে ওঠে হাশেমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই হাশেম ও আনিসের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ের বাস্তব ইতিহাস বর্ণনায় ইলিয়াসের শ্লেষ নতুন এক মাত্রা পেয়েছে গল্পে। ধন ও ক্ষমতালোভী আবুল হাশেমের ও আনিসের মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্রিয়াকর্মের বর্ণনায় লেখক যে প্রতিতুলনা দেন তা অভিনব ও নির্মম। কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের ৮-৯ মাস আবুল হাশেম ও নার্গিসের সঙ্গেই কাটায় আনিস।

---

[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

> আবুল হাশেমের কল্যাণে আনিস কটা মাস প্রতিবাদ সভা ও শোক সভায় যোগদান করে, এখানে কটা মাস লাঞ্চ ডিনার মেরে ও লাঞ্ছিত মাতৃভূমির জন্য নিবেদিত অশ্রুর সঙ্গে পাঞ্চ করা হুইস্কি জিনের স্বাদে আপ্লুত হয়ে দেশে ফিরলো বিজয়ীর বেশে।[১৮]

ওসমানের মনোকল্পনাবিলাসী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অসহায়ত্ব ও অক্ষমতাকে বোঝাতে লেখক স্বপ্ন দৃশ্যের যে বর্ণনা দেন গল্পের প্রথমাংশে তা হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনা সৃষ্টিকারী ও গল্পের পরিণাম নির্দেশক।

> স্বপ্নের ভেতরে ওসমান মই দিয়ে অনেকটা ওপরে উঠে যায়, আর কয়েকটা ধাপ কোনো রকমে ম্যানেজ করতে পারলেই একেবারে চূড়া স্পর্শ করা যাবে। কিন্তু উঠতে উঠতেই হঠাৎ পা হড়কে পড়ে যায়। পড়তে পড়তে দ্যাখে নিচে মেঘনার পাতালমুখী কালো জল কেবলি নিচে গড়িয়ে পড়ছে।[১৯]

লেখক জানিয়ে দেন 'স্বপ্নেও না বাস্তবেও না, ওসমান কোনখানেই সাঁতার জানে না।'

'প্রতিশোধ' গল্পের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মধ্যবিত্তের ভাষা, ইংরেজি বাংলা মিশ্রিত শব্দের সংলাপ ব্যবহার করেছেন লেখক। 'উৎসব' গল্পে মেকি চাকচিক্যময় জীবনের যে ছবি ফুটে উঠেছে আনিসের যাত্রাও সে দিকেই। আনিসের কৃত্রিম ভাষাভঙ্গিই তার উন্মূলিত জীবন-নির্দেশক।

> এই লোকটা, এই বেটা হলো নাম্বারি শয়তান। কি অডাসিটি দেখলে? আব্বা নেহায়েৎ সিক, আদারওয়াইজ আই-উড হাড গিভন দ্য বাগার এ থরো বিটিং[২০]

যোগাযোগ

'যোগাযোগ' গল্পে সন্তান ও মায়ের 'কমুনিকেশন ক্রাইসিস' আধুনিক সময়ের নিরিখে ব্যাখ্যা করেছেন ইলিয়াস। রোকেয়া ও তার সন্তানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও যোগাযোগ-বিচ্ছিন্নতার বিষয়টিকেই লেখক এখানে উপস্থাপন করেছেন। রোকেয়া তার বাবা সোলায়মানের সঙ্গে স্বরূপখালী যায়, তার বড় মামাকে দেখার জন্য। একমাত্র সন্তানকে লেখাপড়ার কারণে রেখে যান ননদ ও স্বামীর কাছে। খোকনকে ছেড়ে আসায় তার মনে

---

[১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১
[১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
[২০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধে। মাতৃহৃদয়ে জেগে ওঠে প্রবল বাৎসল্য রস। নিজের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেখেন মৃত মায়ের ছায়া; যা মনে করিয়ে দেয় খোকনের কথা। রোকেয়া স্বামী হান্নানের কাছ থেকেও তারবার্তা পায়; জানতে পারে দোতলার কার্নিশ থেকে পড়ে গেছে খোকন। তাকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। অতঃপর তিনি ফিরে যান ছেলের কাছে। মাতৃহৃদয়ের প্রবল ভালোবাসায় রোকেয়া ভাবেন:

> আমি তাড়াতাড়ি পোলার কাছে গিয়ে খাড়াইয়াতে পারলেই হ্যার ব্যাবাকটি বিষ মুইচ্ছা ফালাইতে পারতাম[২১]

বাস্তবে রোকেয়া খোকনের কষ্ট লাঘব করতে পারেনি। যোগাযোগ স্থাপন হয়নি মা ও সন্তানের।

এই গল্পটি পাঠকের মনে নানাবিধ ভাবনার উদ্রেক করে। লেখক এ প্রসঙ্গে জানান : 'যোগাযোগ গল্পটায় motherhood তো আছেই, আমি আরো একটি ব্যাপার ধরতে চাচ্ছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছিলাম একজন মা with her all affection, motherhood, বাৎসল্য একটা পর্যায়ে সব কষ্টলাঘব করতে পারে না। রোকেয়া তার ছেলের অসুস্থতার কথা শুনে ফিরছে। তার একটা অহঙ্কার যে সে থাকলে এমন হতো না, কিন্তু সে যখন পৌঁছাচ্ছে

তখন তার গায়ে ১০৩° জ্বর কম্বলের মতো জড়িয়ে। রোকেয়া হাত দিচ্ছে কিন্তু সে হাত ঐ

কম্বল ভেদ করে ছেলের কষ্টের কাছে পৌঁছাচ্ছে না ... ছেলে যখন বড় হতে থাকে তখন মায়ের সঙ্গে এ পর্যায়ে আর যোগাযোগ ঘটে না। ... তুমি তোমার Problem আর share করতে পারছো না। হয়তো তোমার প্রেমের সমস্যা বা কোনো philosophical crisis, দু'জনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা হয় না, এটা দু'জনের জন্যেই খুব বেদনাদায়ক। তবু এটাই সত্য।'[২২]

আধুনিক সমাজ বাস্তবতায় দেশকালাতিক্রমী, মনোবিজ্ঞানধর্মী এ সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতার পাঠ উপস্থাপনে ইলিয়াস ব্যবহার করেছেন আলাদা এক শিল্পমাত্রা। লেখকের ছোটগল্পে যে স্বভাবজাত হিউমার, শ্লেষ ও দৃঢ় নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান, নির্মম সমাজবাস্তবের উপস্থাপন, পুরান ঢাকার বাস্তবতায় স্ল্যাংয়ের প্রয়োগ দেখা যায়, সেসব থেকে এ গল্পটি মুক্ত।

---

[২১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[২২]. শাহাদুজ্জামান, কথা পরম্পরা, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৬৯

একটি সৌম্য-সুন্দর পারিবারিক আখ্যান বর্ণনার মাধ্যমে লেখক নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা করেছেন এখানে।

'যোগাযোগ' গল্পে 'টেলিপ্যাথি'র প্রয়োগ করেছেন লেখক। স্বপ্ন ও বাস্তবতার মিল, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অতিবাস্তব দৃশ্য অবলোকন ও তার সঙ্গে বাস্তবের সংযোগ গল্পে টেলিপ্যাথিক বাস্তবতা তৈরি করেছে।

গল্পের শুরুই হয়েছে স্বপ্নদৃশ্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। কয়েক বছর আগে মারা যাওয়া মায়ের উপস্থিতি ঘটে রোকেয়ার স্বপ্নে–

> রোকেয়া, অ রোকেয়া, আর কত ঘুমাইবি? কাইন্দা কাইন্দা পোলায় তর শ্বাস বন্দ হয়। উঠলি? অ রোকেয়া! [২৩]

ছেলেকে বাড়িতে রেখে মামার বাড়ি বেড়াতে যায় রোকেয়া। কিন্তু অবচেতন মনে ছেলের অমঙ্গল চিন্তার যে বীজ বোপিত হয়েছিল, তা আরো দৃঢ় হয় মায়ের স্বপ্নদর্শন ও উক্ত সংলাপে। রোকেয়ার মা সব সময়ই থেকে যায় রোকেয়ার সঙ্গে। স্বরূপখালী পৌঁছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সরলতায়, মামা-মামিদের আপ্যায়ন ও আদর ভালোবাসায় রোকেয়ার সময় দ্রুত কেটে যায়। কিন্তু কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকে ছেলের অমঙ্গল চিন্তা। মামার বাড়ির পেছনে পুকুরপাড়ে বাঁশঝাড় ও সজনে গাছের ছায়ায় একদিন সন্ধ্যাবেলায় রোকেয়া আবার তার মায়ের ছায়া দেখে। তার মা খোকনের শারীরিক অসুস্থতার ব্যাপারে আগাম সংকেত দেয়।

> একদিন সন্ধ্যায় রোকেয়া পুকুরপাড় থেকে ফিরছে, বাঁশঝাড়ে তখনো পৌঁছায়নি। ... হঠাৎ দ্যাখে অন্যদিক থেকে সাদা শাড়ি পরা অল্প বয়সী একটি মেয়ে বেগুনখেত পার হয়ে বাঁশঝাড়ের পথ ধরলো। রোকেয়ার বুকের মধ্যে শিরশির করে ওঠে। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। বাঁশঝাড়ে চাঁদের ময়লা রঙ আলো। বাঁশঝাড় পার হয়েও মেয়েটা একটুও থামে না। এ কে ? খুব কাছাকাছি চলে এলে রোকেয়া শুনলো মেয়েটা বলছে, 'রোকেয়া

---

[২৩]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা ২০০৩ , পৃ. ৪৭

তর পোলায় কেমুন আছে?' মায়ের কণ্ঠস্বরে খুব চমকে উঠে ও তখন চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখে। না, কোথাও কেউ নেই।[২৪]

অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের এই আগাম সংকেত ও বাস্তব অবস্থায় খোকনের দুর্ঘটনা এক বিন্দুতে মিলে যায়।

লেখক 'যোগাযোগ' গল্পে রোকেয়ার মনস্তত্ত্বের বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন মনো-ডায়ালগ ও আলো-আঁধারি পরিবেশ। রোকেয়ার ভাবনাকাতর মনোচারিতা, স্বপ্নাচ্ছন্ন ও কল্পনাপ্রবণ অতিপ্রাকৃতের শিহরণময় আলো-আঁধারির অস্পষ্ট পরিবেশ নির্মাণে গল্পকার বিস্ময়কর সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। সমস্ত গল্পেই রোকেয়া প্রায় সংলাপহীন। হাসপাতালে দুএকটা সংলাপ ও খোকনের কপালে হাত বোলানো ছাড়া তার তেমন কোনো সংলাপ চোখে পড়ে না। বরং গল্পকার মনোচারী রোকেয়ার মনোজগতের আনন্দ-বেদনা ও বিষাদের বর্ণনায় প্রকৃতির বর্ণিল চিত্র অঙ্কন করেছেন। ঢাকা শহরের ইট পাথর ঘেরা পরিবেশ অতিক্রম করে রোকেয়া ও তার বাবা যখন স্বরূপখালী স্টেশনে পৌঁছে, তখন যে সীমাহীন আনন্দ হয় রোকেয়ার, তার অপূর্ব ও আবেগঘন বর্ণনা দেন লেখক–

....মামাবাড়ি পৌঁছবার আগেই, স্বরূপখালী স্টেশনে নেমে যখন নৌকায় ওঠে তারো আগে থেকে শৈশবের অল্প অল্প চেনা গোরুবাছুর, সবুজ ও ধূসর গাছপালা, ন্যাংটাকালো রাখাল বালক, পুকুরপাড়ে পচা ঘাসের ঘন সুবাস, খড়ের হলদে গাদা গেরস্থ বাড়ির ঈশানকোলে গোয়ালঘরের গন্ধ, হাল্কা মিষ্টি গন্ধের খোলা সাদা রোদ– কতোকাল পর এদের দ্যাখা পেয়ে রোকেয়ার সমস্ত বুক পিঠ, মুখ চোখ কানায় কানায় ভরে গিয়েছিলো।[২৫]

আবার খোকনের অসুস্থতার খবরে রোকেয়ার বিষাদাক্রান্ত মনোজগৎ উন্মোচনেও লেখক ব্যবহার করেছেন প্রকৃতির বিষাদময় চিত্র:

আকাশ এখন বেশ স্পষ্ট। গোলাপী রঙের, নীলরঙের; ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু বেশ স্পষ্ট : সবুজ চোখের মাথায় একটি সাদা মনি; টেলিগ্রাফের তারের রেখা বেশ স্পষ্ট: শিশিরে ধুয়ে খুব ধারালো ও নির্লিপ্ত এই একটু সবুজ, একটু কালো মাঠে, রোদের নীচে,

---

[২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

[২৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০

শিশিরের নিচে, চাপড়া ঘাসেরও নিচে একটা নোতুন কবর, টাটকা শোকে উঁচু। কার কবর? রোকেয়ার চোখের সামনে কোটি কোটি ছোটো বিন্দু শূন্যে ভাসতে থাকে।[২৬]

ফেরারী

'ফেরারী' গল্পে ইলিয়াস গতিময় এক টেকনিক প্রয়োগ করেছেন। পুরান ঢাকার বাসিন্দা হানিফের অবিরাম ছুটে চলার মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে এ গল্পের আখ্যান। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের সমাজজীবনের অবক্ষয়চিত্রের পাশাপাশি পুরান ঢাকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, তাদের ইতিহাস ও ভূগোলসহ বিচিত্র মনোজগৎ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই গল্পে।

হানিফ 'ফেরারী' গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হলেও ইব্রাহিম ওস্তাগরের যৌবনকাল ও বার্ধক্যও গুরুত্বপূর্ণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। যৌবনকালে গাড়ি চালানোর পাশাপাশি জিন পরি দর্শন ও সিনেমা দেখার যে অভিজ্ঞতা ইব্রাহিম অর্জন করে, বার্ধক্যেও তার স্মৃতিকাতর মনে সেসব ছায়া ফেলে। স্মৃতিকাতর ও বিকৃতমনস্ক ইব্রাহিম ওস্তাগারের মৃত্যু দশার বর্ণনা ও হানিফের গন্তব্যহীন ছুটে চলার মধ্য দিয়ে লেখক বর্ণনা করেছেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুরান ঢাকার ঐতিহ্য ও ভূগোল।

ডামলালু ও তার সহযোগী সালাউদ্দিন, আহসানউল্লা ছিনতাই রাহাজানি করে জীবন চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এই ছিনতাই রাহাজানিতে অংশ নেয়; নারীদের শ্লীলতাহানি করে। হানিফ একবার সুযোগ পায় ডামলালুর ছিনতাই অভিযানের সহযোগী হওয়ার। কিন্তু সে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ছিটকে পড়ে এই লাইন থেকে। বাবার অপূর্বদর্শন সেই মোহময় বাস্তবাতীত অভিজ্ঞতা, যা সে বহুবার শুনেছে, তারও দর্শন পায় না। বাবা মারা যাওয়ার পর বেকার যুবক হানিফের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত জরাজীর্ণ ও দরিদ্র জীবন অপেক্ষা থানাকেই নিরাপদ আশ্রয় মনে হয়। ছুটে চলে সে দিকেই। এক্ষেত্রেও তার আশঙ্কা, সূত্রাপুর থানার পুলিশ তাকে ডামলালুর পার্টির মাস্তান মেনে নিয়ে থানায় আটকে রাখবে কি না।

'ফেরারী' গল্পের শৈলী বিশ্লেষণ সম্পর্কে কথা শিল্পী হাসান আজিজুল হক মনে করেন, 'ফেরারী গল্পে দেখেছি, নিখুঁত চমৎকার, ভয়াবহ বাস্তব বর্ণনার নিজস্ব টানে লেখক ভেসে যাচ্ছে। মুমূর্ষ ইব্রাহিমের জন্যে ডাক্তারের খোঁজে হানিফ এসেছে– গল্পের এই শুরুর

---

[২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

পরেই চিত্রের পর চিত্র দেখতে পাই। ডামলালুরা, ডামলালু গুন্ডার সঙ্গে হানিফের এক সন্ধ্যের অভিজ্ঞতা– এই সবই ছবি হিসেবে নিখুঁত কিন্তু গল্পের কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে গল্পন্যায়ে আবদ্ধ নয়।'[২৭]

ইলিয়াসের বরাবরই টান সবিস্তার বর্ণনার প্রতি। তবে এই রীতি গল্পের মূল পরিণতিকেই স্পষ্ট করেছে। 'ফেরারী' গল্পের দীর্ঘ পরিসর, উপকাহিনির সংযোজন ও বর্ণনার বিস্তার আপাত ক্লান্তিকর মনে হলেও গল্পের প্রধান চরিত্র হানিফের পরিণতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। ইব্রাহিম ওস্তাগারের স্বপ্ন ও মতিভ্রমে পাওয়া জিন পরি কবন্ধের রোমাঞ্চকর প্রবাহের সঙ্গে হানিফ যুক্ত থাকে উত্তরাধিকারসূত্রে। ইলিয়াস সে জন্যই ইব্রাহিমের যৌবনে দেখা জিন পরি সমাচারের বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন গল্পে:

> 'উনিশ বছর বয়সের ইব্রাহিমকে মনে পড়ে যাওয়ায় হানিফের চোখ, মুখ, গলা, কান, নাক, কপাল, এমনকি করোটি ও চুলেও ঝির ঝির হাওয়া বইতে শুরু করে। ... কানের পেছন দিকে ঠান্ডা হাওয়া ধাক্কা দিলে ওপরে তাকিয়ে দ্যাখে, লোহার পুলের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জের ঝরঝরে বাস; পেছনে ঘোড়ার গাড়ির ছাদে চাকুর রাখতে উঠে বসছে ইব্রাহিম। শাহজাদীকে রেলিঙের পাশে ফেলে রেখে ঘোড়া দুটো ছুটতে শুরু করলো, ইব্রাহিম পেছনে তাকাচ্ছে, ঘোড়ার গাড়ি গড়িয়ে চলে যাচ্ছে কেশব ব্যানার্জী রোডের দিকে। কিন্তু লোহার রেলিঙ ধরে খালের জলে ছায়াও আগুন ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে শাহজাদী। কবন্ধ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলতে গেলে তার হাত ছুটে রেলিঙে গড়িয়ে শাহজাদী পড়ে গেলো দোলাইখালের ঘোলা জলে। সেখানে হানিফ ও হানিফের সমবয়স্ক ইব্রাহিম দিনমান শুধু সাঁতার কাটে।[২৮]

বাবার মৃত্যুতে হানিফ থাকা খাওয়ার সংস্থান হারায়। পাশাপাশি বাবার রোমাঞ্চকর জিন পরির আখ্যান দর্শনও হারায়। অন্যদিকে ডামলালুর সহযোগী হওয়ার ক্ষেত্রেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। সবদিক থেকেই হয়ে পড়ে নিরালম্ব। বারবার পাক খেতে থাকে পুরান ঢাকার গলি ঘুপচির মধ্যে। বৃত্তাবদ্ধ এ জীবন অতিক্রমণের জন্যই হানিফের অবিরাম ছুটে চলা। সেই জীবন ও অবিরাম ছুটে চলার গতিকে দর্শন-অভিজ্ঞতায় পরিশ্রুত করতেই ইলিয়াস গল্পে তুলে ধরেছেন পুরান ঢাকার অলিগলি, দোকানপাঠ, সাইনবোর্ডসহ তার বিবরণ।

---

[২৭]. হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ, লিরিক, চট্টগ্রাম, ১৯৯২, পৃ. ১০২

[২৮]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ৭৩-৭৪

সামনে : বঙ্গলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভান্ডার/এখানে খাঁটি দুধের ছানায় প্রস্তুত রসগোল্লা, অমৃতি, পান্তুয়া, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন পাওয়া যায়/পরীক্ষা প্রার্থনীয়/১১/বি/৩ সুভাষ বোস এভেনিউ/লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ১।' সাইনবোর্ডের ২ প্রান্তে ২ জন পরী মিষ্টান্নের থালা হাতে মুখোমুখি ওড়ে।...তারপর দি সানশাইন লন্ড্রী। ওয়ান ডে সার্ভিস/অটোমেটিক মেশিনে উত্তমরূপে কাপড় ধোলাই করা হয়। প্রো: মোছা: ছুপিয়া খাতুন/লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ১। বাংলাদেশ'... উল্টোদিকে সেন্ট গ্রেগরিস স্কুল; সেন্ট ফ্রান্সিসের কাছে ল্যাম্পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে ১টা মেয়ে কুকুর এদিক ওদিকে দেখছে। আরো একটু এগিয়ে গেলে ভিক্টোরিয়া পার্কের পেছনে বালির স্তুতপ। গোটা পার্ক ঘিরে রাত্রি কাটায় সারি সারি অতিকায় ট্রাক। পার্কের পেছনদিকের ফুটপাতে মানুষ, মেয়েমানুষ, কুকুর ও মেয়েকুকুরের অহিংস সহ-অবস্থান।[২৯]

গল্পের এই বিবরণধর্মিতা ছোটগল্পের 'কমপ্যাক্ট' ফর্মের সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ নয়। ইলিয়াস সেই শক্তিমান কথাশিল্পী, যিনি নিজের বক্তব্যের উপস্থাপন ও স্পষ্টকরণে সৃষ্টি করেন নিজস্ব নির্মাণশৈলী।

'ফেরারী' গল্পে ইলিয়াস ভাষা ব্যবহারে শক্তিমান কথাশিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। পুরান ঢাকার মানুষের মুখে দৈনন্দিন ব্যবহৃত বুলি প্রয়োগের সাথে সাথে তাদের কল্পনা ও কবিত্বের জগৎ উপস্থাপন করেছেন গল্পে। ইব্রাহিমের বন্ধু তার অসুস্থতার কথা শুনে হানিফকে বলে :

১. কাউলকা ফজরের নামাজ পইড়া ইনশাল্লা তগো বাড়ি যামু, ওস্তাগরের কইস[৩০]

২. নর্থব্রুক হল রোড দিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে এসে দ্যাখে 'চান্দের রোশনী ছাড়ছে, যেমুন হালায় নহরের পানি ছুটাইয়া দিছে বুঝলি? যেদিকে তাকানো যায়, জ্যোৎস্না, কেবল জ্যোৎস্না। আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র আলো করা জ্যোৎস্নায় ইব্রাহিম তার টাটকা একজোড়া চোখে কেবল লাল নীল হলুদ সবুজ গোলাপী ও অপরিচিত বিচিত্র সব নতুন রঙের আলোর স্রোত এবং আলোর ঢেউ দেখতে লাগলো।[৩১]

---

[২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫
[৩০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
[৩১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

এই গল্পে শ্লেষের প্রয়োগ করেছেন ইলিয়াস। ইব্রাহিম ওস্তাগরকে দেখতে আসা ৪০ টাকার ভিজিটের ও দুলাইন ডিগ্রিওয়ালা মেডিকেলের প্রফেসর ইব্রাহিম ওস্তাগরের ঘরটা দেখে অসন্তুষ্ট হয়। মন্তব্য করে 'ঘরটা বড়ো ড্যাম্প।' অমনি ইব্রাহিমের বড় ছেলে হান্নানের চাটুকারিতা, কুকুরে প্রভুভক্তির ন্যায় অবিরল ঝরে পড়ে–

> ইয়েস স্যার!' হান্নান সঙ্গে ওর জিভটাকে ল্যাজের মতো নাড়ে, 'বহুত পুরানা আমলের ঘরবাড়ি স্যর! ড্যাম্প স্যর! আনহাইজিনিক স্যর! [৩২]

অন্য ঘরে অন্য স্বর

'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পটির সংগঠন যেন ক্যামেরায় তোলা কয়েকটি পৃথক দৃশ্যের সমষ্টি। ছবিগুলো আলাদা আলাদা এবং স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে অসংলগ্ন। গল্পের শুরুতেই প্রদীপের পিসিমার গুনগুন করে গাওয়া গান 'আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও, নয়ন ভরিয়া দেখি' শুনে ঘুম ভাঙে। স্বপ্নঘোরে মনে হয়:

> শীতকালের জুড়িয়ে যাওয়া পদ্মা নদীতে কোন চরের কুলগাছ থেকে ঝরে পড়ছিলো আধাপাকা কুল। সেই শব্দে চোখ মেললে প্রদীপের ঘুমের পাতলা সরের ওপর টুপটাপ ঝরে পড়ে পিসীমার মৃদুস্বরে গাইতে থাকা গানের কথা[৩৩]

এ রকম বেশ কিছু দৃশ্য, স্বপ্ন, বাস্তব ও স্মৃতি মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর শোষণ, তাদের মর্মবেদনা, হাহাকার ও বন্দী জীবনের গল্পই 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'। গল্পের প্রধান চরিত্র প্রদীপ; কলকাতার ব্যবসায়ী। মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্য ভাইয়ের সঙ্গে প্রদীপও বাংলাদেশ ছাড়ে। ননী গোপাল ও তার পিসিমা থেকে যায় জন্মভিটা আঁকড়ে। জন্মভূমির প্রতি আবেগ- ভালোবাসায় যুদ্ধোত্তর বাস্তবতা ঢেলে দেয় যন্ত্রণার বিষ। ননীর দোকানে যা লাভ হয় তার অধিকাংশই চলে যায় রাজনৈতিক দলের লোকেদের চাঁদা দিতে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে চলে চাঁদা আদায়। ননী মেয়েকে কলেজে পাঠাতে পারে না পাতি মাস্তানদের ভয়ে। সংখ্যালঘু বলে নানা রকম ভয়ভীতি, শোষণ চলে তাদের পরিবারে। অন্য ভাইয়েরা কলকাতায় ব্যবসা করে সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দে জীবন পার

---

[৩২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
[৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

করছে। এমন বাস্তবতায় প্রদীপ ননীদার বাড়িতে এলে একে একে উন্মোচিত হয় এ গল্পের প্রেক্ষাপট।

১৮/১৯ বছরের দুই ছেলের সঙ্গে প্রদীপের দেখা হয় ননীদার দোকানে; যারা চাঁদা আদায় করতে এসেছে। এদের হাবভাব, পোশাক ও শাসানি, ননীর তোয়াজ সবই চোখে পড়ে প্রদীপের। চাঁদা আদায়ের এই সংস্কৃতি, শোষণের এই রাজনীতি সব জায়গায় একই রকম। শুধু রীতি কিছুটা আলাদা। ইলিয়াস চমৎকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বিষয়টি–

> কলকাতাতেও তো এরাই, এদেরই রাজত্ব ওখানে। তবে এখানে সবই বড়ো খোলাখুলি, কোনো রাখো ঢাকো নেই। এরাও অবশ্য শিখবে; একটু ভদ্রভাবে চুরি ডাকাতি করা, মানুষ মারা – এখানকার বাঙালিরাও শিখবে, একটা জেনারেশন অন্তত যাক, ঠিক শিখে নেবে।[৩৪]

পিসিমা ঘুমভাঙা প্রদীপের সঙ্গে বলে চলে তাদের পূর্ব প্রজন্মের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সেই বর্ণনায় ইলিয়াস চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও পরাবাস্তব পরিচর্যা। পরাবাস্তব বর্ণনায় পিসীমার ঘরের চিত্রায়ণ ঘটেছে এভাবে–

> একটানা গদ্যের গুঞ্জরণে প্রদীপ নিজেই একবার তার বাবার কোলে কখনো বা পিসীমার কোলে দোল খায়। এরকম একটানা দুলুনির ফলে চারদিকের রাত্রিকাল লুপ্ত হয়ে যায়। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শাল গ্রামশিলা পাহাড়ের স্মৃতিতে কাঁপে; ছোটো মঞ্চে অষ্টধাতুর রাধা শ্যাম নিজেদের অস্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে পরস্পরকে দ্যাখে। কৃষ্ণের দুষ্ট ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে আসে লুকানো হাসি।[৩৫]

প্রদীপের বাবার পরিশ্রম, জীবনসংগ্রাম, তাদের পরিবারের সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা, সুখ সমৃদ্ধির কথা, অতীত কথা শুনতে শুনতে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে শোনা তাদের বর্তমান দুর্দশার কথা ধাক্কা খায়। ননীদার স্ত্রীর মনোযন্ত্রণার কথা ও পিসিমার পারিবারিক ঐহিত্যের অতীত বর্ণনা প্রদীপকে নিয়ে যায় মগ্নচৈতন্যের গভীরে। যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় মনোজগৎ ও বাস্তব। তৈরি হয় নতুন নতুন দৃশ্যকল্প:

---

[৩৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[৩৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

> রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পিছনে রেখে পিসীমা এখন রামকৃষ্ণদেবের ছবি দেখছে। দেখতে দেখতে পিসীমার মুখ গলে গিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। মাংস কি জলে পরিণত হল? জল থেকে কি ধোঁয়া বেরুবে? [৩৬]

একটু পরেই ঘরের জায়গায় ঘর ফিরে আসে। রাধাকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণদেব মঞ্চে আসীন হয়, পিসিমাও ঠিক পিসি হয়। সমস্ত গল্পেই ইলিয়াস মগ্নচৈতন্যের প্রবাহে বাস্তব ও অতীতের সংক্রমণ, সংঘর্ষ, আক্রান্ত হওয়ার বিষয়কে তুলে ধরেছেন। এই টেকনিকই গল্পের পরিণতিকে এগিয়ে নিয়েছে।

বাস্তবের, বর্তমানের বাংলাদেশের যুবকদের যে অবক্ষয় ও যৌন অবদমন তার প্রতীক ননীদার ছেলে অমিত। যার বিছানার চাদরের তলে পাওয়া যায় পর্নোগ্রাফির ম্যাগাজিন। প্রদীপও দুইবার এই ম্যাগাজিনের কবলে পড়ে। মাস্টারবেশনের চর্চা চালাতে গেলে প্রজন্মের ঐতিহ্যগত শুদ্ধতার বোধ তাকে রক্ষা করে। গল্পটিতে অনুসৃত হয়েছে 'ফ্ল্যাশব্যাক' পদ্ধতি।

খোঁয়ারি

'খোঁয়ারি' আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মোট চারটি গল্প নিয়ে এ গ্রন্থ। 'খোঁয়ারি', 'অসুখ-বিসুখ', 'তারা বিবির মরদ পোলা' ও 'পিতৃবিয়োগ'। তিনি এ চারটি গল্পের সামাজিক প্রেক্ষাপট অঙ্কনের পাশাপাশি চরিত্রের অন্তর্দেশ অবলোকনের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন জীবনের গভীর সত্য ও বৈচিত্র্যকে।

খোঁয়ারি

'খোঁয়ারি' গল্পের আখ্যানরূপ উপন্যাসধর্মী। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি পরিবারের দুঃখ-যন্ত্রণা, অতীত-ঐহিত্য ও গৌরব, অপস্রিয়মাণ বর্তমান ও

---

[৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

ধর্ম-সংস্কৃতি, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মাস্তানদের দখলদারিত্বের মহোৎসব, ক্ষমতার দাপট– সব মিলিয়ে বৃহৎ এক ক্যানভাসে অঙ্কিত হয়েছে এ গল্প। বৃহৎ এ ক্যানভাসকে ইলিয়াস গল্পের কাঠামোয় শিল্পরূপ দিয়েছেন। হুইট, হিউমারের প্রয়োগ করেন দক্ষতার সাথে তিনি। গল্পের প্রধান চরিত্র সমরজিৎ। শুরুতেই এক শ বছর আগেরকার বৃহৎ আয়তনের সমরজিতের বাড়ির স্কেচ অঙ্কন করেন ইলিয়াস। বাদ যায় না সমরজিৎও, তার অবয়বেরও স্কেচ আঁকেন লেখক। সমরজিতের তামাটে মুখে উঁচু তীক্ষ্ণ নাক, মুখে পিচ-ওঠা সুকলাল দাস লেনের মতো ব্রণের দাগ ও বড়ো চোখের গভীর কোটর বলে দেয় এ বাড়ি ও এর মালিক উভয়ই বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু ও হতশ্রীদশাগ্রস্ত। সমরজিতের বাবা অমৃতলাল এ বাড়ির পুরোনো বাসিন্দা। বহুদিনের স্মৃতি ও নির্যাতনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সে এ বাড়িটি আঁকড়ে ধরে আছে। দেশভাগের পর দাঙ্গা, পঞ্চাশ ও চৌষট্টির দাঙ্গা, পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ– সব ঘটনাতেই অমৃতলালের বিশাল এ একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারটি নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশে সমরজিৎ ও অমৃতলালের নিজের বাড়িটি পরিণত হয়েছে খোঁয়ারিতে। সমরজিতের তিন বন্ধু ইফতেখার, ফারুক ও জাফর এক সাথে আসে এ বাড়ি দখলের বার্তা নিয়ে। বাড়িটিকে রাজনৈতিক অফিসে রূপান্তরিত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। রাজি না হওয়ায় সমরজিতের ওপর চলতে থাকে নানা হুমকি-ধামকি, চাপ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন।

প্রতীকের মাধ্যমে লেখক গল্পের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেছেন। একসময় সমরজিতদের বাড়িতে জীবনাচরণের ও আয়োজনের যে বিশালতা ও নিয়মকানুন ছিল, বর্তমানে তা জীর্ণশীর্ণ। তাদের জীবন যে খোঁয়ারিতে বন্দী, তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচরণেও তা প্রভাব ফেলেছে। এ বাড়িতে ঢুকতে জাফরদের পরপর তিনটে রান্নাঘর চোখে পড়ে। যেগুলোর কোনোটাতে আমিষ, কোনোটাতে ঠাকুরের ভোগ নিরামিষ হবিষ্যি রান্না হতো। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তান আর্মিরা এ বাড়ির সবকিছু নষ্ট করেছে। জাফরের প্রস্রাব পেলে, সমরজিৎ যা বলে তাতে এ বাড়ির দৈন্যদশার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> পেচ্ছাব করবেন? ঐখানে মাইরা দেন।[৩৭]

সমরজিতদের উচ্ছেদ হওয়ার, উন্মুলিত হওয়ার বেদনাবহ দিকটি লেখক প্রতীকায়িত করেন এভাবে–

---

[৩৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

> ঐখানে সারি সারি তিনটে ছোট ঘর। কোনোটারই ছাদ নেই, কেবল একেবারে বাঁদিকেরটার মাথায় টিনের ওপর হাঁট চাপা দিয়ে ছাদ তৈরি করা হয়েছে। সবগুলো ঘরের দেওয়ালে খিঁচিয়ে থাকা দাঁতের গোড়ায় ছ্যাতলার মতো হলুদ জ্যোৎস্না।[৩৮]

সমরজিৎদের পাকশালা এখন প্রস্রাবাখানা। ঠাকুরের ভোগ রান্নার ঘরে জাফরের প্রস্রাবের বর্ণনায় ইলিয়াস প্রয়োগ করেছেন করুণ অথচ কৌতুকাবহ চিত্র–

> জাফরের প্রস্রাবের বেগবান ধারা কোনো টিনের ওপর বৃষ্টিপাত ঘটায়। টিনের ওপর জল পড়ার টং টং ধ্বনিতে সমরজিতের দীর্ঘ সংলাপ বিভক্ত হয় পর্বে পর্বে[৩৯]

বাংলা কথাসাহিত্যে খোঁয়ারি এক ব্যতিক্রমী গল্প। 'ছোটগল্পের এক রৈখিকতা' ভাঙতে গল্প-বাস্তবতার উজান ডিঙিয়ে যুক্ত হয়েছে মনোবাস্তবের নানা চোরাস্রোত। সন্নিবেশিত হয়েছে ছোট ছোট উপগল্প। আপাতদৃষ্টে সেসব অপ্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত মনে হলেও ভাবকল্প ও স্থাপত্যকল্পের সুষম বিন্যাসের মতো অপরিহার্য শিল্প শর্তেই তা যুক্ত।

সমরজিতের মদ খেয়ে হ্যাংওভার হওয়া; হ্যাংওভার কাটাতে নিজের দোতলা ঘরের ইজিচেয়ারে বসে গাঁজার পুরিয়া বার করে স্টার সিগ্রেটের তামাক ফেলে দিয়ে খোলটার মধ্যে তা পুরতে পুরতে বিরক্তও হয়। এ বিরক্তির কারণ গাঁজার মূল্যবৃদ্ধি। আর গাঁজার সঙ্গে গাঁজার বিচির পরিমাণবৃদ্ধি। তাই সে বিক্রেতা অমূল্যের ওপর বিরক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে লেখক জানিয়ে দেন:

> এ রকম ফেলে-দেওয়া কোনো বিচি থেকে রজনীগন্ধার টবে এই গাঁজার গাছ গজিয়েছে। মাঝখান থেকে রজনীগন্ধার চারাটা মরে গেলো। এ গাজার চারাও কোনো কাজে আসবে না। জলটল দিয়ে এতো বড়ো করলো তো দ্যাখো শালার পাতায় পাতায় পোকা ধরে গেছে।[৪০]

---

[৩৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[৩৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

[৪০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

গল্পের শুরুতে লেখক 'পোকামাকড়' আক্রান্তের প্রসঙ্গটিকে যুক্ত করেন। সমরজিৎদের 'মাধবী লতার ঝাড়ে চড়ে বেড়ায় পোকামাকড়।' মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে যে মিথ্যা মুখোশওয়ালা দেশপ্রেমিক যুবশক্তি তাদের বাস্তব ভূমিকা উন্মোচনেই লেখক 'পোকামাকড়' বিশেষণটি যুক্ত করেছেন আখ্যানে। তবে সাধারণ পোকা ও নেশাগ্রস্ত পোকার দ্বৈত উপস্থিতি গল্পের সূচনা ও সমাপ্তিতে পরিণাম নির্দেশক এক শৈল্পিক স্থাপত্য সৃষ্টি করেছে।

'খোঁয়ারি গল্পে'র বর্ণনভঙ্গি সতেজ, জীবন্ত ও টানটান; পাঠকের মনে হয় সবই যেন ঘটে চলেছে চোখের সামনে। সমরজিতের স্মৃতিবর্ণনায় লেখক মুক্তিযুদ্ধকালের ঘটনা এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যাতে পাঠক পুরোপুরি যুক্ত হয়ে পড়েন ঘটনা-দৃশ্যাবলির সঙ্গে। 'প্রথম পর্যায়ে ইফতিখারের মদ্যপানোত্তর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা বাহুল্য মনে হলেও সমরজিৎদের পলায়ন দৃশ্যের বর্ণনায় ইলিয়াস পুরান ঢাকার একটি প্রায়ভঙ্গুর বাড়ির দোতলায় বসা মদের আসর থেকে পাঠককে পৌঁছে দেন একেবারে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবহুল জ্যান্ত সময়ের মধ্যে। ঘটনাবলির সংঘটন দ্রুত, ভাষা টানটান– দুয়ের সমন্বয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে পাঠক, এতটাই ওতপ্রোত হয়ে পড়ে যে, দীর্ঘ এ বর্ণনায় তাদের কোনো বোধ থাকে না। সে মূলত কোথায় আছে সমরজিতদের বাড়িতে না যুদ্ধে।'[৪১]

স্মৃতিজীবী অমৃতলালের আভিজাত্যের অতীতচারিতা, নেশায় মগ্ন হয়ে পলেস্তারা-খসা মোটা খাম জড়িয়ে ধরে গাওয়া 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী' তাদের সাবেকি আমলের জলসার দৃশ্যকে আভাসিত করে গল্পে। 'সমরজিৎদের প্রাচীন পলেস্তারা-খসা বাড়িটাকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ বলে ভাবতেই বা ক্ষতি কি?'[৪২]

অসুখ-বিসুখ

খোঁয়ারি গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'অসুখ-বিসুখ'। এ গল্পটি আতমন্নেসা নামের এক চিরবঞ্চিত নারীর বার্ধক্যপীড়িত জীবনের জলছবি। পুরান ঢাকার একটা বাড়িতে পুরো জীবন কাটিয়ে দেওয়া আতমন্নেসার ওপর যে বঞ্চনা, অবহেলা, অনাদর, অযত্ন হয়েছে, তা উপস্থাপনে ইলিয়াসের ভঙ্গি গতানুগতিকতার গণ্ডি পেরিয়ে পাঠকের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। আতমন্নেসার চরিত্র চিত্রণই এ গল্পের মূল আকর্ষণ। বহু বৈচিত্র্যময় মানবমনের পরত

---

[৪১]. জাফর আহমদ রাশেদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[৪২]. সুশান্ড মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প– নতুন স্বর, সুর ও আস্বাদ, শৈলি, ১৯৯৭

উন্মোচিত করাই সাহিত্যের কাজ। ইলিয়াস সে কাজটি করেছেন সামগ্রিকভাবে। ব্যক্তিকে যুগপৎ তার সামাজিক ও মানসিক অবস্থার ভেতর দিয়ে উপস্থাপন করেছেন এ গল্পে। বঞ্চিত ও রিক্ত আতমন্নেসার বিকারগ্রস্ততার পাশাপাশি গল্পে চিত্রিত হয়েছে তার মানবিক স্বার্থপরতা, হীনণ্মন্যতাও।

বার্ধক্যপীড়িত আতমন্নেসার দুই ছেলে সোবহান ও খোরশেদ। সোবহান ব্যবসায়ী। তার স্ত্রী সেতারা ও পুত্র আলম। খোরশেদ শিক্ষিত; তার মাতৃভক্তিও প্রবল। স্ত্রীকে নিয়ে সে পৃথক থাকে। মেয়ে নুরুন্নাহারের বিয়ে হয়েছে দুই সতীনের ঘরে। বয়স্ক লোকের সঙ্গে তার বিয়ে, সংসারে অনেক কাজ, সে কারণে বহুদিন সে বাপের বাড়ি আসে না। ছোট মেয়ে মতির বিয়ে হলেও স্বামী সুরুজ মিয়া তাকে বাপের বাড়িতেই রেখেছে। যৌবন বয়সেও আতমন্নেসা স্বামীর আদর পায়নি। উপরন্তু অসুস্থ হাঁপানির রোগী স্বামীর সেবা করতেই সময় গেছে তার। বার্ধক্যেও সে ছেলে-মেয়েদের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই আজন্ম বঞ্চিত নারীর শরীর নীরোগ সুস্থ। যৌবনে তার অসুখ-বিসুখ খুব একটা হয়নি। তখন থেকে সংসারের সবাই জানে আতমন্নেসার শরীরে কোনো অসুখ নেই। বৃদ্ধা যখন বাস্তবে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে তখনও সন্তানদের ধারণা,

> আম্মার বিমারী তার মনে, তার শরীর মাশাআল্লা বহুত ভালো।[৪৩]

একজন নারীর বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক, অবহেলিত জীবনের চিত্র ইলিয়াস এক বিশেষ পরিকল্পনা ও স্টাইলে অঙ্কন করেছেন এ গল্পে। যা গতানুগতিকতা অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে সর্বকালের মর্মস্পর্শী বেদনায় সিক্ত।

মনোবিকারগ্রস্ত আতমন্নেসা ঘরে বসেই সবকিছু অবলোকন করে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের জাল বোনে মনে মনে। নিজের প্রতি অন্যের কর্তব্যের পরিমাণ নির্ণয় করে। মনঃপূত হলে ইতিবাচক নয়তো নেতিবাচক ভাবনায় দোলায়িত হয়। সব সময় অন্যের ভুলত্রুটি ধরায় সে ব্যতিব্যস্ত। বর্তমান সময়ের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ। ভালো তার অতীত। আতমন্নেসার এই গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই এ গল্পের শিল্পসফলতা।

---

[৪৩]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ১২৪

ব্যস্ততার কারণে সোবহানের বৌ সেতারা স্বামীকে পানি দিতে পারেনি বলে, আতমন্নেসা ছেলের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করে ছেলের বৌকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। নিজে আজীবন বঞ্চিত বলে জীবন প্রসঙ্গে কোনো শুভবোধ অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অসুস্থতার নামে মেয়ে মতিবানুর বাপের বাড়িতে পড়ে থাকা ও তার স্বামীর আদর-যত্ন, সোহাগ আতমন্নেসার খারাপ লাগে। মতিবানুর সন্তান না হওয়াটাকেও সে মন্দ দৃষ্টিতে দেখে। রাগে সে মেয়ের অকল্যাণ কামনা করে। জামাইয়ের ওপর সে বিরক্ত হয়। তার ভাবনায় ক্রোধ ও বিরক্তির প্রকাশ ঘটে–

> জামাইটাই বা কি রকম পুরুষ মানুষ যে বিয়ের পর চার বছর বাচ্চা হয় না, এখনো অন্য বিয়ে করার নাম পর্যন্ত করে না। আবার ডাক্তার দ্যাখায়।...মাইনা কইরা ডাক্তার রাইখা পোলা পয়দা করবা, না? রাগে আতমন্নেসার মুখ খারাপ করতে ইচ্ছা করে।[৪৪]

মতিবানুর ওষুধ দেখে আতমন্নেসার ঈর্ষা, ওষুধের প্রতি তার দুর্বলতা, লুকিয়ে অন্য রোগের ওষুধ খাওয়া মানসিক বিকারগ্রস্ততা। তার কোনো অসুখেই কেউ পাত্তা দেয়নি। তার স্বামী ও সন্তানেরাও তার জন্য কোনো ওষুধও বাড়িতে আনেনি। সে কারণে ওষুধের প্রতি তার আকর্ষণ। ওষুধ খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সে আলমকে দিয়ে মতির ওষুধ চুরি করিয়ে আনে। কাঁপা কাঁপা আঙুলে চুরি করে আনা চার-পাঁচটা ট্যাবলেট খাওয়ার পর আতমন্নেসার প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় লেখক পরাবাস্তব পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন–

> তার চোখের সামনে থেকে মতিবানু ও সিতারাকে নিয়ে রান্না ঘরের দরজা, বাসন কোসন, নালা, নালার পাশের ময়লা ও সুরকি ও সিমেন্টের গুড়োময় উঠান এবং বারান্দার প্রান্ত একসঙ্গে উধাও হয়ে গেলো।[৪৫]

আতমন্নেসা এটুকু বোঝে 'শরীর লোহার হোক কাঠের হোক রোগ ব্যারাম ছাড়া কি মানুষ বাঁচে?' বাস্তবেই যখন তার ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে, তার ভয়াবহতা আঁচ করতে পারে না। প্রত্যাশিত অসুখের খুশিতে তার আনন্দ হয়। অনেক ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাতেই সে খুশি। মেয়ে নুরুকে বলে:

> অ নুরু, তর জামাইরে আইতে কইস! খানদানী ঘরের মানুষ, দাওয়াইগুলি চিনবো, কতো দাওয়াই দিছে, দ্যাখস না? [৪৬]

---

[৪৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
[৪৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
[৪৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

ইলিয়াসের যে তির্যক ও শ্লেষময় ভাষাভঙ্গি, অসুখ-বিসুখ গল্পে তা অনুপস্থিত। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি গল্পে সরল ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। গল্পের পটভূমি পুরান ঢাকা। চরিত্রানুগ ও স্থানানুগ ভাষা নির্মাণ করেছেন লেখক:

> আউজকানা আমারে একটা ঘরের মইদ্যে লইছে, বুঝলি, ঘুরঘইট্টা আন্ধার বুঝলি? -- একটা বেটায় না কয়, আপনার রক্ত লমু। আমি না ডরাইয়া গেছি! আমার খালি গতর কাঁপে।[৪৭]

> জড়ানো চোখ মেলে ডানদিকে তাকায়, ডানদিকে একটা টুল। টুলের ওপর ওষুধপত্রের লম্বা রোগা মোটা ও বেঁটে শিশি বোতল, ট্যাবলেটের পাতা, টয় গ্লাস, থার্মোমিটার, হটওয়াটার ব্যাগ, আইসব্যাগ। আতমন্নেসা নিজের অবাধ্য চোখজোড়া প্রায় ধাক্কা দিয়ে সম্পূর্ণ খুলে দ্যাখে, না সব ঠিক আছে।[৪৮]

জীবন্মৃত আতমন্নেসার মনস্তত্ত্বের অসাধারণ গভীর ও সরল বিশ্লেষণ, বিষয়বিন্যাসের একরৈখিক অভিনবত্ব ও ভাষার প্রয়োগ অসুখ বিসুখ গল্পের অসাধারণত্ব।

তারা বিবির মরদ পোলা

'তারা বিবির মরদ পোলা' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র তারা বিবি। তারা বিবির ব্যর্থ জীবনালেখ্য, পুত্র গোলজারের প্রতি মনোবিকারগ্রস্ত সায় ও অকারণ অনুপ্রবেশই এ গল্পের আখ্যান। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় (১৯৭৬)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি যেমন পাঠক মহলে আলোড়ন ঘটায়, তেমনি গল্পকার ইলিয়াসের সৃজনক্ষমতাও স্বীকৃতি পায়। বৃদ্ধ রমজান আলীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তারা বিবি। যৌন জীবনের অচরিতার্থতায় বিকারগ্রস্ত হয় তারা বিবি। 'অচরিতার্থতার এই বিষয়টি ইলিয়াস গল্পে এনেছেন অতিকুশলতায়– কখনও সংলাপের মধ্যে দিয়ে, কখনও বা ইঙ্গিতে-ইশারায়।'[৪৯]

---

[৪৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

[৪৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

[৪৯]. আলাউদ্দিন মন্ডল, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নির্মাণে বিনির্মাণে, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৯, পৃ. ২৬৩

তারা বিবির নিজে যৌনজীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সে বিপরীতে ছেলে গোলজারের মধ্যে উচ্ছল ও জোরালো যৌনজীবনের ছবি দেখতে চায়। বাস্তবে তা অনুপস্থিত হলেও কল্পনায় তা পূরণ করে নেয় তারা বিবি। তাই বিভিন্ন নারীর সঙ্গে গোলজারের শারীরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে অশান্তি বাধায়। এ সন্দেহবাতিকতা মূলত তারা বিবির বঞ্চিত জীবনের মনোবিকৃতির ফল।

এ গল্পে বাইরের ঘটনা কম। তারা বিবি, রমজান আলী, গোলজার ও সখিনার মনোবিশ্লেষণেই বেশি তৎপর লেখক। আত্মকথন, সংলাপ ও বর্ণনায় এসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে দুই জোড়া দম্পতির অন্তর্জীবন। রমজান আলীর কামশীলতার সরাসরি উল্লেখ গল্পে নেই। বিগতযৌবন রমজানের শরীরের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় ইলিয়াস বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। গোলজারের সরস স্মৃতিচারণে লেখক উল্লেখ করেছেন তারা বিবির বঞ্চিত নারী জীবন, অতৃপ্ত যৌনবাসনার বিষয়টি:

> ‘মামুজান নানায় হালায় এই বিয়া যহন করছে তহনই তো ষাইট বছইরা বুইড়া। পঁচিশ বছরের ছেমরিটারে লইয়া বুইড়ার বহুত মুসিবত, না মামু?’[৫০]

‘জৈবিক চাহিদার সারকথা এতো শৈল্পিক নৈপুণ্যে প্রকাশিত হয় যে জীবন যেন কোলাহল করে ওঠে।’[৫১] অবদমিত যৌন বাসনার মতো স্পর্শকাতর বিষয়টি উপস্থাপনে লেখকের পরিমিতিবোধ অসাধারণ। ক্রম নির্মাণে শব্দ চয়ন, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও সুস্থ জীবনের ইঙ্গিত রূপায়ণে তিনি সচেষ্ট থাকেন। তারা বিবি দিনরাত অভিযোগ তোলে ছেলে গোলজারের চরিত্রহীনতার বিরুদ্ধে। কিন্তু রমজান আলী যখন তারা বিবির কাছে ছেলে গোলজারের সঙ্গে সুরুজের মায়ের যৌন মিলন প্রচেষ্টার বর্ণনা দেয় প্রত্যক্ষদর্শীর মতো, ক্ষোভ জানায় এ অনাচারের প্রতি, তখনই প্রকাশিত হয় এ গল্পের সারকথা। অত্যন্ত সংক্ষেপে লেখক জানিয়ে দেন তারা বিবির অপূর্ণ ও অতৃপ্তি, যৌনজীবনের ক্ষোভ ও মনোবিকৃতির পরস্পর যোগসূত্রের বিষয়টি–

---

[৫০]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ১৩৯

[৫১]. শহীদ ইকবাল, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: মানুষ ও কথা শিল্প, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৪৩

> এমুন চিল্লাচিল্লি করো ক্যালায়? গোলজারে কি করছে? পোলায় আমার জুয়ান মরদ না একখান? তুমি বুইড়া মরাটা, হান্দাইয়া গেছো কব্বরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে? [৫২]

বিষয়টি উপস্থাপনে লেখক শ্রেণিবিভক্ত সমাজকেও যুক্ত করেছেন। ১০ টাকার বিনিময়ে সুরুজের মা স্বেচ্ছায় গোলজারকে দেহ দানের সম্মতি দেয়, গোলজারও দেহের তাগিদ অনুভব করে। অবশেষে চরম মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে গোলজার। মায়ের নিরানন্দ, অতৃপ্ত যৌন জীবনের বিপরীতে সুস্থ যৌনতার ভাবকল্পেই নির্মিত হয়েছে গোলজার চরিত্রটি। আগেও সে, আসাদুল্লাহর বেশ্যাপল্লীতে গমনের আহ্বানকে নাকচ করে দেয়। গোলজারের এই সুস্থতার বিপরীতে আসাদুল্লাহর অশ্লীল ও অসুস্থ জীবনচর্চা, তারা বিবির খিস্তিখেউড়ে প্রকাশিত হয়েছে ঘুণে ধরা পচনশীল সমাজের চিত্র। এ চিত্র প্রকাশে লেখক ব্যবহার করেছেন বিশেষণ ও উপমা।

পিতৃবিয়োগ

'পিতৃবিয়োগ' গল্পটি খোঁয়ারি গল্পগ্রন্থের চতুর্থ ও শেষগল্প। গল্পটি পিতা-পুত্রের স্মৃতিচারণায় অবিব্যক্ত। অনেকটা ধাঁধার ঘোর লাগা আখ্যান। পিতা আশরাফ আলী ও পুত্র ইয়াকুবের খণ্ড জীবনই প্রধান হয়েছে গল্পে। একজন ব্যক্তি-মানুষের দ্বিবিধ ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে গল্পে। পিতা আশরাফ আলী পুত্র ইয়াকুবের কাছে যে ভূমিকায় পরিচিত, তার কর্মস্থলের লোকজনের কাছে সে ভিন্ন ভূমিকায় আবির্ভূত। তার এই দুই ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই গল্পে তৈরি করেছে আকর্ষণ ও ব্যঞ্জনা। পোস্টমাস্টার আশরাফ আলীর বিয়ের ১৮ মাস পর পুত্র ইয়াকুবের জন্ম। জন্মের সময় আশরাফ আলীর স্ত্রী মারা যায়। নানির কাছে থেকে মামাবাড়িতেই বড় হয় ইয়াকুব। প্রতি মাসে ছেলের জন্য মনি অর্ডার করে টাকা পাঠাতেন আশরাফ আলী। সঙ্গে থাকতো বিভিন্ন উপদেশসংবলিত চিঠি। এইসব চিঠি, আশরাফ সম্পর্কে মামা খালাদের বর্ণনা এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে বাবা সম্পর্কে ইয়াকুবের যে ধারণা জন্মেছে তা এ রকম– তার বাবা অধ্যবসায়ী, সৎ, নিজের সিদ্ধান্তে অটল, রাগী, মিতবাক-গম্ভীর ও কর্তব্যসচেতন একজন মানুষ। ইলিয়াসের বর্ণনায়–

> পিপড়ের সারির মতো গুটি গুটি অক্ষর, তাতেই উপদেশ, শ্বশুরবাড়ির সকলের কুশল জিজ্ঞাসা এবং নাম ধরে ধরে 'শ্রেণীমত সালাম ও দোয়া' জ্ঞাপন করা।[৫৩]

---

[৫২]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ১৪৭

[৫৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

অনেকবার বাবার সঙ্গে সোহাগ, আদর, ভালোবাসা জড়াজড়ি করতে ইচ্ছে হয়েছে ইয়াকুবের। কিন্তু বাবা আশরাফ আলীর সায় না থাকায়, অধরাই থেকে গেছে পিতা-পুত্রের অন্তরঙ্গ ভালোবাসার আদান-প্রদান।

কর্মস্থলে পিতার মৃত্যু ঘটে। পিতার শেষকৃত্যে গিয়ে সেখানকার সমবেত মানুষের স্মৃতিচারণে ও প্রশংসাস্তুতিতে পিতা সম্পর্কে ইয়াকুবের পূর্ব ধারণায় চিড় ধরে। পিতার কর্মস্থলের চারপাশের মানুষের বাক্যালাপে সে জানতে পারে যে, তার পিতা ছিল অমায়িক, সদালাপী, আড্ডাবাজ, স্নেহবৎসল্য এবং হাসিখুশি। পিতার মদাসক্তির কথাও জানতে পারে সে। পিতা সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সদ্য শোনা বিপরীত স্বভাবের সাযুজ্য খুঁজে পায় না ইয়াকুব। খানিকটা মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। ইয়াকুব বুঝতে পারে না, কোনটা তার বাবা। পিতার কুলখানির পূর্বেই কর্মস্থলে পালিয়ে যায় সে। পিতা-পুত্রের স্নেহবাৎসল্যের যে চিরন্তন ধারণা তার বিপরীতে এই দুই সম্পর্কের ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতাও বাস্তব। এই বাস্তবকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন ইলিয়াস 'পিতৃবিয়োগ' গল্পে। গল্পের টেকনিকে ব্যবহৃত হয়েছে পুত্র ইয়াকুবের অন্তর্গত ভাবনালোক। নানা ঘটনাস্রোত, নানাবাড়ির লোকের বয়ান, সংক্ষিপ্ত চিঠি ও সাক্ষাৎ তার মনে পিতার যে মূর্তি গড়ে দিয়েছে তা অপরিবর্তনীয়। ছোটবেলায় সে একবার আবেগে ভালোবাসায় বাবার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। আশরাফ আলী হাত দুটো আস্তে আস্তে খুলে ছেলেকে মেঝের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখে বলে, 'বয়স হলে ন্যাকামো শোভা পায় না।' আরেকবার ১২/১৩ বছর বয়সে ইয়াকুব স্বপ্নে নারী মূর্তি দেখে। তার জ্বর হয় ও প্রলাপ বকা শুরু করে। টেলিগ্রাম পেয়ে আশরাফ আলী আসেন। ছেলেকে দেখে ফিরে গিয়ে তিনি চিঠিতে লেখেন:

> জাগ্রত অবস্থায় তরল বিষয়ের প্রতি অবাঞ্ছিত মনোযোগ ও অহোরাত্র লঘু কল্পনার জগতে অনুচিত বিচরণই এইরূপ স্বপ্নদর্শনের কারণ। চিত্ত উচ্চস্তরের চিন্তা দ্বারা শক্তিশালী হইলে এইরূপ কলঙ্ক ঘটিবার সম্ভাবণা রহিত হয়।[৫৪]

পিতার এই দৃঢ় কঠিন চরিত্রের পাশাপাশি সুহৃদ ও প্রতিবেশী এহসান আলীর বয়ানে ইয়াকুব জানতে পারে তার পিতা 'হাস্যরসে সর্বজনেরে মাতিয়ে রাখতো'। তখন সৃষ্টি হয় বিভ্রম। একি তার পিতা না অন্য কেউ। এই টানাপোড়েন ও বিভ্রম থেকে তার নিষ্কৃতি ঘটে না। অভিনব নির্মাণশৈলীর এই গল্পটিতে মানুষের দ্বৈত সত্তার স্বরূপ উন্মোচনে ইলিয়াস পাশাপাশি দুই পরিবেশ ও দুই গুচ্ছ মানুষের বয়ানকে সমান্তরালে দাঁড় করিয়েছেন। প্রকাশ

---

[৫৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

পেয়েছে আশরাফ আলীর দ্বৈত সত্তার পরিচয়। একদিকে ইয়াকুবের নানি জোহরা বিবি, মেজো মামা, বড়ো খালাম্মার টুকরো স্মৃতি ও চিঠি, অন্যদিকে পিতার কর্মস্থলের প্রতিবেশী এহসান আলি ডাক্তার, মুকুন্দ সাহ, নিতাই কুণ্ড, করিম গাজীর স্মৃতিচারণ; দুই পক্ষের বিবৃতি ও সাক্ষ্য সূত্রে ইলিয়াস মানুষের আপাতবিপরীত, দুর্জ্ঞেয় অথচ বাস্তব দুই সত্তার উন্মোচন করেন পাঠক সমীপে। মানুষের ভেতর-মনের আনন্দময় সত্তা সব পরিবেশে পাখা মেলতে পারে না। পরিবেশের কারণে সংকুচিত সেই সত্তাই অন্য কোথাও, উপযুক্ত পরিবেশে প্রকাশিত হয়।

'পিতৃবিয়োগ' গল্পটির ক্রমবিন্যাস, পরিমণ্ডল, আবহ নির্মাণ, আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ও চরিত্রায়ণ ইলিয়াসের অন্যান্য গল্প থেকে আলাদা। গল্পটি নিরীক্ষামূলক; সুখপাঠ্য অথচ অস্বস্তিকর। পুত্র ইয়াকুবের সঙ্গে আশরাফ আলীর বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তি পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলে–

> বাবার ওপর রাগ করতে পারলে বরং একটু স্বস্তি পাওয়া যায়। আব্বার ওপর রাগ করার কারণ আছে বৈ কি? না জীবনে না মরণে– লোকটা কোনোদিনই তাকে পাত্তা দিলো না। এদিকে দ্যাখো, এহসান ডাক্তারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে বোতল ওড়ায়। কার না কার মেয়ে জামগাছ থেকে পড়ে ঠ্যাং ভাঙলে কোন অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে তার জন্যে ভাত মাখে।– কিন্তু বাবাকে শালা জুৎ করে কোথাও বসানো যাচ্ছে না। দেখতে না দেখতে সব হাওয়া হয়ে যায়।[৫৫]

এভাবেই পিতার মৃত্যুর পর ইয়াকুব পিতৃহীন, পরিচয়হীন পৃথিবীর পথে পা বাড়ায়। পিতার দ্বৈত সত্তার বিভ্রম থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায় সে।

পুরান ঢাকা ও দক্ষিণ বাংলার প্রেক্ষাপটে গল্পটি বর্ণিত হলেও দুই অঞ্চলের জনজীবন অপেক্ষা চরিত্রের মনোজগৎ উন্মোচনেই ইলিয়াস বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। তবে খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার যথার্থ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন চরিত্রের সংলাপে–

> ও মণি, তুমি এই ডে কি কত্ত? তার কি আর কতা কওয়ার হুশ ছেলো? [৫৬]

---

[৫৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
[৫৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

'খোঁয়ারি' গল্পগ্রন্থের চারটি গল্পেই ইলিয়াস নিরাসক্ত থেকে উচ্ছ্বাসহীন বর্ণনায় বিষয়বিন্যাসের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। লেখক প্রথম গল্পগ্রন্থ থেকে প্রকরণগত ভিন্নতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এখানে। আধুনিক শিল্পরীতি প্রয়োগের নিরীক্ষাধর্মিতার স্বারক্ষর রেখেছেন তিনি। রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়কে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে গল্পে উপস্থাপনের পাশাপাশি চরিত্রের মনের গভীরেও মনোযোগ দিয়েছেন। মানুষের বাঁচাকে, বাঁচার লড়াইকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। নিষ্পেষিত গোষ্ঠীর অস্তিত্বের অনুসন্ধানে আলো ফেলেছেন সংযত ও সচেতনভাবে। এখানেই লুকিয়ে আছে ইলিয়াসের গল্পের শিল্প-সার্থকতা।

দুধ ভাতে উৎপাত

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'দুধ ভাতে উৎপাত'। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থে চারটি গল্প স্থান পেয়েছে। 'মিলির হাতে স্টেনগান', 'দুধ ভাতে উৎপাত', 'পায়ের নীচে জল' ও 'দখল'-- এ চারটি গল্পে গ্রামীণ ও শহুরে প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রবল প্রবঞ্চনার বিষয় তুলে ধরেছেন লেখক। ১৯৭৫-পরবর্তী সামরিক শাসনের এই সময়কালে 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন ভঙ্গের পাশাপাশি শোষণ ও নির্যাতন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। অনিশ্চয়তার দোলাচলে সাধারণ মানুষ ঘুরপাক খেতে থাকে। সম্পদ গচ্ছিত হতে থাকে কতিপয় মানুষের হাতে। গ্রামেও তার থাবা প্রসারিত হয়। বৃহৎ ক্যানভাসে ইলিয়াস গ্রামের ক্ষুধাপীড়িত মানুষ, ভূমিব্যবস্থা, মানুষের সংঘবদ্ধতা, শ্রেণিচেতনা ও প্রতিরোধ স্পৃহাকে এ গ্রন্থে যুক্ত করে তার শিল্পচেতনায় নতুন মাত্রা এনেছেন; বিষয়ের বৈচিত্র্যের সঙ্গে শিল্পনৈপুণ্যেরও প্রমাণ রেখেছেন।

মিলির হাতে স্টেনগান

'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পটির টেকনিক পুরোনো। কিন্তু বিষয়ভাবনার অভিনবত্ব ও পরিবেশনা নতুন। গল্পটি পাঠককে মনে করিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) অমর সৃষ্টি *কমলাকান্তের দপ্তরে*র কথা, যেখানে আফিম-আসক্ত কমলাকান্ত বেঘোর ও উন্মাদ অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন; দেখতে পান সামাজিক, রাষ্ট্রিক নানা অন্যায়, অবিচার ও অসাম্যের বিষয়গুলো। কমলাকান্ত সেখানে সত্য অবলোকনেই আটকে থাকেন। কিন্তু 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পের আব্বাস পাগলা অন্যায়, অবিচারের দর্শক হয়েই ক্ষান্ত হন না, শপথ নেন প্রতিরোধের, উদ্যোগী হন প্রতিবাদের। তাঁর একটা স্টেনগান প্রয়োজন শত্রু নিধনের জন্য। তিনি কেবল আকাশে শত্রু দেখেন। একটা স্টেনগান খোঁজেন শত্রু নিধনের জন্য। মিলিকেও প্রভাবিত করেন অন্যায়ের প্রতিবাদে। আব্বাস পাগলার এই

দেশমাতৃকার শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকদের খতমের প্রচেষ্টা তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই ঘটে। হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেলে আব্বাস পাগলার অন্যায়ের প্রতি যে প্রতিশোধ স্পৃহা তা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু মিলির মনে জাগিয়ে রাখে অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধস্পৃহা ও স্বপ্নযাত্রা।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সামূহিক অরাজকতা, ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈতিক প্রতিযোগিতা, যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি, লাম্পট্য ও ভোগবাদের বিপরীতে আব্বাস পাগলা ও মিলির প্রতিবাদস্পৃহাই 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পের মূল বিষয়বস্তু। মুক্তিযোদ্ধা রানা যুদ্ধের পর অস্ত্র ফেরত দেয়নি। রানা ও তার বন্ধু সিডনি, সোহেল, ফয়সাল মিলে যুদ্ধ-পরবর্তীকালে অস্ত্রের জোরে ভয়ভীতি দেখিয়ে, রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে সম্পদ লুণ্ঠন ও ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার দেশমাতৃকার যে সার্বিক মুক্তির, শোষণমুক্ত সাম্যময় সমাজের স্বপ্ন দেখে জনগণ, যুদ্ধপরবর্তীকালে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতেই মুক্তিযোদ্ধা আব্বাস মাস্টার মানসিক ভারসাম্য হারান। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি দেশের শত্রুদের খতম করার শপথ নেন। রানার বোন মিলিও প্রভাবিত হয় এই চেতনার সঙ্গে। সে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ফেরত-না-দেওয়া ভাই রানার স্টেনগান গোপনে তুলে দেয় আব্বাস পাগলার হাতে, শুদ্ধি অভিযান শুরু করার জন্য। ততদিনে আব্বাস পাগলা সুস্থ। তার প্রতিবাদী স্বরও থেমে গেছে। মিলি চাঁদের দেশে উড়াল দেওয়ার জন্য পা ঝাপটায়। ইলিয়াস অসাধারণ দক্ষতায় এই কথাবস্তুকে শিল্পরূপ দিয়েছেন 'মিলির হাতে স্টেনগান গল্পে'।

আব্বাস পাগলা প্রতীকী চরিত্র। স্বাধীনতা-পরবর্তী বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে মানুষের সুস্থতা হারানো ও প্রতিরোধের তীব্র আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটেছে এ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আব্বাস পাগলার উন্মাদনাময় ভাষার অবিরাম প্রকাশ, চাঁদের দেশে মিলির স্বপ্নময় যাত্রা, শিল্প-জাদুময়তার নির্মাণ স্থাপত্য ও স্বপ্নানুষঙ্গ এই গল্পকে স্বতন্ত্র্য এক মাত্রা দিয়েছে। নিরীক্ষামূলক এই শৈল্পিক পরিচর্যায় লেখকের কেন্দ্রীয় মনোযোগ নিবিষ্ট থাকে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে। চাঁদের প্রতীকে পবিত্র স্বাধীন দেশের স্বপ্নের কথা ব্যক্ত হয়েছে এ গল্পে; যা বর্তমানে দখল হয়ে যাচ্ছে। আব্বাস পাগলা জানায়–

চাইরটা বছর ভি পুরা হয় নাই, অকুপেশন আর্মি গিয়া চান্দের বহুত এরিয়া ক্যাপচার কইরা রাখছে, বুঝলি?[৫৭]

আঙুলের কড়ে গুনে গুনে আব্বাস পাগলা ১৯৬৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত চারটা বছরের কথা জানান। অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ পরিস্থিতিই গল্পের ঘটনাকাল। যে সময়কালে জনগণের মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে সেইসব বেইমান মুক্তিযোদ্ধা ও শত্রুকে খতম করে দেশকে রক্ষার। জনগণের সেই দ্রোহ রূপ পায় আব্বাস পাগলার কথায়–

> আমি ব্যাকটিরে সাফ কইরা দিবার পারি। ফর্টি ফাইভ ডিগ্রী এ্যাঙ্গেল কইরা এমুন ফায়ারিং করুম, বুঝলি, ফটাফট ফালাইয়া দিমু।[৫৮]

'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পের ভাষা দুর্দান্ত গতিময়। আব্বাস পাগলার মুখে সংলাপ স্থাপনে লেখক অনেক সাহসী। অপ্রকৃতিস্থ আব্বাসের ভাষা সংলাপে তিনি কোনো রাখঢাক করেননি। আপাতদৃষ্টিতে তার ভাষা অশ্লীল মনে হলেও তা বিবেকপ্রকাশক ও প্রতিবাদী; যুদ্ধের স্মৃতিনির্ভর ও শুদ্ধ দেশপ্রেমময়। রানা ও তার বন্ধুরা শাসক মহলের কাছ থেকে 'পারমিট' পাওয়ার কথা আলাপ করলে আব্বাস পাগলার জবাব--

> হোগার মইদ্যে ব্যান্ডেজ বান্দলে সিগারেটের স্বাদ থাকে?[৫৯]

আরেকদিন আব্বাস পাগলা স্টেনগান পেলে যুদ্ধ শুরু করার কথা জানায়। এক্ষেত্রে তার কোনো মেসেজ বা অর্ডার দরকার হবে না; দরকার শুধু স্টেনগান। রানার বন্ধু 'কোন ম্যাসেজ হুজুর' প্রশ্ন করায় সে উগরে দেয় এসব বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী অন্যায়কারীদের প্রতি তার মনোভাব–

> চুতমারানী, খানকির বাচ্চা, তগো ব্যাকটিরে আমি চিনি। আমার পেটের মইদ্যে থাইকা ইনফর্মেশন বাইর কইরা এনিমি ফ্রন্টে পাঠাইবার তালে আছো, না? ইস্পাইং করনের আর জায়গা পাইলি না?[৬০]

---

[৫৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
[৫৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
[৫৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
[৬০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

আব্বাস পাগলার ভাষা সংলাপ ব্যবহারে চেতনাপ্রবাহ রীতির পরিচর্যা করেছেন লেখক। একা থাকলেই তার চেতনাস্তরে ঘটে চলে স্বপ্নময় দ্রোহ, যা মিলিকেও প্রভাবিত করে। সেসব প্রকাশে ইলিয়াস প্রয়োগ করেছেন পরাবাস্তবরীতি।

> আকাশের দিকে তাক করে আব্বাস পাগলা নিশানা ঠিক করছে। যুদ্ধরত শত্রুসৈন্যরা মিলির দৃষ্টির অনেক বাইরে। আব্বাস পাগলা ক্রেনের সিঁড়ি বেয়ে আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে বলে তার এলোমেলো উড়ন্ত চুলের কালো শিখা ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। কোমরে শাড়ি জড়িয়ে নিয়ে মিলি সিঁড়ির ধাপ ভাঙছে, আব্বাস পাগলার চুল কালো আগুনের মতো দপদপ করে জ্বলে, সেই দিকে চোখ রেখে সে ওপরে উঠছে। একধাপ একধাপ করে মিলি বেশ খানিকটা উঠে পড়ে। হঠাৎ মিলির সমস্ত শরীর দুলে উঠলো–তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে তার পা ফস্কে গেছে, অনেক ওপরে কালো আগুনের শিখা– মিলি পড়ে যাচ্ছে গভীর নিচের খাদে।[৬১]

গল্পের বর্ণনানুষঙ্গে লেখক প্রায়শই উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন:

> বিদ্যুৎ চমকাবার জবাবে আব্বাস পাগলা গর্জন করে উঠলে তার মস্ত হাঁ মশালের আলোয় উদ্ভাসিত পাহাড়ের গুহার মতো প্রতিধ্বনিময় হয়ে ওঠে।[৬২]

সমস্ত গল্পেই লেখক যুক্ত করেছেন আব্বাস পাগলার হাততালি। হাততালির ধ্বনিব্যঞ্জনা গল্পে শুধু ভিন্নতর আবহই নির্মাণ করেনি বরং তা ক্রমপরম্পরায় গতিময় হয়ে মিলির মনোলোকে নির্মাণ করে অব্যক্ত অভিভাব। বিষয়বৈভব ও প্রকরণশৈলীতে 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পটি অনন্য।

দুধ ভাতে উৎপাত

'দুধ ভাতে উৎপাত' ইলিয়াসের ভিন্নধর্মী একটি গল্প। ইলিয়াসের শিল্পযাত্রার বাঁক্‌পরিবর্তনের স্বাক্ষর এ গল্প। লেখক এ গল্পের মধ্য দিয়েই দৃষ্টি দেন বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি; তাদের ক্ষুধা, শোষণ ও নির্মম যন্ত্রণার প্রতি। আর শুরুতেই বাংলাদেশের

---

[৬১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
[৬২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

গ্রামজীবন, কৃষক ও প্রান্তিক মানুষের হাসি-কান্না বঞ্চনাকে কার্যকারণ শৃঙ্খলায় এবং দ্বন্দ্বময় অনুষঙ্গে শিল্পরূপ দেন তিনি।

ধলেশ্বরী নদীতীরের এক গ্রামের কসিমুদ্দিনের পরিবারের ক্ষুধাপীড়িত যন্ত্রণা ও তাঁর অসুস্থ স্ত্রী জয়নাবের দুধ-ভাত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও তার অপূর্ণতা, গ্রামের উঠতি ধনপতি হাশমত মুহুরীর শোষণ গল্পের আখ্যানভাগ। কসিমুদ্দিনের কিশোর ছেলে অহিদুল্লাহর চোখ দিয়ে গল্পের ঘটনাসমূহ বর্ণিত হয়েছে। করুণ রসে ও স্থিরচিত্রে আঁকা হয়েছে ঘটনাপরম্পরা।

অহিদুল্লার বাবা কসিমুদ্দিন নিজ গ্রামে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারেননি। তাই বাধ্য হয়ে তিস্তাতীরের গ্রাম খোলাম হাটিতে আজমত আলী প্রধানের বাড়িতে, বাড়ির মক্তবে ছেলে মেয়েদের আমপারা-সেপারা পড়ান, মসজিদে আজান দেন। ইমাম সাহেব এদিক-ওদিক গেলে নামাজও পড়ান। একমাত্র বকরি ঈদের পর ৮/১০ সের জ্বাল দেওয়া খাসি ও গরুর গোশত নিয়ে কসিমুদ্দিন যখন বাড়ি ফেরেন তখনই তাদের পরিবারে ভালো খাবার জোটে। বছরের বাকি সময় অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে হয় তাদের। জয়নাবের পালিত কালো গাইয়ের দুধ বেচে কিছু চাল-ডাল জোটে। চালের দাম বেড়ে গেলে 'আধমণ' চাল দিয়ে মুহুরির জামাই হারুন মৃধা কালো গাই কিনে নেন। অসুস্থ জয়নাব কালো গাইয়ের দুধ দিয়ে ছেলে মেয়েকে ভাত খাওয়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে। মুহুরি বাড়িতে মায়ের ইচ্ছার কথাটা বলে অহিদুল্লাহ দুধ চাইলে, জোটে কেবল ভর্ৎসনা। হামিদা বিবি জা জয়নাবের ইচ্ছাপূরণের ব্যবস্থা করে। আটা গুলে তৈরি করে দুধ। সেই দুধে ভাত মেখে জয়নাবের সামনে আনলে হামলে পড়ে তার পাঁচ অভূক্ত সন্তান। এভাবে ক্ষুধার আদিম ও অনাবৃত দৃশ্যটি ইলিয়াস চিত্রিত করেছেন আটাগুলোনো দুধ-ভাত খাওয়ার কাড়াকাড়ির বাস্তবতায়।

> ভাতের গন্ধে গুড়ের গন্ধে ওহিদুল্লার পেটের প্রসার এখন দ্বিগুণ। ... মুখ বাড়িয়ে ভাতের প্রথম গ্রাসটি সে নিজেই তুলে নিতে পারতো, তা আর হয়ে ওঠে না, তার, আগেই হাজেরা তার বসন্তের দাগ-ভরা মুখ এগিয়ে হলদে ছ্যাতলাওলা দাঁতে মায়ের হাত কামড়ে দুধ-ভাত তার নিজের জিভে চালান করে নিয়েছে। ... দেখতে দেখতে জয়নাবের হাত ধপাস করে পড়ে যায় বিছানার প্রান্তে। খাদিজা সেই হাত নিয়ে আঙুলগুলো চুষতে আরম্ভ করে।[৬৩]

[৬৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

ছেলেমেয়েদের ভাত খাওয়ার এই কাড়াকাড়ি অব্যাহত থাকে, জয়নাব পাড়ি জমায় পরপারে। 'দুধ ভাতে উৎপাত' গল্পটির বর্ণনা কৌশলে লেখক 'ফ্লাশব্যাক' রীতির প্রয়োগ করেছেন। কোথাও কোথাও স্মৃতি ও অতীতচারিতা মিশে গেছে বর্তমানের সঙ্গে:

> জয়নাব তার বন্ধ চোখ দিয়ে ওহিদুল্লার খোলা নোনা দুই চোখে অদৃশ্য সব ছবি এবং অনেক আগে সম্পন্ন গতিবিধি প্রকাশ করে দেয়। ওহিদুল্লা দেখতে পায়, প্রখর ঠাঠা রোদে জয়নাব মাখন ঘোষের পোড়ো-ভিটায় মেটে আলুর খোঁজে মাটি খুঁড়ছে। আবার এক বছর পর কসিমুদ্দিন বাড়ি ফিরেছে তাও দ্যাখা যায়। বাপের হাতে গোশতের হাঁড়ি দেখে তারা সব কটা ভাইবোন অস্থির [৬৪]

অতীত ও বর্তমানের একীভূত এই চিত্র নির্মাণে লেখক ভাষার ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ক্রিয়াপদের ব্যবহারে অতীতকালের স্থলে বর্তমান রূপের প্রয়োগ করেছেন। জয়নাবের পরিবারে বকরি ঈদের পরের এক মাসের সুখ-চিত্র বর্ণনায় ইলিয়াস জানান–

> এই হাসিটা তার ঠোঁট জুড়ে চুপচাপ এলানো থাকে সারা পৌষ মাস। নতুন চাল উঠলে ছেলেমেয়েদের জয়নাব একদিন দুধ-ভাত খাওয়ায়। কসিমুদ্দিন অবশ্য তখন তিস্তাতীরের গ্রামে। উঠানে ছেলেমেয়েদের সার করে বসিয়ে জয়নাব হাত দিয়ে মুখে মুখে ভাত তুলে দেয়[৬৫]

প্রসঙ্গটি অতীত স্মৃতির। কিন্তু বর্ণিত হয়েছে বর্তমান কালের ক্রিয়া রূপ প্রয়োগ করে। প্রকরণগত সারল্য ব্যবহার করেছেন লেখক এ গল্পে। তবে ইলিয়াসের যে শৈল্পিক প্রবণতা, বর্ণনায় পরাবাস্তব রীতির প্রয়োগ, তা যুক্ত থেকেছে গল্পে। জয়নাবের কথা বন্ধ হওয়ার খবরে ওহিদুল্লাহর মানসিক অবস্থা বোঝাতে নিম্নরূপ চিত্র আঁকেন লেখক–

> এইসব দেখে শুনে ওহিদুল্লার পেটের কোলাহল মাথায় ওঠে। সমস্ত পেট মাথার ভেতর সেঁধে যাওয়ায় খুলিটা ঘিঞ্জি ও ঝাপসা ঠেকে।[৬৬]

---

[৬৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
[৬৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
[৬৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

দরিদ্র মানুষের খাদ্যাভাবের যন্ত্রণা ও তার বিপরীতে ধনী মানুষের নির্মমতা বোঝাতে লেখক শ্লেষের প্রয়োগ করেছেন গল্পে। ওহিদুল্লার কাছে তার মায়ের অসুস্থতা ও দুধ-ভাত খাওয়ার আবদারের কথা শুনে হাশমত মুহুরির শহরবাসী ছেলের বক্তব্য–

> 'দুধ-ভাত খাইলে তর মায়ে ফাল পাইড়া উঠবো, না? [৬৭]

মুহুরীর বউ বলে-

> তর মায়ে--বুইড়া মাগীটার ঢঙের হাউস হইছে দুধ-ভাত খাইবো!

লেখক গল্পে ধলেশ্বরী তীরবর্তী মানুষের মৌখিক ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন দক্ষতার সাথে:

> মাইজা বৌ, দুধ তো পাই না! তামাম গাঁও তালাস কইরা আলার বাপে হপায় আইছে। উত্তরপাড়ার করিম সিকদারের গাইটা দুই একের মদ্যেই বিয়াইবো। নুইলা আমিনুদ্দির গাই বলে কয়দিন থাইকা খালি দাপায়, দানাপানি ছাড়ছে। আলার বাপে ঝাইড়া দিয়া আইলো। [৬৮]

গল্পের শেষে ইলিয়াস জয়নাব বিবির অবিরাম বমনক্রিয়ার যে প্রবাহের চিত্র এঁকেছেন তা এ গল্পের ব্যতিক্রমী এক শিল্প সফলতার স্মারক। এর মধ্য দিয়ে লেখক উগরে দেন ধনিক শ্রেণির প্রতি ঘৃণা। জয়নাবের হুঙ্কারেও ভাষারূপ পায় শোষণের বিপরীতে প্রতিবাদী স্বর। হাশমত মুহুরীর জামাই হারুন মৃধা অন্যায়ভাবে জয়নাবের কালো গাই দখলে নিয়েছে। জয়নাব ওহিদুল্লাকে বলে:

> বুইড়া মরদাটা! কী দেহস?' গোরু লইয়া যায়, খাড়াইয়া খাড়াইয়া কী দেহস? [৬৯]

তার এ প্রতিবাদ অচেতন অবস্থায়; তবু তা ব্যঞ্জনাপ্রসারী।

পায়ের নিচে জল

দুধ ভাতে উৎপাত গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'পায়ের নিচে জল'। গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষিজীবী ও নিম্নবিত্ত মানুষের বসতভিটে হারিয়ে নিরবলম্ব, শিকড় বিচ্ছিন্ন হওয়ার চরম

---

[৬৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
[৬৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
[৬৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

দুর্দশার চিত্রায়ণ হলো 'পায়ের নিচে জল' গল্পটি। নদীকূলবর্তী জনজীবনে নদীভাঙনের সর্বগ্রাসী প্রভাব, সেই সুযোগে উঠতি জোতদারদের শোষণ-নিপীড়নের জাল বুনে দরিদ্র মানুষগুলোকে সর্বস্বান্ত করার আখ্যান এ গল্পের কেন্দ্রীয় কথাবস্তু। গল্পের নামকরণেই ইলিয়াস বুঝিয়ে দেন দরিদ্র এ কৃষিজীবীদের পায়ের তলে মাটি নেই। তারা উন্মূলিত; অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে হেরে দুর্দশায় নিমজ্জিত।

'পায়ের নিচে জল' গল্পের কাহিনি বুননে ইলিয়াস অসামান্য সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। আতিক নামে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেধাবী ছাত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে এ গল্পের ঘটনাবলি। মধ্যবিত্তের ভদ্রতা ও নীতিবোধ মাঝে মাঝে সংকট তৈরি করে আতিকের মধ্যে। গ্রামীণ বিত্তহীন মানুষের সহায়হীনতা ও তাদের সর্বশেষ অবলম্বন থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে তাই সে কখনো কখনো আটকে যায়। আতিককে এই সংকট থেকে উদ্ধার করে আলতাফ মৌলবি। আতিকদের বর্গাচাষী, তাদেরই ভিটায় বসবাস করে কিসমতের পরিবার। পরিবারটি উচ্ছেদ করে পুরো জমি বিক্রি করার কথা জানাতে এসেছে আতিক। জমির ক্রেতা গ্রামের উঠতি ধনবান আলতাফ মৌলবি। আতিকের মধ্যবিত্ত ভদ্রতা জমি-বিক্রির ঘোষণা দিতে বাদ সাধে। তখন নাটকীয় ভঙ্গিতে জমি বিক্রির ঘোষণা দেন আলতাফ মৌলবি। গল্প আখ্যানে সৃষ্টি হয় অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতি। আতিক অস্বস্তিতে পড়ে যায়। অভিজ্ঞতা থেকে কিসমত নির্বিকার; সে জানে যেখানে আলতাফ মৌলবির হস্ত প্রসারিত হয়েছে সে জমি সে কিনবেই। কিন্তু অস্তিত্ব সংকটের যন্ত্রণায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে কিসমতপুত্র আকালু। গল্পের এ অংশে তিন ধরনের রস সঞ্চার করেছেন ইলিয়াস।

যে নিরাবেগ ও তির্যক-তীক্ষ্ণ সমাজবিশ্লেষণ ইলিয়াসের গল্পের বর্ণনায় যুক্ত থাকে, তা যেন খানিটকা অনুপস্থিত এখানে। গ্রামীণ ভূমিব্যবস্থা, শ্রমশর্ত, সামাজিক সম্পর্কের জটিল বিন্যাস ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ইলিয়াসের অভিজ্ঞতা তখনো ততটা পূর্ণতা পায়নি। গল্পের শুরুই হয়েছে নাটকীয় ভঙ্গিতে। আতিক নতুনগুড়ের নতুন রকম স্বাদের চা খাচ্ছে। সেই স্বাদকে সে তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করতে চাচ্ছে। কিন্তু তার এ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় যমুনার পাড় ভাঙায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন। তারা দোকানের বেড়া, চাল, খুঁটি ইতোমধ্যেই সরিয়ে নিয়েছে। এখন বেঞ্চটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে:

> বাঁধের পূবদিকে চাষের জমি, মাঝে মাঝে কলাগাছ ও ভেরেন্ডা গাছ ঘেরা ছোটো ছোটো বাড়ি। এখানে ওখানে খাবলা খাবলা করে ফসলকাটা পাটক্ষেত। ধানের থেকে কাটা ধানগাছের গোড়া। জমিতে জমিতে তাড়াহুড়া করে কাজ করার চিহ্ন। কিছুদূরে গিয়ে

> খাড়া পাড় থেকে জমি লাফিয়ে পড়েছে যমুনা নদীতে। নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে ঘন পাটক্ষেত। এখান থেকে যমুনাকে অনেকটা দেখা যায়। নদীর ওপারে মথুরা পাড়ার চর। এই চরও উচুঁ থেকে ডাইভ দিয়ে নেমেছে নিচের বালুচরে, তারপর ঢালু হয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়েছে যমুনার পানিতে। ওপারে মথুরাপাড়া ঘেঁষে নদীর গা একেবারেই এলিয়ে দেওয়া, কিন্তু এদিকে আসতে আসতে যমুনা তার কোঁকড়া কোঁকড়া ঢেউ ঝাঁকিয়ে নিজের সীমানাকে অস্বীকার করে।[৭০]

এই খণ্ড খণ্ড চিত্র ইলিয়াস নিখুঁত ফটোগ্রাফারের মতোই ক্যামেরায় ধরেন। পাঠক যেন প্রবেশ করে সিনেমা হলে। একের পর এক গ্রাম, নিসর্গ ও জনজীবনের নিখুঁত বর্ণনায় ঠাসা এ গল্পটি।

> গরম নীল আকাশ থেকে চুঁয়ে পড়ে শ্রাবণ মাসের রোদ; মটিতে আউশের খেতে জমে থাকা পানিতে আঠালো গরম। গোরুর গাড়ি চলার মতো চওড়া রাস্তার ধার ঘেঁষে বাঁশঝাড়, দড়ি বাঁধা ছাগল, বেগুন খেতের পেছনে জুবুথুবু হয়ে দাঁড়ানো খড়ের দোচালা।[৭১]

গল্পে সবিস্তার বর্ণনা ব্যবহার করলেও ইলিয়াসের সংযমবোধ অসাধারণ। 'পায়ের নিচে জল' গল্পের মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে দুই-তিন বাক্যে। শহুরে ধনিক মধ্যবিত্ত আতিকের পরিবারের ধনিক শ্রেণিতে উত্থান ও আলতাফ মৌলবির উঠতি জোতদারে রূপান্তরের মধ্য দিয়েই কিসমত সাকিদাররা গড়িয়ে পড়ে আশ্রয়হীন, ঠিকানাহীন অস্তিত্বসংকটে। বসতভিটে হারিয়ে তারা অন্যদের মতোই জড়ো হবে ওয়াপদা বাঁধে। কিসমতের ছেলে আকালু নিজেদের অবস্থান বর্ণনা করে স্বল্প কথায়:

> জমিতো আমাগো আছেই। আমাগোর জমি বান্দের উপরে। আমরা বান্দের জমিদার।[৭২]

'পায়ের নিচে জল' গল্পে ইলিয়াস বগুড়া অঞ্চলের উপভাষার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আলতাফ মৌলবির সংলাপ:

> তুমি না আসলে কিসমতের বেটা কাইজা করতো। বেন্যার বাচ্চা শালা বড়ো নটখট্যা ছ্যারা। তুমি অ্যাসা খুব ভালো করছো বাপু, এখন শালারা আর কিছু অছিলা পাবো না[৭৩]

---

[৭০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
[৭১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
[৭২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

'পায়ের নিচে জল' গল্পের শিল্পরূপ বিবেচনায় 'নাটকীয়তা', 'উদ্দেশ্যমূলকতা'র ত্রুটির দিকটি সমালোচকেরা উল্লেখ করেছেন। ইলিয়াস এ গল্পে নির্দ্বন্দ্ব। তিনি অনেকবেশি মনোযোগী হয়েছেন গ্রামীণ পরিবেশে শোষণের আবহ চিত্র নির্মাণে।

দখল

দুধ ভাতে উৎপাত গল্পগ্রন্থের চতুর্থ ও শেষ গল্প 'দখল'। 'দুধ ভাতে উৎপাত', 'পায়ের নিচে জল' গল্প দুটিতে লেখকের যে চিন্তা ও জীবনোপলব্ধির রূপান্তরের শুরু, তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে 'দখল' গল্পে।

'দখল' গল্পটিতে মার্ক্সবাদী বিশ্ববীক্ষার আলোকে বাংলাদেশের শোষিত বঞ্চিত কৃষক ও গ্রামীণ মানুষের মুক্তির সপক্ষে ঐতিহাসিক শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকে বাস্তব ভূমি থেকে বিচার বিশ্লেষণের সযত্ন প্রয়াস রয়েছে। লেখকের এই প্রয়াস কতটা বাস্তবনির্ভর ও কতটা আদর্শনির্ভর হয়ে গল্পে এসেছে, তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। গল্পের আখ্যান ও আঙ্গিক বিবৃতিমূলক। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইকবাল। সে বড়ো হয়েছে ঢাকায়। পিতার মৃত্যুর পর নানাবাড়িতে বেড়ে ওঠা ইকবাল গ্রামে এসেছে। দাদা মোয়াজ্জেম হোসেনের সম্পত্তিতে তার পিতা মোবারকের অধিকার দাবি করতে। দাদা মোয়াজ্জেম ইকবালকে জানিয়ে দেয়–

> বাবা বেঁচে থাকতে ছেলের মৃত্যু হলে মৃত পুত্রের ছেলেমেয়ে কিছু পায় না।[৭৪]

যদিও পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের উত্তরাধিকারের এই নিয়ম পরিবর্তিত হয়েছে আইয়ুব খানের আমলে। আর ইকবালের পিতা মারা গেছেন তার আগেই, ১৯৫০ সালে।

প্রধানত ইকবাল ও মোয়াজ্জেমের কথোপকথন, স্মৃতিচারণ, আক্ষেপ ও আশাবাদের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে গল্পটি। ইকবালের বাবার গল্পের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের দশকের রাজনীতি, তেভাগা আন্দোলন ও মার্ক্সবাদী রাজনীতির বিস্তার প্রসঙ্গ এসেছে। ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তানি আমল ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটও ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে গল্পে।

---

[৭৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

[৭৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

'দখল' গল্পটির আখ্যান বর্ণনা গতানুগতিক। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে লেখক প্রদর্শন করেছেন দক্ষতা ও সফলতা। মোয়াজ্জেম হোসেন শোষক চরিত্র। ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ পর্বে তিনি বারে বারে রং বদলান। ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। পাকিস্তান আমলে সেই নিজের বাড়িতেই তিনি মুসলিম লীগের অফিস খোলেন। বাংলাদেশ পর্বে তার ছেলে মোতাহের বনে যায় দাপুটে রাজনৈতিক সংগঠক। সর্বদা তার গায়ে মুজিব কোট। তার চরিত্র বর্ণনায় ইলিয়াস স্বল্প কথায় অসাধারণ এক আঞ্চলিক কথন উপস্থাপন করেছেন। ভেদু পরামানিকের সংলাপে লেখক জানান–

> তোমার চাচা,--তাঁই পয়সার জোঁক, পিঁপড়ার গোয়া টিপ্যা তাঁই গুড়ের অস বার করে, তাঁই তোমাক জমির ভাগ দিবি? [৭৫]

মোয়াজ্জেম ও মোতাহের দুজনে মিলে গণ্ডগ্রাম ও চন্ডিহারের ক্ষুদ্র জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষকদের ওপর শোষণ-নিপীড়ন চালায়। এ কাজে তারা সরকারি বাহিনীরও সাহায্য নেয়। চাষিদের জমি দখল করে, তাদের শ্রম শোষণ করেই মোয়াজ্জেম হোসেন জোতদার হয়েছে। কৃষক শ্রেণি যখন জোটবদ্ধ হয়, মোয়াজ্জেম তখন তাদের দমন ও নিশ্চিহ্ন করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ইকবালের ভাবনায় ধরা পড়ে মোয়াজ্জেম চরিত্রের শোষক, নিষ্ঠুর রূপ–

> মানুষের হৃত-অধিকার উদ্ধার করতে গিয়ে ছেলে জেলখানার মধ্যে মরে পুলিশের গুলিতে, পরে তুমি শালা বুড়া শয়তান তোমার আরেক ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে রক্ষিবাহিনী নিয়ে আসো গ্রাম উজাড় করার জন্য! [৭৬]

ইকবালের বাবা মোবারক ছোটবেলায়ই কৃষকদের দুর্দশা উপলব্ধি করেন। সেই সঙ্গে দেখেন তার বাবা মোয়াজ্জেম হোসেনের নিষ্ঠুর কার্যকলাপ। বড় হয়ে কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়ার সময় সে যোগ দেয় মার্ক্সবাদী রাজনীতিতে। ফিরে এসে গণ্ডগ্রাম, চন্ডিহার, কাঁঠালপাতা, তেলিহার, গুণাহারসহ আশপাশের কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম গড়ে তোলেন। কৃষকদের অধিকার নিয়ে কাজ করে সে। শোষক নিপীড়ক জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। মানুষের সার্বিক মুক্তির বিষয়ে আন্তরিক কাজ করে মোবারক। ইকবালের মামা ও ভেদু পরামানিকের স্মৃতিচারণে মোবারক চরিত্রের মাহাত্ম্য উন্মোচিত হয়েছে। কলু, তেলি, নিকিরি, কৃষাণ সকলের সঙ্গেই মোবারকের খাতির। এইসব

---

[৭৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

[৭৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

শ্রমজীবী মানুষের সমস্যাকে মোবারক হোসেন দেখেছেন নিজের জীবনের সমস্যা হিসেবে। ইকবালকে ভেদু জানায়–

> মানষের খিদা তাঁই বুঝিছে লিজের গতর দিয়া, বুঝল্যা? [৭৭]

ইকবালের বড়ো মামার ধারণা,

> মোবারক কমন পিপলের প্রব্লেম পার্সোনাল ফিলিং দিয়ে বুঝতে পারতো।... [৭৮]

ভেদু পরামানিকদের সংগ্রামে মোবারকের বিদ্রোহী সত্তার বীজ প্রবহমান। কিন্তু বাস্তবতা হলো জোতদার, সরকারি বাহিনীর শক্তি ও ক্ষমতার সঙ্গে এরা কুলিয়ে উঠতে পারে না। এই সত্যের আভাস রেখেছেন লেখক:

> বগুড়া কি রংপুর শহর থেকে রক্ষিবাহিনীর বড়ো দল আসছে। রক্ষিবাহিনীতে না কুলালে সেনাবাহিনী আসবে। [৭৯]

'দখল' গল্পে পাঠকদের জন্য ইলিয়াস চমকও রেখেছেন। ইকবাল দাদার সম্পত্তিতে বাবার অধিকার দখল করতে আসে। কিন্তু তিনি দখল করে বসেন বাবার করবের পাশে নির্মিত কবরটি। যা মোয়াজ্জেম হোসেন তৈরি করেছেন নিজের জন্য। বিপ্লবী ছেলের পাশে সমাধিস্থ হওয়ার তার স্বপ্ন সফল হওয়ার পথে বাধ সাধে ইকবাল। ছেলের সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে একাত্মবোধ না করেও, শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবন উৎসর্গের মাহাত্ম্যে ছেলের যে সুনাম তা উপভোগ করতে চান মোয়াজ্জেম হোসেন। দাদার এ কপটতার বিরুদ্ধে ইকবালের বাবার কবরের পাশে তৈরি তার দাদার জন্য নতুন কবরটি দখল অভিনব এক প্রতিবাদ।

'দখল' গল্পে বগুড়া অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। চাষি ও মজুরদের চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে গল্পে। প্রবাদ প্রবচনেরও তা প্রয়োগ করেছেন লেখক। যেমন:

> সুখে থাকলে ভূতে কিলায় [৮০]

---

[৭৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬
[৭৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬
[৭৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
[৮০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

জন জামাই ভাগনা' তিন নয়, আপনা! [৮১]

গোবরে পদ্মফুল[৮২]

অনেক ইংরেজি শব্দেরও প্রয়োগ করেছেন এ গল্পে। উচ্চ শিক্ষিত মানুষের ইংরেজি শব্দমিশ্রিত বাংলা ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এগুলো: নর্থবেঙ্গল, কমন পিপল, প্রব্লেম, পার্সোনাল, ফিলিং, গভর্নমেন্ট, মিনিস্টার, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, ট্র্যাপ, টোটাল এ্যানিহিলেশন, হোল নাইট, এ্যমুনেশন ইত্যাদি।

দুধ ভাতে উৎপাত গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'মিলির হাতে স্টেনগান'-এ মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী শহুরে জীবন যাত্রার স্খলন, অস্ত্র ও ক্ষমতার দাপট, শোষণ, ছিনতাই ও তার বিপরীতে বৃহত্তর মানুষে স্বপ্নভঙ্গ ও প্রতিবাদ স্পৃহা ভাষারূপ পেয়েছে। অন্য তিনটি গল্প 'দুধ ভাতে উৎপাত', 'পায়ের নিচে জল' ও 'দখল'-এ লেখক গ্রাম জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-নির্যাতন, ক্ষুধা, রাজনীতি ও প্রতিবাদ অনুভববেদ্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। গ্রামজীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এসব গল্পে ইলিয়াস গ্রামাঞ্চলের উপভাষা, গ্রামীণ মানুষের পেশা, জীবনযাত্রার ধরন, জীবনোপলব্ধির স্বরূপ প্রভৃতি কুশলি শিল্পীর মতো অঙ্কন করেছেন।

দোজখের ওম

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ *দোজখের ওম* (১৯৮৯)। এ গ্রন্থে আছে চারটি গল্প : 'কীটনাশকের কীর্তি', 'যুগলবন্দি', 'অপঘাত' ও 'দোজখের ওম'। এসব গল্প নতুন স্থাপত্যে বিন্যস্ত। গল্পগুলো শুধু দীর্ঘ ও নিরাভরণই নয়, অনেক শাখা-উপশাখায় বিন্যস্ত। জটিল সময়ের বহুমাত্রিক জমাট চাপকে তুলে ধরতে ছোটগল্পের যে একরৈখিকতা তা ভেঙেছেন লেখক। বস্তুবিশ্বের সংঘর্ষ, তার বিস্তার, প্রাপ্তি ও অপূর্ণতার বৈপরীত্যে মানবমনের গভীরে যে আলোড়ন, অন্তর্ঘাত তারই শৈল্পিক উপস্থাপন ঘটেছে 'দোজখের ওম' গল্পগ্রন্থে। গ্রাম ও শহরজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত এসব গল্পে সময় ও পরিবেশসহ প্ররোচনার বেড়াজাল হাতড়ে সত্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন লেখক।

কীটনাশকের কীর্তি

---

[৮১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

[৮২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পটির নাম বদল ঘটেছে। প্রথম প্রকাশের সময় নাম ছিল 'অবিচ্ছিন্ন'। গ্রন্থভুক্তির সময় নাম বদলে করা হয় 'কীটনাশকের কীর্তি।' অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন গল্পটির নামকরণ শিল্পসম্মত হয়নি। তাতে অবশ্য গল্পের শিল্প সফলতায় ব্যাঘাত ঘটেনি। গল্পটি বর্ণিত হয়েছে রমিজ নামের এক কিশোরের দৃষ্টিকোণ থেকে। গ্রাম থেকে শহরে সে কাজ করতে আসে। শিল্পপতির বাড়িতে কাজ করতে করতে খেই হারানো কিশোর রমিজের অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ, পরিণতিতে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ার ট্র্যাজিক ঘটনা নিয়েই 'কীটনাশকের কীর্তি'। লেখক রমিজের জীবনে গ্রাম ও শহরকেন্দ্রিক শোষণের রূপ, মনোজটিল দ্বন্দ্ব, অক্ষমের অসার প্রতিশোধ-প্রচেষ্টার করুণ পরিণতিকে তুলে ধরেছেন এ গল্পে।

বাড়ি থেকে রমিজের বাবার চিঠি এসেছে। তার বোন কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করেছে। দারোগা-পুলিশ বাবদ আড়াইশো টাকা খরচ হয়ে গেছে। গ্রামের জোতদার, যার বাড়িতে রমিজের বাবা মা ফরমাশ খাটে সেই আছমত মিরধা পাবে ২৪৫ টাকা। টাকা পরিশোধ না করলে পুলিশ দিয়ে বেইজ্জতি করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। সব কিছু সামাল দিতে পাঁচ শর মতো টাকা দরকার। রমিজ তার মনিবের কাছ থেকে টাকা ও ছুটি নিয়ে বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু কয়েকটি ঘটনা তার এ উদ্যোগকে ফলপ্রসূ হতে দেয় না। কুকুরের গর্‌র্‌ গরর ধ্বনি, মনিবের খবরের কাগজে মনোযোগ দেওয়া, মেয়ের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে আসা, মেম সাহেবের উপস্থিতি রমিজের সাজানো পরিকল্পনাকে তছনছ করে দেয়। রমিজ ও তার পরিবারের কাছে বুবুর মৃত্যুশোকের চেয়ে টাকার সমস্যাটাই বড়ো। মৃত্যুশোক ছাপিয়ে ওঠা টাকার সমস্যাটা মেটাতে না পেরে রমিজ হয়ে পড়ে মানসিক ভারসাম্যহীন। অপরদিকে বড় লোকের বিপরীত সংস্কৃতির চর্চাও তাকে ফেলে দেয় অনির্দেশ্য ক্রোধাগ্নিতে। এ রকম মানসিক টানাপোড়েনে ফেলে ইলিয়াস রমিজ চরিত্রের দৃষ্টিকোণে চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প সাজিয়ে এগিয়ে নিয়েছেন গল্প। সে সব চিত্রকল্পে গ্রাম-শহর মিশে একাকার হয়েছে। মিশেছে ধনী ও গরিবের জীবন-সংস্কৃতিও।

সাহেবের মেয়ে শাম্মী কাঁদো কাঁদো গলায় নিজের মেডেল পাওয়ার কথা জানায় সাহেবকে। আবার নিজের অ্যাকসিডেন্টের বর্ণনা দেয় মহা উল্লাসে। চুকচুক করে লিচু খেতে খেতে কথা বলে বাবার সঙ্গে। তখনই রমিজের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার বোন অসিমুন্নেসার তেঁতুল চোষার ছবি–

তাই এই বাড়িতে, এই কার্পেটে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে অসিমুন্নেসা হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার চুকচুক আর চটাৎ চটাৎ তেঁতুল খাওয়া আর থামে না।[৮৩]

অসিমুন্নেসার হাসি আহ্লাদ ভরা যুবতী চেহারা আর আঠারো বছরের ধিঙি মেয়ে শাম্মির টাইট প্যান্ট পরা ছবি রমিজের করোটিতে মিলেমিশে জট পাকিয়ে যায়। দৃশ্য পরিবর্তিত হয় রমিজের অন্তর্জগতেও। মিরধা বাড়ির 'ম্যাট্রিক পাস' অসিমুন্নেসাকে নষ্ট করে পাটখেতে। ট্রাক ড্রাইভারের কথার ধাক্কায় রমিজের করোটিতে সেই দৃশ্য ভেসে ওঠে। 'ম্যাট্রিক পাসে'র সঙ্গে অসিমুন্নেসার হাসি ঠাট্টা মস্করার দৃশ্যও ভেসে ওঠে রমিজের অন্তর্গত দৃশ্যজগতে।

অসিমুন্নেসার দেহভোগের পর কেটে পড়ে 'ম্যাট্রিক পাস'। ম্যাট্রিক পাসের বাবা আছমত মিরধা ছেলেকে বাঁচাতে কৌশলে অসিমুন্নেসার বিয়ে দেয় দোকানের কর্মচারী হাফিজুদ্দিনের সঙ্গে। বিয়ের পর ম্যাট্রিক পাস পুনরায় তৎপর হয় অসিমুন্নেসার দেহভোগ করতে। কিন্তু সে বাধা পায় অসিমুন্নেসার। এতে সে হাফিজুদ্দিনকে জানিয়ে দেয় অসিমুন্নেসার সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্কের কথা। প্রতিক্রিয়ায় হাফিজুদ্দিনও জানিয়ে দেয়, 'ছিনাল' মেয়ে মানুষকে নিয়ে সে ঘর করতে পারবে না। অসহায় অসিমুন্নেসা বিষপানে আত্মঘাতী হয়। অসিমুন্নেসার নীল শুকনো নিষ্পাপ মুখটা ঝুলে থাকে রমিজের চোখের সামনে। যে পোকার ওষুধ তার বুবুর দেহকে নিঃসাড় করে দিয়েছে সেই র‍্যাটমের প্যাকেট লুঙ্গির ট্যাঁকে গুঁজে নেয় রমিজ। বিদ্বেষে তাড়া করে সাহেবের মেয়েকে। মুখে পোকার ওষুধ গুঁজে নিঃসাড় করতে চায় তাকেও। কিন্তু সাহেবের মেয়ের আর্তচিৎকারে বাড়ির দারোয়ান, মালি, চাকর-বাকর, সবাই ছুটে এসে প্রচণ্ড মারধর করে রমিজকে। হাত পা বেঁধে রেখে দেয় গ্যারেজে। দুই চোখ জুড়ে তখন কান্না নামে রমিজের। বুবু বুবুরে বুবু বলে সারা রাত কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে ভোরের দিকে।

'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পের শিল্প সফলতা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। সাহেবের মেয়েকে র‍্যাটম খাওয়ানোর ব্যর্থ চেষ্টাকে কোনো কোনো আলোচক গল্পের নৈয়ায়িক ত্রুটি হিসেবে দেখেছেন। অবশ্য কোনো কোনো সমালোচক গল্পের বিশেষ স্থাপত্যে সমাজবাস্তবতার শৈল্পিক উপস্থাপন ও পাঠকমনে তার ছাপের দিকটি উল্লেখ

---

[৮৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

করেছেন। রমিজের অনুভবে স্বপ্ন ও বাস্তবের মিশ্রণ, স্বগত ভাষাভঙ্গি এবং দুই বিপরীত সমাজবাস্তবতার সমান্তরাল উপস্থাপনে গল্পের শৈল্পিক সংগঠন অনবদ্য। রমিজের জমাট বেদনা ও বঞ্চনার প্রতীকে গল্পের ভাবকল্পটি এক বাচনিকতায় উপস্থাপিত। যেখানে উপস্থাপিত হয়েছে অন্তর্মূল সুদ্ধ বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার এক মর্মন্তুদ খণ্ডচিত্র। রমিজের প্রতিশোধস্পৃহা নিষ্ঠুরভাবে দমিত হলেও সে স্বপ্ন দেখে–

> শালার বিবিসাহেব এখনো বুঝতে পারেনি, বুঝবে, সবই বুঝবে। আরেকদিন কায়দা করে বিবি সাহেবের মুখে, পোকার ওষুধ ঢুকিয়ে দেবে, আরেকদিন সাহেবের মুখে, আরেকদিন আরেকদিন।[৮৪]

এভাবে রমিজ সব অন্যায়কারীর মুখেই পোকার ওষুধ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। বহুদিন আগে ওষুধ মেশানো খারাপ গম রিলিফ দেওয়ার অপরাধে ওষুধ ঢোকানোর ইচ্ছে হয় কোরবান মেম্বারের মুখে।

> রমিজ এবার গিয়ে কোরবান মেম্বারের মুখে পোকার ওষুধ ঠিক দিয়ে আসবে।[৮৫]

মূলত রমিজ চরিত্রের মনোচারিতার বাঙ্ময় ও অনুপুঙ্খ বর্ণনা, ব্যক্তিক অথচ জীবনের পূর্ণ-বৃত্ত বাস্তবতাই 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পের অনবদ্য শিল্প সফলতা।

যুগলবন্দি

দোজখের ওম গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'যুগলবন্দি'। মানুষ ও কুকুরের বন্দিদশার সমান্তরাল অবস্থানকে শ্লেষ ও ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় ইলিয়াস উপস্থাপন করেছেন এ গল্পে। গল্প পরিচর্যায় ন্যাচারালিজম শিল্পরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। সরোয়ার বি কবিরের পদলেহী প্রভুভক্ত দুই জীব আসগর ও আরগস। একজন আদর্শহীন, যোগ্যতাহীন যুবক। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য, একটা ভালো চাকরির প্রত্যাশায় উচ্চবিত্ত, সম্পদশালী সরোয়ার কবিরের সাথে এমন সব মোসাহেবি আচরণ করে, যা পাঠককে রীতিমতো লজ্জায় ফেলে দেয়। অন্য জীব আরগস সাহেবের কুকুর। দুই জীবের নামকরণে ধ্বনিগত সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে লেখক গল্পরসের পরিণতি নির্দেশ করেছেন।

---

[৮৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

[৮৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

সরোয়ার বি কবিরের 'অর্ডার ক্যারি আউট' করতে আনন্দের সঙ্গে রাত পৌনে একটায় বেরিয়ে যায় আসগর। সাহেবের বউয়ের কমলা খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। রাতে প্রচুর মদ্যপান করার পর 'ওয়েট রিডিউস' করার জন্য তার কমলা খাওয়া চাই। ফ্রিজে কমলা না থাকায় আসগরের ওপর আদেশ বর্তায় তা সংগ্রহের জন্য। প্রথমে চকবাজারের ফলের দোকানে, পরে রিয়াজুদ্দিন বাজার ঘুরে ঘুমন্ত দোকানদারকে জাগিয়ে কমলা সংগ্রহ করে আসগর। কমলা সংগ্রহের কষ্টের জানান দিতেই সে দেরিতে সাহেবের হাতে তা তুলে দেওয়ার পদক্ষেপ নেয়। একদিকে ধূর্ততা, অন্যদিকে লাভের আশায় অপরিমেয় প্রভুভক্তি আসগর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

ইলিয়াস অসাধারণ শ্লেষাত্মক ভাষায় আসগরের দ্বৈত সত্তাকে উপস্থাপন করেছেন। একদিকে তার জন্মগত উত্তরাধিকার, বাবা-মায়ের গ্রাম্যতা ও দারিদ্র্য তাকে ফেলে দেয় অশেষ যন্ত্রণায়। অন্যদিকে ওপরে ওঠার অরুচিকর, অসৎ চেষ্টা অব্যাহত থাকে। সুখী স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের ঝলমলে ছবি কেবলই ভাসতে থাকে তার চোখে। আসগরের কাছে তার বাবা মা 'সংশোধনের অতীত'। তার দৃষ্টি কেবলই 'খুলশিতে ফার্নিশড বাড়ী' ও 'সুন্দরী বউ'। এই দুই বিপরীত বাস্তবতায় আসগর সর্বদা ব্যস্ত তার প্রভু সরোয়ার বি কবিরকে খুশি করতে। পোর্ট থেকে দামি দামি মালপত্র সরানো থেকে বিভিন্ন কোম্পানির কর ফাঁকির ব্যাপারে সহায়তা, কমিশন সংগ্রহ সব কাজেই সে সরোয়ার বি কবিরকে সাহায্য করে। লক্ষ্য একটাই, তাকে উঠতে হবে নিম্নমধ্যবিত্ত অতিক্রম করে উচ্চ-মধ্যবিত্তে, উচ্চ-মধ্যবিত্ত পেরিয়ে উচ্চবিত্তে। সে চেষ্টায় আসগর নেমে আসে পশুর স্তরে। সাহেবের প্রিয় কুকুর আরগসের 'বাউয়েলস ক্লিয়ার' হচ্ছে না বলেই সে ঠিকমতো খেতে পারছে না। সে কারণেই এ্যালসেশিয়ানটি দিন দিন 'ডাল' হয়ে যাচ্ছে। কুকুরের সঠিক ব্যায়াম, ব্যালান্সড ডায়েট ও জেল্লা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয় আসগর। চাকর আবদুলের হাত থেকে জোর করে নিয়ে নেয় আরগসের ব্যায়াম ও 'বাউয়েলস ক্লিয়ারে'র দায়িত্ব। বিকেল বেলা আরগসের শিকল ধরে বাইরে পা রাখতেই ছুট দেয়। আবদুলের পরামর্শমতো শিকল টাইট করে টেনে ধরে রাখে। ইটের পাঁজার কাছে পৌঁছতেই আরগসের গতি বেড়ে যায়। বাউয়েলস ক্লিয়ার করার নির্দিষ্ট স্থানে বসে প্রাকৃতিক কর্ম সারতে থাকে আরগস। শিকল ধরে থাকা আসগরও অংশ নেয় এ কাজে আত্মিকভাবে। নেমে যায় 'কুকুরে'র স্তরে:

> এখন রেগুলার ডোজ হিসাবে ৩টে সিগ্রেট খাওয়া উচিত, ৩ নম্বর সিগ্রেটটি ধরাতেই আসগরের হাতে শিকল শিরশির করে ওঠে এবং সে রিনিঝিনি আওয়াজ শুনতে পায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার, আশাতিরিক্ত ক্ষিপ্রতায় আরগস তার সামনে এসে মৃদু মৃদু

ল্যাজ নাড়ে। কোনো সন্দেহ নাই যে তার পাকস্থলিতে এখন শেষ শীতের নির্মল হাওয়া বাইছে।[৮৬]

আরগসের মলত্যাগের সুখানুভূতির রেশ ছড়িয়ে পড়ে প্রভুভক্ত আসগরের শরীরেও। আসগরের এই অবনমন পাঠককে ফেলে দেয় হাঁসফাঁস করা এক অস্বস্তিতে। ইলিয়াস সাহস ও শক্তির সঙ্গে সামাজিক এই গতিচিত্রকে ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন।

অপঘাত

গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে লেখা মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতানির্ভর গল্প 'অপঘাত'। গল্পের কাহিনিসার পাঠকের পরিচিত। কিন্তু উপস্থাপনভঙ্গি নতুন। গল্পের শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুলুর বাবার মনোজগৎ উন্মোচনে ইলিয়াস এমন সব চিত্রকল্প উপস্থাপন করেছেন, যা তার শৈল্পিক দক্ষতার পরিচায়ক। সুররিয়ালিজম শিল্পচর্চার মেধাবী প্রয়োগে ছন্দরূপ পেয়েছে মোবারক আলির অন্তর্গত ভীতি ও বিভ্রম:

> এদিকে দেখতে দেখতে কান্নার ফাঁকগুলো সব ভরে যায় এবং কান্না একটানা বিলাপে পরিণত হয়ে তার ঝুনা করোটির ভেতরকার ঠকঠক দেওয়ালে ঘনতালে বাজতে থাকে। বাজনাটা একবার বৃষ্টি বলে মনে হয়েছিল; কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঘরের কান্নাকাটির খবর বাইরে যাবে না– এই আশা করে একটু নিশ্চিত হবার আগেই বৃষ্টির বিভ্রম কাটে। বিলাপের আওয়াজ তার আঁশের মতো চুলের গোড়ায় গোড়ায় হ্যাঁচকা টান মারে। টানাটানির ফলে চোখের ঢাকনি সম্পূর্ণ উদাম হলে মোবারক কিছুই দেখতে পায় না, ঘরে ঘনঘোট অন্ধকার।[৮৭]

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ছেলে বুলুর জন্য তার মায়ের বিলাপ, মিলিটারির কাছে ধরা পড়া ও নির্যাতনের ভয়ে সব সময় উৎকণ্ঠিত মোবারক আলি। কিন্তু বুলুর বন্ধু চেয়ারম্যানের অসুস্থ ছেলের মৃত্যু হলে, সে বাড়ির কান্নার বিলাপকে মনে হয়, বুলুর মায়ের কান্না। মোবারকের ভ্রম ভাঙলে বুঝতে পারে চেয়ারম্যানের ছেলে মারা যাওয়ায় সে বাড়ি থেকেই আসছে কান্নার সুর। ভ্রম ভাঙলেও তার ভয় ভাঙে না। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের নির্মম নির্যাতন, গ্রাম-শহরের ভয়াবহ চিত্র তার সংক্ষিপ্ত অথচ বাস্তব বর্ণনা রয়েছে এই গল্পে।

---

[৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

[৮৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

সেরপুরে জনমনিষ্যি কেউ নাই, বড়ো রাস্তায় খালি মিলিটারি, খালি মিলিটারি।[৮৮]

'অপঘাত' গল্পটি অগ্রসর হয়েছে মোবারক আলির ভ্রম ও ভয়ের মধ্য দিয়ে। ইলিয়াস নিরাবেগ দৃষ্টিতে ইতিহাসের সত্যকে গল্পে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। একই সাথে ঘটনার সংঘর্ষ ও সংক্রমণে ব্যক্তির অন্তর্গত আবেগ, ভয় ও তা অতিক্রমের এক সাহসী মানবসত্তাকে গল্পে যুক্ত করেছেন তিনি।

গল্পের প্রথম দিকে মোবারকের যে মনোভাব, ব্যক্তিক আশা-নিরাশা ও বেদনার ছাপ পাঠক দেখতে পায় ক্রমশ তা বদলে যেতে থাকে। তন্দ্রায় মোবারক আলি ছেলেকে দেখে প্রতিদিন। কিন্তু চেয়ারম্যানের ছেলের মৃত্যুর ধাক্কায় সেদিন আর পেরে ওঠে না।

> আজ তার মাথায় তন্দ্রার রেশ নাই, সুতরাং বুলুর ট্যাঙা শরীরটাকে এখানে শুইয়ে অন্ধকারে নয়ন ভরে আর দ্যাখ্যা হয়ে ওঠে না।[৮৯]

বুলুর বন্ধুর কাছে নিজের ছেলের মিলিটারি অপারেশন ও গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণের কথা শুনে মোবারকের মনে হয়, এটা অপঘাতে মৃত্যু, আল্লার গজব। কিন্তু সেই মোবারকই অনেক ঘটনার বাস্তবতা ও গুরুত্বে উপলব্ধি করতে পারে মুক্তিযুদ্ধের মহত্ত্ব। মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ইলিয়াস নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় সাহস ও মর্যাদায় সঞ্চারিত করেছেন মোবারক আলির চরিত্রে।

চেয়ারম্যানের ছেলে শাহাজানের মৃত্যুর পর তার লাশ দাফন করতে বাধা, সরকার-বাড়ির ল্যাংড়া জমির আলির মেয়ে ও ভাইঝিকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে শ্লীলতাহানির ঘটনা, ধানের চারা তুলতে থাকা নিরপরাধ শুকলুকে গুলি করে মারা, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, গুলি করে অসংখ্য মানুষ মারার ঘটনাগুলো মোবারক আলিকে ক্রমশ রূপান্তরিত করে অন্য মানুষে।

---

[৮৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

[৮৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

ইলিয়াস অনন্য এক শিল্প নির্মাণে দুজন মৃত যুবকের জীবনেতিহাস ও নিরুদ্দেশ-তাৎপর্য পাশাপাশি রেখে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতা, মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন উৎসর্গের গুরুত্ব, স্বাধীনতার প্রতি বাঙালির অসীম স্পৃহাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন:

> কাবেজ কী বলছে?– না, চেয়ারম্যান তখন যদি বুলুর সঙ্গে শাজাহানকে যেতে দেয় তো শাজাহানের এই পরিণতি হয় না। আজ সে ব্যস্ত থাকতো কড়িতলা থানা বিজয়-অভিযানে।[৯০]

মুক্তিযোদ্ধা বুলুর মহৎ মৃত্যু আর শাজাহানের সাদামাটা স্বাভাবিক মৃত্যুর পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে চেয়ারম্যানের কাজের লোক কাবেজের জবানিতে। শিক্ষাবঞ্চিত, জীবনের বিকাশ পর্বে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা একজন মানুষের বুকের গভীরে স্বাধীনতার জন্য যে অহঙ্কার তার দীপ্ত উচ্চারণ কাবেজের সংলাপ।

'অপঘাত' গল্পের চরিত্রবিন্যাসে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামের খেটে খাওয়া নিরাভরণ মানুষদের উপস্থাপন করেছেন গল্পে। কাবেজ, বিটলুর বাপ, বিটলু, শুকলু পরামানিকের ছেলে ওবায়েদ, মোবারক আলি, আরজ আলি সাকিদার– সকলেই সমাজের প্রান্তিক মানুষ। অস্তিত্ব রক্ষার জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত। অপর প্রান্তে চেয়ারম্যান ও তার ছোট ভাই আলিম আখন্দ, ইমাম কাম মোয়াজ্জেম হলেন সমাজের শোষক শ্রেণি। চেয়ারম্যান পাকিস্তানি শাসকদের জন্য সর্বদা সেবায় নিয়োজিত। ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে মিলিটারি ক্যাম্প হওয়ার পর, সে অফিস করে বাড়িতেই। সে অফিসারদের বারবার আশ্বস্ত করে তার গ্রামে কোনো 'মুক্তিফৌজ' নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের কাজকর্ম, চিন্তা-চেতনাকে সর্বদা সে ভর্ৎসনা করে। তার এই দালালিবৃত্তিও তাকে মুক্তি দেয় না। তার মৃত ছেলে শাজাহানকে কবর দেওয়ার কাজে ক্যাম্পের সামনের রাস্তায় তাদের যেতে দেয় না। ইলিয়াস দক্ষতার সঙ্গে এসব দালাল চরিত্র উপস্থাপন করেছেন গল্পে। শোষক শ্রেণির কাছে নিজের লাভবান হওয়ার বিষয়টাই প্রধান। ইসলাম ধর্মে সুদ খাওয়ার ব্যাপারটি হারাম। কিন্তু ইমাম কাম মোয়াজ্জেম দরিদ্র লোকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে দ্বিগুণ হারে সুদ আদায় করে। উপরন্তু বিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্র মানুষদের দিয়ে খাটিয়ে নেয়–

> এমন কি বিটলুর বাপ, যে কি- না গতবারের আগের বার চাষের সময় সার কেনার অর্ধেক টাকা যোগাড় করতে ইমাম সাহেবের কাছ থেকে ৪ মাসের কড়ারে ৫০ টাকা

---

[৯০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

> হাওলাত নিয়ে ৭ মাস পার করিয়ে দেওয়ায় ঐ শেষ কটা মাসের জন্য দ্বিগুন হারে সুদ দিয়েও কেবল একবেলা খোরাকিতে তার পাতকুয়া সাফ করে রক্ষা পেয়েছিলো...[৯১]

'অপঘাত' গল্পে বগুড়া অঞ্চলের উপভাষার সার্থক ও সাবলীল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লেখক। বুলুর মা, কাবেজ, মোবারক আলির সংলাপে বগুড়া অঞ্চলের উপভাষার চমৎকার প্রয়োগ ঘটেছে:

> বন্দুক কি কচ্চেন গো, মানষের হাতে পান্টি দেখলে শালারা বলে গোয়ার হাপড় তুল্যা কোটে দৌড় মারবি তার দিশা পায় না, কড়িতলাত গেলে দ্যাখ্যা গেলোনি, সেটি বলে দুধের ছোলেরা এই জাউরাগুলাক খাম কর্যা দিলো–[৯২]

'অপঘাত' গল্পের ভাষা ও শৈল্পিক সংগঠনে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে দৃশ্যের পর দৃশ্য জোড়া লাগিয়ে সংগ্রাম ও নির্যাতনের চিত্র এঁকেছেন লেখক। লেখকের সংযমও লক্ষণীয়। পাকিস্তানি মিলিটারিদের নির্মমতা বর্ণনায় লেখক দুটি বাক্য লিখেছেন,

> রায়নগর মোকামতলা ঘোড়াঘাটের একটা পোকাও অরা রাখবি না, দেখিস। কুত্তার বাচ্চারা মানুষ সহ্য করবার পারে না[৯৩]

দোজখের ওম

দোজখের ওম গল্পগ্রন্থের শেষ গল্পটিই এ গ্রন্থের নাম-গল্প। দীর্ঘ পরিসরের গল্প এটি। গল্পের প্রধান চরিত্র কামালউদ্দিন। আধখানা অচল, আধখানা সচল শরীর নিয়ে মৃত্যু-প্রতীক্ষারত তিনি। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলেও বেঁচে থাকার জন্য রয়েছে তার অপরিসীম স্পৃহা। জীবনের জন্য মানুষের ভেতরকার অপার আগ্রহ, অসীম আকাঙ্ক্ষাকেই ইলিয়াস শিল্পরূপ দিয়েছেন 'দোজখের ওম' গল্পে।

---

[৯১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮
[৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
[৯৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

এই গল্পটির আখ্যানভাগ পুরান ঢাকার একটি পরিবারের জীবনালেখ্য। পারিবারিক সে আলেখ্যে লেখক যুক্ত করেছেন দীর্ঘ সময়ের বাংলাদেশের সমাজগতির চিত্র; যুক্ত করেছেন সমাজ ও পরিবার জীবনের নানা আচার-অনাচার ও বৈচিত্র্যময় অনুষঙ্গ।

কামালউদ্দিনের শৈশব-কৈশোরকালের ঘটনাক্রমে এসেছে বাংলাদেশের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আকবরের অর্থাৎ কামালউদ্দিনের বড় ছেলের জন্ম-ইতিহাস বর্ণনায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলা ১৩৫০ কিংবা ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ইলিয়াসেরও জন্ম এ বছর। গল্পে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ। কামালউদ্দিনের ছোট ছেলে সোবহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। মাঝখানের সময়টাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশত্যাগ, রাজনৈতিক সংকটসহ নানা ঘটনা ঘটেছে। আখতারুজ্জামান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কামালউদ্দিনের দেখা নানা ঘটনার মধ্যে শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য রক্ষা করতে পেরেছেন; যা দীর্ঘ পরিসরের এ গল্পে ন্যায়সূত্র রক্ষার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

লেখক এ গল্পে বাংলাদেশের ইতিহাস বর্ণনায় যুক্ত করেছেন ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা। কামালউদ্দিনের প্রথম সন্তান আকবরের জন্মের ১০/১২ বছর বয়সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

> ...সেই ব্রিটিশ আমলের যুদ্ধ, ব্রিটিশ জার্মানে বড়ো লড়াই, সেই সময় আকবর ১০/১২ বছরের পোলা, মানে এখন তার ৫৫/৬০ হবো হবো করছে,... [৯৪]

ছোট মেয়ে নুরুন্নাহারের জন্ম ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়। কামালউদ্দিন বলছেন–

> ...তার জন্ম দেশে তখন খুব দুর্ভিক্ষ। আকবরের মা বাচচা বিয়াবার আর টাইম পায় নাই! [৯৫]

ছোট ছেলে সোবহানের যুদ্ধে যাওয়া ও শহীদ হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে নিরাবেগ দৃষ্টিতে:

---

[৯৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭
[৯৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

> মিলিটারির জুলুম শুরু হলো যখন, এই মহল্লার আরো কয়েকটা ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলো .... মহল্লার কোন ছেলে নাকি বলেছে, কোথায় কোন গ্রামে মাথায় মিলিটারির গুলি লেগে সে মারা গেছে।[৯৬]

বিভিন্ন দৃশ্যের পারস্পরিক ঐক্য স্থাপন গল্পকে করেছে গতিশীল ও একমুখী। ইলিয়াস অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কামালউদ্দিনের জীবনের শৈশব, কৈশোরের নানা অনুষঙ্গ পীর সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, পতিতালয়ের বাস্তবতায় 'কান্দুপট্টি' ও স্বপ্ন-বাস্তবতায় জীবনের অতীতচারী স্মৃতিময়তাকে সংযুক্ত করে গল্পে উপস্থাপন করেছেন। এ গল্পে গতিসঞ্চারে লেখক সার্থক হয়েছেন। অবিরাম গতিতে ঘটতে থাকে কামালউদ্দিনের বর্ণনা ও আত্মকথন: কখনো কালানুক্রমিকভাবে, কখনো কালানুক্রমকে অতিক্রম করে স্বপ্নদর্শনের বর্ণনাকে কেন্দ্র করে। ছোট মেয়ে নুরুন্নাহারের জন্ম ও বেড়ে ওঠার বিষয়টি বাস্তব ঘটনাক্রমকে কেন্দ্র করে গল্পে এসেছে। কিন্তু তার মৃত্যুর পরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে কামালউদ্দিনের স্বপ্ন-জবানিতে। তন্দ্রার ভেতর কামালউদ্দিন দেখতে পায় নুরুন্নাহারের স্বামী দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। পাশে একটি মেয়ে। মেয়েটিকে কামালউদ্দিনের মনে হয় কান্দুপট্টির কোনো পতিতা। জামাইকে সে অভিযোগ করে 'খানকি' নিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসার কারণ। সেই মেয়েটি কামালউদ্দিনকে যে ভাষায় ধমক দেয় তাতে তার মনে হয় এ মেয়ে নুরুন্নাহারই। সে দ্বিধায় পড়ে যায়। মরে যাওয়ার পরও তার মেয়ে কি 'ভ্যাদাইমা জামাইয়ের কবজা' থেকে বের হতে পারে নাই। নাকি সে তার কবজায় থেকেই সুখ পায়? বাস্তব, স্বপ্ন, স্মৃতি, অনুমান নানাবিধ প্রসঙ্গের বিস্তার ঘটতে ঘটতে এগিয়ে যায় গল্প।

কামালউদ্দিনের বড় ছেলে আকবরের শৈশব, কর্ম-হীনতা, সমাজবিরোধী-রীতিতে বিয়ে, সংসার-বিচ্ছিন্ন, মৃত্যুবরণের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে গল্পে। বিপরীতে মেজো ছেলে আমজাদের প্রতিপত্তি, পির ভাইদের দাপট, বড় ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে-বৌকে ঠকানোর জোর চেষ্টা প্রদর্শিত হয়েছে গল্পে। লেখক সমাজের এই দুই বিপরীত শ্রেণিকে তুলে ধরেছেন গল্পে। এই দুই বিপরীত শ্রেণির সংঘর্ষে নতুন করে উজ্জীবিত ও অস্তিত্বসচেতন হয়ে ওঠে কামালউদ্দিন। তার সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে অস্তিত্ব ও ন্যায়ের বিজয় ঘোষণা করে কামালউদ্দিন, যা 'দোজখের ওম' গল্পটিকে অসাধারণ এক মাত্রা দিয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের

---

[৯৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

এক নান্দনিক সীমানায় স্থান পেয়েছে গল্পটি। আকবরের মেয়ে যখন জানায় মেজো চাচা তাদের কামালউদ্দিনের বাড়িতে আর থাকতে দেবে না, বের করে দেবে, তখন কামালউদ্দিন একটি লালা-বলকানো হুঙ্কার ছাড়ে, 'তর চাচারে কইস, দাদায় অহন তরি বাঁইচা আছে।'

কামালউদ্দিন বেঁচে থাকতে তার বাড়ি ও সম্পত্তিতে সে কোনো অন্যায়, কোনো অনিয়ম হতে দেবে না। তার এই ভাবনাই তাকে পৌঁছে দেয় শুদ্ধাচারী মানবিক দর্শনের দোরগোড়ায়।

'দোজখের ওম' গল্পে পুরান ঢাকার আঞ্চলিক বুলি উপস্থাপিত হয়েছে। শ্লেষ ও হিউমারও ব্যবহৃত হয়েছে গল্পের পরিচর্যায়। স্বপ্ন-বাস্তবতা গল্পকে এগিয়ে নিয়েছে। গতিময় এক জীবনাখ্যান ও শুদ্ধচারী মানব ভাবনায় 'দোজখের ওম' গল্পটি শিল্পোত্তীর্ণ।

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম ও শেষ গল্পগ্রন্থ *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*। 'প্রেমের গপ্পো', 'ফোঁড়া', 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল', 'কান্না' ও 'রেইনকোট' এই পাঁচটি গল্প নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে কলকাতা থেকে। এ গ্রন্থের গল্পগুলো লেখা হয়েছে ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে। গল্পগুলো গ্রাম ও শাহরিক প্রেক্ষাপটে রচিত। পূর্বের গল্পগুলো অপেক্ষা বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে এগুলো তুলনামূলক সরল। উপস্থাপন-ভঙ্গিও একরৈখিক। গল্পগুলোতে বহুবৈচিত্র্যময় ঘটনাংশের সংযোজন কম। দাম্পত্য সম্পর্কের ফাঁক, রাজনৈতিক দলের বাস্তবতাবর্জিত পুথিসর্বস্ব জ্ঞান ও আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতা ও তৎপরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের উত্থান, সাহসী মানুষদের প্রতিরোধ চিন্তা, অস্তিত্ব রক্ষার অমানবিক নির্মম পন্থা, মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহসী উচ্চারণের মতো বিষয়বস্তু নিয়ে এসব গল্প। 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' এবং 'কান্না' গল্পের উৎস্থাপন শৈল্পিক ও ব্যঞ্জনাময় হয়েছে।

প্রেমের গপ্পো

দুজন তরুণ-তরুণীর সদ্য বিবাহ-উত্তর কথোপকথনই 'প্রেমের গপ্পো' গল্পের বিষয়। বুলা ও জাহাঙ্গীর দুই ভিন্ন মানসিকতার নর ও নারী। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক, কথন-অতিকথনের মধ্য দিয়েই এগিয়েছে গল্প। বুলা শুদ্ধ সঙ্গীতের পাঠ নিয়েছে ওস্তাদের কাছে। জাহাঙ্গীর পেশিবহুল, কলেজে ছিল অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি, ঠিকমতো ক্লাস করতো না। পরীক্ষায় পাসের জন্য নকলও করতে হয়েছিল তাকে।

'প্রেমের গপ্পো' গল্পে বুলা শ্রোতা, জাহাঙ্গীর কথক। জাহাঙ্গীরের নিজের বিবাহপূর্ব প্রেম ও বীরত্বের কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণের মধ্য দিয়েই গল্প এগিয়ে যায়। জাহাঙ্গীরের কথিত গল্প সবটাই বানোয়াট। তাই একই গল্প দুইবার বলার সময় গল্পান্তর্গত কাহিনির স্থান ও পাত্রপাত্রীর নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়। বুলা সংশোধন করে দেয়। একটি ওষুধ কোম্পানির অদক্ষ, অযোগ্য রিপ্রেজেনটেটিভ জাহাঙ্গীর তার নিজের জীবনের প্রত্যাশিত অথচ না পাওয়া বিষয়গুলোর ফাঁক পূরণ করে মিথ্যে গল্পের মধ্য দিয়ে। 'প্রেমের গপ্পো' শুধু প্রেমের গল্পেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জাহাঙ্গীর তার ভালো রেপুটেশনের কথাও স্ত্রীকে জানায়। বলে, গাড়ি-বাড়ি হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। বাস্তবে অফিসে জাহাঙ্গীরের রেপুটেশন অত্যন্ত খারাপ। বুলার ও তার সঙ্গীত সাধনার সহপাঠী মোশতাকের সঙ্গীত সাধনার ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের নেতিবাচক মনোভাব। তার পছন্দ চটুল গান। চেতনাগত ফারাক সত্ত্বেও বুলার মনে আনন্দই সৃষ্টি করে জাহাঙ্গীর। সরল মনের মেয়ে বুলা স্বামীর কথা বিশ্বাস করে। জাহাঙ্গীরের টুকটাক ভুল সংশোধন করে দেয় সে। ইলিয়াস বুলার এ সরল মনোভঙ্গির শৈল্পিক বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন গল্পের শুরুতেই–

> বুলার হাসি আর থামেনা, স্বামীর প্রাকবিবাহ প্রেমের গল্প শোনে আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, খিলখিল এবং খিকখিক আওয়াজ বন্ধ হবার পরেও গোলগাল ফর্সা মুখের এ কোণে ও কোণে হাসির কুচি চিকচিক করে।[৯৭]

পুরো গল্পটিই উপস্থাপিত হয়েছে লঘু ঢঙে। হাস্যরস সৃষ্টি ও শ্লেষ– এই দুই পরিচর্যার মধ্য দিয়েই এগিয়েছে গল্পটি। গুলশানে জাহাঙ্গীরের প্রেমে আসক্ত শাহীন বা শাহনাজের প্রেমিকদের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে ব্যঙ্গ ও শ্লেষ:

> একটা আসত, চিকনা হাঁটতে গেলে হাড্ডিগুলো বাজে, চশমার আড়াল থাইকা কুৎকুতাইয়া চায়। শুনি সেইটা নাকি ইউনিভার্সিটিতে পড়াইত, এইবার পরীক্ষা দিয়া ফরেন সার্ভিস পাইছে। আমি কই, এইটা ফরেন সার্ভিস পাইয়া ভালো হইছে। ক্যান?– ফরেনাররা অ্যারে দেখলেই লগে এইড পাঠাইয়া দিবো।[৯৮]

---

[৯৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

[৯৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

ইলিয়াস অত্যন্ত সমাজসচেতন ব্যক্তি হিসেবে ব্যঙ্গ ও শ্লেষ ব্যবহার করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চেয়ে ফরেন সার্ভিসে চাকরি আর্থিক ও ক্ষমতার বিচারে লাভজনক। তাই সেই কথিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে ফরেন সার্ভিসে যোগ দেয়। বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি ও বিদেশ থেকে সাহায্য পাওয়ার যে লালসা নেতাদের মধ্যে কাজ করে, সে বিষয়টিও প্রকট হয়ে উঠে এসেছে এখানে। আরেক জায়গায় লেখক বাংলা পপগানের সম্পর্কে ব্যঙ্গ করেছেন:

> বেচারাদের গলায় তো তেমন পরিশ্রম হয় না, সুর তালের জন্যেও কোনো পরোয়া না করলেও চলে। বেচারাদের খাটনি সব শরীরে।[৯৯]

'প্রেমের গপ্পো' গল্পের স্থান পুরান ঢাকা। গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে পুরান ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা। গল্পের মূল চরিত্রগুলো প্রধানত পুরান ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। যেমন:

> আমি উলটা ধামকি দিছি, আরে রাখেন! সিনেমার মালিক মালপানি বহুত কামাইছে, আমার পোলাপান মাগনা দুইটা শো দেখব তো এত হাউকাউ কীসের?– শুইনা পুলিশে কথা কয় নাই।[১০০]

গল্পের অন্য সব চরিত্র মান ভাষায় কথোপকথন করে। তাদের পেশা ও পরিবেশ অনুযায়ী লেখক ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাদের মুখে।

'প্রেমের গপ্পো' গল্পে এক শ্রেণির যুব সমাজের অধঃপতনের বিষয়টিই ইলিয়াস সাবলীল ভাষায় হাস্যরস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। বর্ণনভঙ্গি ও চরিত্রসমূহের প্রাঞ্জলতা গল্পে রস সঞ্চার করেছে।

---

[৯৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯
[১০০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

ফোঁড়া

ফোঁড়া গল্পটি ইলিয়াসের সূক্ষ্ম রাজনীতি চেতনার স্মারক। গল্পটি মূলত প্রতীকী। আমাদের দেশের বাম রাজনৈতিক দর্শনের অন্তঃসারশূন্যতা ও ব্যাধিকে তুলে ধরেছেন লেখক এ গল্পে। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে গল্পের মূল কাহিনি। বর্ণনভঙ্গি সরল অথচ শ্লেষময়।

কারখানা শ্রমিক নইমুদ্দিন তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে মালিক পক্ষের গুন্ডার আঘাতে মাথায় মারাত্মক চোট পায়। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক দলের নেতারা তাকে চিকিৎসাসেবা পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে এবং তাদের অধীন একজন কর্মী ভাবে। নিজেদের আন্দোলন চাঙা করতে তারা এ পন্থা অবলম্বন করে। নইমুদ্দিনকে তাদের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে নজরবন্দিতে রাখে, যাতে কোনোভাবেই হাতছাড়া না হয়। কিন্তু বুঝতে চায় না নইমুদ্দিনের ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা, আশা ও বেদনা। ঈদের দিন নইমুদ্দিন হাসপাতাল থেকে পালায় ছেলে, মেয়ে ও বৌয়ের সঙ্গে ঈদ উদ্‌যাপন করার জন্য। তাতেই বামপন্থী নেতা মামুনের মেজাজ বিগড়ে যায়। নইমুদ্দিনের জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা খাবার ফেরত নিয়ে মামুন রিকশায় ওঠে। পথে কথা হয় রিকশাচালকের সঙ্গে। রিকশাচালক নিজেকে নইমুদ্দিনের আত্মীয় পরিচয় দেয়। এতে মামুন ভাবে, রাগটা অন্তত লোকটার ওপর দেখানো যাবে।

মামুন যেতে যেতে নইমুদ্দিন সম্পর্কে গল্প শোনে। রিকশাচালকের ঈদ উদ্‌যাপনের আয়োজনের ব্যাপারেও জানতে পারে। সে মহাজনের কাছ থেকে ৩০ টাকা ধার করেছে চাল, সেমাই, চিনি ও মসলা কেনার জন্য। এটা মামুনের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়। সে আরও আশ্চর্য হয় ঈদের দিন খাওয়ার জন্য কেনা চালের ভাত আগের রাতেই খেয়ে ফেলে বলে। বহুদিন ধরে গন্ধ আঠার রুটি খেয়ে স্বাদ বদলানো এবং অনভ্যস্ত স্ত্রীর হাতে সেমাই আটার দলা পাকিয়ে যায় বলে ভাত ও মাছের ঝোল খেয়ে তাদের উদর ভরতে হয়। মামুনের আশ্চর্য হওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে গণমানুষের জন্য করা সাম্যবাদী রাজনৈতিক দর্শনের দৈন্য।

> মামুন থ হয়ে যায়। লোকটা কী পাগল নাকি? ধারকর্জ করে-জোগাড় করা ঈদ-উদযাপনের সমস্ত উপাদান সে শেষ করে ফেলল ঈদের আগের রাত্রে।[১০১]

---

[১০১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

মামুনের বাড়িতে ঈদের দিন তৈরি হয়েছে জর্দা সেমাই, মাংস, কোর্মাসহ নানা সুস্বাদু খাবার। সে তুলনায় রিকশাচালকের কর্জ করা অর্থে এতই সামান্য ও সাধারণ আয়োজন এবং তা উদর পূর্তিতে কতটুকু সহায়ক তা বুঝতে পারে না মামুন।

ফোঁড়া গল্পের মূল ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু বাম রাজনৈতিক দলের অন্তঃসারশূন্যতা দেখানো হলেও এখানে লেখক যুক্ত করেছেন সামাজিক আরও নানা অনুষঙ্গ। চড়া সুদে দরিদ্র মানুষদের টাকা ধার দেওয়ার মহাজনি কারবারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন লেখক। নইমুদ্দিনের মাতাতো ভাই ঈদ উদ্‌যাপনের সামগ্রী কেনার জন্য মহাজনের কাছে থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নেয়। নিম্নবিত্ত শ্রেণির কাছে এই সুদের টাকার প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরে ইলিয়াস এ দেশের মহাজনি সুদখোর কারবারের শিকড়কে চিহ্নিত করেছেন। কোনো সরকারি সংস্থা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যখন দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ায় না, তখনই এসব মহাজনি প্রথার আবশ্যক হয়ে পড়ে। চিকিৎসাব্যবস্থার ত্রুটিও উঠে এসেছে এ গল্পে। রিকশাচালক বিশ টাকা ধার করে ফোঁড়া কাটালেও রয়ে যায় পুঁজ। আমাদের সমাজের সঞ্চিত ক্লেদকেই এ প্রসঙ্গের মধ দিয়ে প্রতীকায়িত করেছেন লেখক ।

সামাজিক কপটতা উন্মোচনে সদা তৎপর থাকেন ইলিয়াস। এ গল্পেও লেখক ইসলাম ধর্মের প্রতি দরদি মৌলবির কপট চরিত্র উন্মোচন করেছেন। হাসপাতালে নইমুদ্দিনের ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া এক মৌলবির পা ভেঙেছে পাতকুয়ায় পড়ে। রোজার মাসে তারাবি নামাজ পড়ানোর বেতন, আতর, সুরমা, তসবি, টুপি বিক্রির আয় থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সে যত কষ্ট পায়, ধর্মের নির্দেশ পালন না করতে পারায় ততটা কষ্ট পায় না। আরেক জায়গায় ইলিয়াস দেখিয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা, বিশেষত সামরিক বাহিনীর লোকজন প্রয়োজনের তুলনায় তিন গুণ বেশি রেশন পায়; বিক্রি করে দেয় বাজারে। অথচ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ঠিকমতো খাবার জোটে না।

গল্প পরিচর্যায় ব্যবহৃত হয়েছে শ্লেষ বিদ্রূপ। বগুড়া অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের মুখে। মামুনের ভাষা প্রমিত মান বাংলা।

মামুনের সংলাপ :

> ঈদ করতে তুমি সেমাই কিনলে আর সেই সেমাই খেয়ে ফেললে ঈদের আগের রাত্রে।[১০২]

রিক্সাচালকের সংলাপ :

> কী করি কন? আটার উটি খাতে খাতে ব্যাটা-বিটি-পরিবার– সোগলির জিভাত বাত ধরিছে, জিভা বলে বলে খালি শুলায়।[১০৩]

সরল ভাষার দ্যোতনা, দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা, ব্যঙ্গ, শ্লেষের সংশ্লেষে ও বিষয়ের গুরুত্বে 'ফোঁড়া' গল্পটি শিল্পসার্থকতা অর্জন করেছে।

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল

'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পের প্রেক্ষাপট দীর্ঘ। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় থেকে নব্বইয়ের দশকের সমাজ-রাজনীতি এখানে স্থান পেয়েছে। প্রধান চরিত্র লালমিয়া, ইমামুদ্দিন, বুলেট ও নাজির আলির কথোপকথন, তৎপরতা, বাদানুবাদ, স্বপ্ন-দর্শন ও এর বয়ানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় গল্পটি। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন, সাহস, আত্মত্যাগ এবং যুদ্ধকালে স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা, স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা এ গল্পের মূল

---

[১০২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭
[১০৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

উপজীব্য। লেখক রূপকাশ্রয়ী এ গল্পে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের প্রতি নিক্ষেপ করেন স্বপ্নময় প্রতিরোধের বুলেট।

প্রেসের কর্মচারী মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিন। সাম্যময় সমাজ ও সচ্ছল জীবনের স্বপ্নে অংশ নেয় যুদ্ধে; প্রাণ হারায় সম্মুখ সমরে। তার বন্ধু লাল মিয়া। স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানি দালাল নাজির আলির দখল করা লণ্ড্রির কর্মচারী সে। যুদ্ধের পর কয়েক বছর আত্মগোপন করে থাকে নাজির আলি। সে সময়ে এক মন্ত্রীর ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করে অঢেল অর্থ উপার্জন করে সে। ১৯৭৫-পরবর্তী সামরিক শাসনকালে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠার সূত্র খুঁজে পেয়ে সে মিশতে থাকে জনতার সাথে।

বৃহদায়তনিক এ গল্পটি অনেকটা শিথিল কাঠামোর। মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী দুই দশকের সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে এখানে। শিথিল কাঠামো হলেও গল্পের বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে রূপকের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিন তার প্রতিবাদী চেতনা রেখে যায় সন্তান বুলেটের মধ্যে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও এ দেশের প্রগতিশীল মানুষদের কাছে কোনো গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না এসব রাজাকার। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতায় তারা সম্মুখীন হয় বাধার। লালমিয়া ও ইমামুদ্দিনের ছেলে বুলেটের স্বপ্নে দেখা উল্টো পায়ের পাতাযুক্ত মুসল্লিরা প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাৎপদ। এদের উল্টানো পায়ের পাতা মেরামতের উদ্দেশ্যে বুলেট তাতে প্রচণ্ড বেগে প্রস্রাবের ধারা বইয়ে দেয় স্বপ্নের মধ্যে:

> ওলটানো পায়ের পাতা তার প্রস্রাবের ঝাঁঝ আঁচ করতে পেরে জাফরি-কাটা দেওয়াল টপকে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছে তাদের অদৃশ্য আখড়ার ভেতরে।[১০৪]

স্বপ্নঘোরে থাকা লালমিয়া এক স্বপ্ন থেকে আরেক স্বপ্নে গড়িয়ে পড়েন। সেই সূত্রে গল্প বর্ণনায় যুক্ত হয় প্রতীকী নানা অনুষঙ্গ। স্বপ্নে দেখা মসজিদের ছাদ সম্পর্কে সে জানায়–

> ...মসজিদের ছাদটা অনেক উঁচু, ছাদ জুড়ে খোদাই-করা অজস্র তারা। সেগুলো সত্যিকারের তারাও হতে পারে, নইলে অমন মিটমিট করে জ্বলে কী করে? [১০৫]

---

[১০৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

[১০৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

লুপ্ত হয়ে যায় সময়ের হিসাব। আধা ঘন্টা, এক ঘন্টা, দেড় ঘন্টা নাকি দুই ঘন্টা ধরে মোনাজাত করে লালমিয়া সে খেয়াল তার থাকে না। কিন্তু যুদ্ধের সময় মিলিটারিদের নির্বিচার হত্যা, অমানুষিক নির্যাতনের চিত্র লালমিয়ার মুখ দিয়ে বর্ণনার সময় লেখক থাকেন নিরাবেগ। গল্পে পুরান ঢাকার ভাষা ব্যবহারে লেখক সাবলীল:

চাচা আপনের খাবের মইদ্যে শাহ্ সাহেবে আহে, খাবসুরাৎ কইলেন না ? [১০৬]

কান্না

'কান্না' গল্পটির বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক পরিচর্যা অভিনব। ইলিয়াসের অন্য সব ছোটগল্প থেকে এটি স্বতন্ত্র ভঙ্গির; করুণ রসের ট্র্যাজিক গল্প। কিন্তু কোথাও কোনো অতিরঞ্জন নেই। লেখক গভীর দৃষ্টিতে দরিদ্র মানুষের টিকে থাকার বাস্তবতাকে, তাদের হাতিয়ারকে গল্পে তুলে ধরেছেন। একই সাথে মানুষের দ্বৈত বাস্তবকে যুক্ত করেছেন তিনি।

আফাজ আলি জীবন নির্বাহের উপায় হিসেবে কবরস্তান দেখভালের কাজ করে ঢাকায়। মুর্দার কবর সাফ-সুতরো রাখা, শবে বরাত, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহার সময় কবর জিয়ারত করা– এসবের মধ্য দিয়ে তার আয়-উপার্জন হয়। মুর্দার আত্মীয়স্বজনের মনে শোক উথলে তোলার জন্য করুণ মিহি সুরে দোয়া দরুদের সঙ্গে কান্নাও তার বড় হাতিয়ার। কান্না আফাজ আলির পেশাগত এক দক্ষতা।

এই শ্রমের মধ্য দিয়ে যে আয় উপার্জন হয়, তাই দিয়ে গ্রামে তার সংসার চলে কোনোমতে। আফাজ আলির এই পেশাগত কান্না একসময় মিশে যায় তার বাস্তব বেদনা ও কান্নার সঙ্গে। ইলিয়াস দুই কান্নাকে একীভূত করে আফাজ আলিদের জীবন বাস্তবকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। গল্পের প্রথম ভাগেই লেখক পরিণাম নির্দেশক এক

---

[১০৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

'টেলিপ্যাথিক' পরিচর্যা করেছেন। অন্য মুর্দার কবর জিয়ারতের সময় সে ভুলে নিজের বড় ছেলের নাম উচ্চারণ করে ফেলে। কবর জিয়ারত শেষে মনু মিঞার সাথে বাড়ি যাওয়ার পথে শুনতে পায় তার বড় ছেলে হাবিবুল্লা মারা গেছে 'দাস্ত' হয়ে।

অন্যের কবর জিয়ারতের সময় কৃত্রিম কান্নায় অভ্যস্ত আফাজ আলি। কিন্তু সে নিজের ছেলের কবর জিয়ারত করার সময় কাঁদতে পারে না। আফাজ আলি তার কর্মস্থলে যে উদ্দেশ্যে কাঁদে, অর্থ-উপার্জনের সহায় সূত্রে, ঠিক একই কারণে ছেলের জন্য কাঁদতে পারে না। দরিদ্র মানুষের কবরস্তানের দৈন্যদশা, ছেলের চাকরির জন্য দেওয়া ঘুষের টাকা ফেরত আনার চিন্তা তাকে কাঁদতে দেয় না। পরিস্থিতির তাড়নায় মানুষের এই দ্বৈত দশাকে ইলিয়াস অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন গল্পে।

স্বল্প কথায় সামাজিক, রাষ্ট্রীক নানা অনিয়ম, অনাচারের চিত্রও লেখক স্পষ্ট করেছেন গল্পে। লেখক জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের অবস্থা, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিস্তার, সামরিক শাসকদের মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারের অতি আনুকূল্য, চাকরিতে প্রবেশের জন্য ঘুষ-দুর্নীতি, শিক্ষকদের নৈতিক অবক্ষয়, চিকিৎসাব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও অবহেলা, মহাজনি সুদের কারবার, কবরস্তান ঘিরে ব্যবসা প্রভৃতি বিষয় গল্পে তুলে ধরেছেন। প্রাইমারি স্কুল মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে, সে দিকে সরকারের নজর নেই। অথচ মাদ্রাসা ও মসজিদের জন্য অর্থ বরাদ্দের শেষ নেই। লেখক শাণিত ব্যঙ্গে উপস্থাপন করেছেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা, দৈন্যদশা।

> আকিকা, শাদি ও মওত--জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানদের পদে পদে মৌলবি দরকার। দোলনা হইতে কবর তক মৌলবি ছাড়া মুসলমানের উপায় নাই।[১০৭]

শ্রেণিবিভাজিত সমাজে মানুষের মৃত্যুর পরও রয়ে যায় আভিজাত্যের দৌড়। মৃত মানুষও শতাব্দীর পর শতাব্দী বয়ে নিয়ে যায় উচ্চশ্রেণির মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও গৌরব। ইলিয়াস আফাজ আলির জবানিতে ক্ষোভ ও শ্লেষের সঙ্গে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন–

---

[১০৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

> কোন কলেজের মাস্টার, এই গোরস্তানে ঐসব মানুষকে পোঁছে কে? মুর্দা হোক আর জিন্দা হোক, এখানে আসে সব বড়-বড় মার্চেন্ট, ফরেনারদের অফিসে কাজ করা সাহেবরা এখানে আসে, এই কাঁচাপাকাচুলকে এখানে গুনতির মধ্যে ধরা যায়? মরহুম শ্বশুড়ের জন্যে তবু এখন আসতে পারো, মরলে তোমার লাশ ঢুকতে পারবে এখানে? [১০৮]

ইলিয়াস পরাবাস্তব পরিচর্যায় মিলিয়ে দিয়েছেন অতীত ও বর্তমানকে; প্রতীকায়িত করেছেন আফাজ আলির পুত্রশোকের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি সত্যিকার শোকের বিষয়কে।

> ...গোলাপের কাঁটা তার ঘাড়ে খোঁচা মারে। গর্দানটা তার একটু মোটাই, কিন্তু চামড়া সে তুলনায় পুরু নয় বলে ঘাড়টা চিনচিন করে উঠল। এই সঙ্গে অনেক আগেকার শিশু হাবিবুল্লা তার ঘাড়ের ওপর বসে দোল খেতে থাকলে সেখানটায় শির শির করে এবং আরেকটু ওপরে খচখচ করে বেঁধে এখনকার হাবিবুল্লার চাকরির ঘুষবাবদ হাওলাত করা ৫০০০ টাকার নোটের কোণাগুলো। [১০৯]

'কান্না' গল্পের বর্ণনভঙ্গি প্রাঞ্জল। বরিশাল অঞ্চলের উপভাষার যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লেখক। চরিত্রানুগ সংলাপ সংযোজন করেছেন তিনি। আফাজ আলি ও মনু মিঞার সংলাপ আঞ্চলিক। ঢাকার কবরবাসী আত্মীয়স্বজনের সংলাপ মান ভাষায়। সবদিক বিবেচনায় 'কান্না' গল্পে নতুন এক শিল্পমাত্রা সংযোজন করেছেন লেখক।

রেইনকোট

'রেইনকোট' গল্পটি *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* গল্পগ্রন্থের পঞ্চম ও শেষ গল্প। ঢাকায় সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতা এ গল্পের বিষয়বস্তু। ছোট পরিসরে সংঘটিত কতগুলো ঘটনার বর্ণনায় মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। রসায়নের শিক্ষক নুরুল হুদার ভিত-সন্ত্রস্ত মানসিকতা অতিক্রম করে, সাহসী ও প্রতিরোধমূলক চেতনায় রূপান্তরের কাহিনিই গল্পের মূল কথাবস্তু।

---

[১০৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১
[১০৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

এ গল্পের ভাষাশৈলী নবতর। ইলিয়াসের প্রচলিত গদ্যভঙ্গি থেকে এ ভাষা আলাদা। নিরাভরণ ভাষা ও ছোট ছোট বাক্যের সমাহারে এ গল্প অনন্য।

ঢাকা কলেজের একটা অংশে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ক্যাম্প করেছে। কলেজের প্রিন্সিপাল ড. আফাজ আহমদ যুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তান আর্মিকে তোয়াজ করে এবং সারা দেশের স্কুল-কলেজের শহীদ মিনার ভাঙার পরামর্শ দেয়। কলেজের তরুণ শিক্ষক রসায়নের প্রভাষক নুরুল হুদা প্রিন্সিপালের কাজকর্ম নীরবে সমর্থন করে। কারণ, প্রিন্সিপালের সঙ্গে থাকলে পাকিস্তানি আর্মির সন্দেহ থেকে বাঁচা যাবে। অন্যদিকে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রাণপণ চেষ্টা থাকে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের সঙ্গে। শ্যালক যুদ্ধে যাওয়ার পর বারবার বাসা বদলায়। কিন্তু অস্বস্তি তৈরি করে তার রেখে যাওয়া রেইনকোট ও টুপি। অথচ এই রেইনকোটের উত্তাপ ও ওমই নুরুল হুদাকে পৌঁছে দেয় অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে, নেতি থেকে ইতিতে। কলেজের সামনে মিসক্রিয়েন্টরা হামলা চালিয়ে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিয়েছে। ধরা পড়া একজন নুরুল হুদার নাম বলেছে। বলেছে নুরুল হুদার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। তাই তার ডাক পড়ে মিলিটারির ক্যাম্পে। বৃষ্টির কারণে শ্যালকের ফেলে যাওয়া রেইনকোট ও টুপি মাথায় সে রওনা হয়। রেইনকোটই তাকে ক্রমান্বয়ে সাহসী করে তোলে। রেইনকোট পরলে তাকে কি তার শ্যালক মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? সে কি তাহলে মুক্তিবাহিনীর সদস্য? মেয়ের এ রকম পর্যবেক্ষণে নুরুল হুদা প্রথমে ভাবনায় পড়ে যায়। ভাবনা থেকে সাহস সঞ্চয় করে ভাবে, বৃষ্টির দিনে রেইনকোট পরা নিশ্চয়ই দোষের কিছু নয়। ইলিয়াস ইঙ্গিত ও কৌশলে মুক্তিযোদ্ধার পরোক্ষ সংস্পর্শের শুরু থেকেই নুরুল হুদার পরিবর্তনের ঘটনা গল্পে যুক্ত করেন। এই পরিবর্তন ও রূপান্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বর অত্যাচারের সময়। সে অকপটে বলে–

> ...মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়।[১১০]

নুরুল হুদার এই রূপান্তর প্রতীকী অর্থে বাংলাদেশের সমগ্র জনগণেরই রূপান্তরের ইতিকথা। মুক্তির প্রতীক্ষা ও যুদ্ধজয়ের আত্মভাষণের পূর্ব-সূত্র।

---

[১১০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

ইলিয়াস 'রেইনকোট' গল্পে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বরতা, তাদের দোসর রাজাকারদের লুণ্ঠনবৃত্তি– সবই স্বল্প কথায় গল্পে উপস্থাপন করেছেন।

'রেইনকোট' গল্পের ভাষা ব্যবহারে লেখক সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। উর্দু ও ইংরেজি মিশ্রিত সংলাপ লক্ষ করার মতো। পাকিস্তানি বাহিনীর উর্দু সংলাপ ও তাদের অনুসারী বাঙালির গদগদ উর্দু বলার খায়েসকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। কলেজের পিয়ন ইসহাক যুদ্ধের শুরু থেকেই উর্দু বলা বাড়িয়ে দিয়েছে। নুরুল হুদাকে তলব করতে এসে সে অনর্গল উর্দু বলে–

> আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁত্তছ গিয়া। সব পরফসরকো এত্তেলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।[১১১]

বাংলাভাষী প্রিন্সিপালও যুদ্ধের শুরু থেকে উর্দু বলা রুপ্ত করছে। কুলিয়ে উঠতে পারে না ঠিকমতো। ভুল হওয়ার ভয়ে কর্নেলের সঙ্গে সে ইংরেজি বলে–

> হি ইজ প্রফেসর নুরুল হুদা। ... সরি হি ইজ নট এ প্রফেসর। এ লেকচারার ইন কেমিষ্ট্রি।[১১২]

অনেক প্রবাদ যেমন 'বাঁশ বনে ডোম কানা', 'শনিতে সাত মঙ্গলে তিন আর সব দিন দিন' ব্যবহার করেছেন গল্পে। নিরাভরণ হলেও ভাষায় কাব্যিকতা যুক্ত করেছেন মাঝে মাঝে–

> এর মধ্যেই ছিপছিপে বৃষ্টিতে লালচে আভা তুলে এসে পড়ল লাল রঙের স্টেট বাস।[১১৩]

'রেইনকোট' গল্পে ইলিয়াস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ইতিহাসকে ব্যঞ্জনাময় পরিচর্যায় স্বদেশপ্রেমের স্মারকে শিল্পময় করেছেন।

---

[১১১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩
[১১২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২
[১১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তাঁর রচিত ছোটগল্পের বিষয়ের গুরুত্ব, রচনাশৈলী, ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা, বক্তব্যের বলিষ্ঠতার কারণে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল আসন করে নিয়েছেন। তাঁর গল্প পাঠকের সামনে উন্মোচন করে দেয় এক নতুন দিগন্ত।

ইলিয়াসের গল্পে ব্যক্তি, ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, পরিপার্শ্বের অভিজ্ঞতার চিত্রায়ণ ঘটেছে। গ্রাম ও শহর দুই জীবনাভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর মানস-ভূমি। পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ পর্ব এই দুই দেশ কালের পরিমণ্ডলে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর সাহিত্যিকচেতনা। তার সঙ্গে মিশেছে বিদেশি সাহিত্য-পাঠের অভিজ্ঞতা। বিরলপ্রজ এই লেখকের রচনা সংখ্যা কম। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ পাঁচটি। প্রতিটি গ্রন্থেই ইলিয়াস ক্রম-উত্তরণশীল। তিনি সমকালীন সমাজ-রাজনীতির দ্বন্দ্বজটিল পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনজীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন।

পাঁচটি গ্রন্থে প্রকাশিত মোট ২৩টি গল্প পাঠ করলে আমরা উপলব্ধি করি, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর ছোটগল্পে কোনো অপ্রত্যাশিত বিস্ময় ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করতে মনোযোগ দেননি। তিনি চেয়েছেন কাললগ্ন মানুষ, তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, স্মৃতিকাতরতা, ক্ষুধা-দারিদ্র্য স্বার্থপরতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সফলতা ও ব্যর্থতার চিত্রাঙ্কন করতে। তিনি সমকালীন সমাজ বাস্তবতা, সমাজের গতিচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত নানা শ্রেণিস্তরের মানুষকে টেনে এনেছেন গল্পে; দৃষ্টি দিয়েছেন অলিতে, গলিতে, রাজপথে, বস্তিতে।

ইলিয়াসের লেখক-জীবনের সময়সীমা ১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু হয়ে এই শতকের শেষ অবধি, মোটামুটি চল্লিশ বছর। তাঁর গল্প-বিষয়ের কালসীমা ভারত বিভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের শেষের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। ইলিয়াসের ছোটগল্প তাঁর জীবন উপলব্ধির-ক্রম-অগ্রগতির স্মারক।

প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর* থেকেই ইলিয়াসের সৃজনী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয় ও প্রকরণ উভয় দিক বিবেচনাতেই তাঁর উৎকর্ষের সাক্ষ্য মেলে। নিছক সমাজবাস্তবতা ও যুক্তির প্রাবল্য নয়, জীবনবোধের বার্তা অনিবার্যভাবে ঘুরেফিরে এসেছে এ গ্রন্থের গল্পের শিল্প-পরিকল্পনায়।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে আশা ও স্বপ্ন নিঃশেষ হওয়ায় মানসিক অবসাদগ্রস্ত যুবক রঞ্জু পৌঁছে যায় মৃত্যুর মিছিলে। 'উৎসব' গল্পে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের শ্রেণিবৈষম্য ও মানসিক বিকারগ্রস্ততা স্থান পেয়েছে। 'প্রতিশোধ', 'ফেরারী' ও 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে লুণ্ঠন, লাঠিয়ালবৃত্তি, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'যোগাযোগ' গল্পটিতে মায়ের সন্তানবাৎসল্য, মা ও সন্তানের মানসিক-নৈকট্য ও বিচ্ছিন্নতার বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে।

খোয়ারী গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পে স্থান পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর অরাজকতা, দখলদারিত্বের মচ্ছব, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেদনাবাহিত দীর্ঘশ্বাস। 'অসুখ-বিসুখ' গল্পে বঞ্চিত ও অবহেলিত নারী আতমন্নেসার মানসিক বিকৃতি বিবৃত হয়েছে। 'তারা বিবির মরদ পোলা' গল্পে লেখক অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন যৌনজীবনে অতৃপ্ত সন্দেহপ্রবণ মানসিকতা ও মনোবিকৃতি। 'পিতৃবিয়োগ' গল্পে পিতা-পুত্রের মানসিক দূরত্ব শিল্পনৈপূণ্যে প্রকাশিত হয়েছে। গম্ভীর, কর্তব্যপরায়ণ, নিরস পিতার মৃত্যুর পর তার কর্মস্থলে গিয়ে সন্তান জানতে পারে তিনি সেখানে চর্চা করেছেন আনন্দ উচ্ছল, সন্তানবাৎসল্যময় মধুর জীবন। এই বাস্তবতা তার সন্তানকে ফেলে দেয় মানসিক বিকলনে। চেনা পিতা পরিণত হয় অচেনায়। এ গল্পটি নিরীক্ষাধর্মী। মানব মনস্তত্ত্বের জটিল দিক উন্মোচিত হয়েছে এ গল্পে।

তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *দুধভাতে উৎপাত*। এ গ্রন্থের প্রথম গল্প 'মিলির হাতে স্টেনগান' শহুরে পটভূমিতে রচিত। এখানে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শহরকেন্দ্রিক যুবসমাজের অরাজকতা, নৈরাজ্য, লুটপাটের কাহিনি স্থান পেয়েছে। শৈলীগত নিরীক্ষা করেছেন লেখক এ গল্পে। এ গ্রন্থের বাকি তিনটি গল্প 'দুধভাতে উৎপাত', 'পায়ের নিচে জল' ও 'দখল' প্রতিটিতেই গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ক্ষুধা-দারিদ্র্য, সংকট, স্বার্থপরতা, জোতদারদের শোষণ-নির্যাতনের চিত্র ভাষারূপ পেয়েছে। অস্তিত্ব সংকটের চরমতম মুহূর্তে শোষিত-বঞ্চিত খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতিবাদে উজ্জীবিত হওয়ার দিকটিও উঠে এসেছে এসব গল্পে। এ গল্পগ্রন্থে ইলিয়াস দৃষ্টি দিয়েছেন গ্রামনির্ভর জনজীবনের দিকে। এভাবে বদলে যায় তার জীবনোপলব্ধির ধরন ও শৈল্পিক পরিচর্যার রীতি।

চতুর্থ গল্পগ্রন্থ *দোজখের ওম*। এ গ্রন্থের চারটি গল্পে বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। 'কীটনাশকের কীর্তি' ও 'যুগলবন্দি' উভয় গল্পেই শহুরে উচ্চবিত্তের বিলাসী জীবনযাত্রা, তাদের আশ্রয়ে বেঁচে থাকা দরিদ্র মানুষদের মানসিক বিকৃতি ও মানবিক অবনমন চিত্রায়িত হয়েছে। 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পে শহুরে উচ্চবিত্তের বিলাসী জীবনের সমান্তরালে গ্রামীণ জোতদারদের শোষণ-নির্যাতনে দরিদ্র মানুষদের অসহায়তা ফুটে উঠেছে। 'দোজখের ওম' গল্পে বৃদ্ধ কামালউদ্দিনের মুখে উচ্চারিত হয়েছে জীবনের জয়গান। অশীতিপর অসুস্থ এই বৃদ্ধ জীবনযন্ত্রণা অতিক্রম করে উপভোগ করতে চায় বেঁচে থাকার গভীর আনন্দ।

পঞ্চম গল্পগ্রন্থ *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*। সমাজের নানাবিধ অসংগতি, পশ্চাৎপদতা, মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে ঢাকা শহরকেন্দ্রিক বাস্তবতার চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে এ গ্রন্থে। 'প্রেমের গপ্পো' অসম জীবনবোধসম্পন্ন দুজন নর-নারীর কপট জীবনচর্চার চিত্র। 'ফোঁড়া' ও 'কান্না' গল্পে নিম্নবিত্তের অস্তিত্বরক্ষার করুণ প্রচেষ্টা বাঙ্ময় হয়েছে। 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পের ক্যানভাস বিশাল। মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল ও স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে পরাজিত, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর পুনর্বাসনের সমাজবাস্তবতা এ গল্পের বিষয়। 'রেইনকোট' গল্পটি

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতার স্মারক। এখানে একজন ভীত কলেজ শিক্ষকের নির্ভীক হয়ে ওঠার বিষয়টি উঠে এসেছে।

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শিল্পচেতনার মৌলবিন্দু। তাঁর গল্পে সমাজবাস্তবতা ও মানবিক সম্পর্কের টানাপড়েন যথাযোগ্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ইলিয়াসের রচনা চিত্রধর্মী কিন্তু নির্মম। রূপক-প্রতীকধর্মীতা, চিত্রকল্পময়তা, মনোবিকলনতত্ত্ব, পরাবাস্তবতা, যাদুবাস্তবতাসহ নানা সাহিত্যরীতি তাঁর গল্পে তাৎপর্যময় রূপে সন্নিবেশিত হয়েছে। মাত্র তেপান্ন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ইলিয়াস। স্বল্পায়ু এই লেখক তাঁর লেখনিতে বাংলা ছোটগল্পের নতুন দিক উন্মোচন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থ:

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস — *রচনাসমগ্র* ১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৩

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস — *রচনাসমগ্র* ২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৪

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস — *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৯

সহায়ক গ্রন্থ:

অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য — *নরেন্দ্রনাথ মিত্র: জীবন ও সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪

অনীক মাহমুদ — *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ' বছর*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ১৯৯৫

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — *কালের প্রতিমা*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯১

অলোক রায় — *কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, ১৯৯২

অলোক রায় (সম্পা.) — *সাহিত্যকোষ*, কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা , ১৯৯৩

অশ্রু কুমার শিকদার — *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৩.

আজহার ইসলাম — *বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬

আজিজুর রহমান — *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান — *মুসলিম ও বাংলা সাহিত্য*, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৯

আনোয়ার পাশা — *রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা*, *আনোয়ার পাশা রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খন্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৩

আলাউদ্দিন মন্ডল — *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, *নির্মাণে বিনির্মাণে*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯

আলাউদ্দিন আল আজাদ — *স্বনির্বাচিত গল্প*, প্রথম প্রকাশ ২০০২, গতিধারা, ঢাকা

আলেয়া বেগম — *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী — *বাংলা ছোটগল্প রীতিপ্রকরণ ও নিবিড় পাঠ*, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯

করুণাময় গোস্বামী (সম্পা.) — *বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ*, সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ, ১৪০০

গিয়াস শামীম — *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

গিয়াস শামীম — *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী — *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য*, দে'জ পাবলিকেশনস, কলকাতা, ১৯৮৬

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী — *বাংলা কথাসাহিত্য: প্রকরণ ও প্রবণতা*. পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯১

গোলাম মুরশিদ — *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ: পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

চঞ্চল কুমার বোস — *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯

চন্দ্রা ঘোষ সিনহা — *বিংশ শতাব্দীর বাংলা ছোটগল্পে সমাজবিদ্রোহ*, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৩

জগদীশ ভট্টাচার্য — *তারাশঙ্করের জীবনী, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৮

জাকারিয়া সিরাজী — *আধুনিক সাহিত্য: মন ও মানসিকতা*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯১

জাফর আহমেদ রাশেদ — *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

জীবেন্দ্র সিংহ রায় — *কল্লোলের কাল*, দেজ পাবলিশিং সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৭

তপোধীর ভট্টাচার্য — *ছোটগল্পের অন্তর্ভুবন*, মহাজাতি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০

নবনীতা চক্রবর্তী — *বাংলা ছোটগল্পের গদ্যশৈলী*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০০২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *সাহিত্যে ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৫ সন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *ছোটগল্পের সীমারেখা*, বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৬

প্রশান্ত মৃধা (সম্পা.) — *অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

বদরুদ্দীন উমর — *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৫

বিশ্বজিৎ ঘোষ — *বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

বিশ্বজিৎ ঘোষ — *বাংলা কথাসাহিত্যপাঠ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০২

ভূদেব চৌধুরী — *বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ন বুক এজেন্সী, চতুর্থ প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৯.

মিজানুর রহমান খান — *বনফুলের ছোটগল্প: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ২০০৮

মনোজ মুখোপাধ্যায় — *বাংলা ছোটগল্প উৎস ও স্বরূপ*, প্রথম প্রকাশ, বামা পুস্তকালায়

মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পা.) — *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ফিরে দেখা সারাজীবন*, ১ম খণ্ড, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, ২০০০

মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পা.) — *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ফিরে দেখা সারাজীবন*, ২য় খণ্ড, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, ২০০১

মোস্তফা মনোয়ার — *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে ভিন্নমাত্রা অন্যসুর*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০৩

রথীন্দ্রনাথ রায় — *ছোটগল্পের কথা*, পুস্তক বিপণি, পুনমুর্দ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৬ সম্পাদিত, সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ, ১৪০০ সন

রফিকউল্লাহ খান — *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

সমীরণ মজুমদার (সম্পা.) — *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারক গ্রন্থ*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদেনীপুর, ১৯৯৭

সরদার আবদুস সাত্তার — *কথাসাহিত্য সমীক্ষণ*, বই প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৭

সরিফা সালোয়া ডিনা — *হাসান আজিজুল হক ও আখরুজামান ইলিয়াসের ছোটগল্প বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০,

সৈয়দ আকরম হোসেন — *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭

শহীদ ইকবাল — *আখতারুজামান ইলিয়াস মানুষ ও কথা শিল্প*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯

শিশিরকুমার দাশ — *বাংলা, বাংলা ছোটগল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৫

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় — *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

শাহাদুজ্জামান	*সাক্ষাৎকার: হাসান আজিজুল হক, কথা পরম্পরা*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৭
শওকত ওসমান	*মৌননয়, একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলন*, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, পুঁথিঘর প্রকাশনী, সংস্করণ, ১৯৮৯

ইংরেজি গ্রন্থের নাম

Subhoranjan Dasgupta	*Elegy and Dream: Akhtaruzzaman Elias' Creative Commitment,* Shipra publication, Delhi, 2000
J.A CUDDON	*Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, Penguin Books, New York, Third edition, 1992
RENE WELLEK and AUSTIN WARREN	*Theory of Literature,* Peregrine Books
VIRGIL SCOTT and DAVID MADDEN	*Studies in the short story,* Holt, Rineart and Winston, New York, 1980
WILLIAM HENRY	*An Introduction to the study of Literature*, Kalyani Publishers, New Delhi, 1991

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

তৃণমূল	১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯২-মার্চ ১৯৯২, ঢাকা
মাটি পত্রিকা	১মবর্ষ, ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৯, ঢাকা
রূপম	৩৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা), অক্টোবর, ২০০২, বগুড়া
লিরিক	সংখ্যা ৮, (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা), ১৪ এপ্রিল, ১৯৯২, চট্টগ্রাম
শৈলী	২য় বর্ষ, ২২ সংখ্যা, (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা), জানুয়ারি, ১৯৯৭, ঢাকা
সংস্কৃতি	ছাব্বিশ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা (২৫ বছর পূর্তি সংখ্যা), এপ্রিল ১৯৯৯, ঢাকা